নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের

৩৭তম অধিবেশনে প্রদত্ত

সভাপতি ও উদ্বোধকদের ভাষণ

সম্পাদনা

শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়

এপ্রিল, ১৯৬২

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ৩৭তম অধিবেশনের যুক্ত সম্পাদক ও কলিকাতা শাখার সম্পাদক শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত ও ৭, ছুতারপাড়া লেন, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত এবং লয়াল আর্ট প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৪, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে শ্রীনারায়ণ লাহিড়ী কর্তৃক মুদ্রিত।

সম্পাদকের নিবেদন

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের প্রতি অধিবেশনেই দেশের জ্ঞানী গুণী চিন্তাশীল মনীষী এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও লেখকদের কত সারগর্ভ ও তথ্যবহুল অভিভাষণই প্রদত্ত হয়। সংবাদপত্রে তার সংক্ষিপ্তাংশ প্রকাশিত হয় এবং সম্মেলনের মাসিক মুখপত্র—"সম্মেলনী"তে গত কয়েক বৎসর অবশ্য ভাষণগুলির পূর্ণাংশ প্রকাশ করা হচ্ছে; কিন্তু একটি অধিবেশনে প্রদত্ত শাখা সভাপতি ও উদ্বোধকের ভাষণের পূর্ণাংশ একটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের আয়োজন এই প্রথম।

গত ডিসেম্বর (১৯৬১) মাসে যখন কলিকাতায় নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ৩৭তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, তখন সকল প্রতিনিধি ও উৎসাহী সাহিত্যরসিকদের অধিবেশনের বিভিন্ন শাখার সভাপতি ও উদ্বোধকদের মুদ্রিত ভাষণ বিতরণ করা সম্ভব হয়নি; অথচ এ বিষয়ে তাঁদের প্রচুর আগ্রহ ও উৎসাহ দেখা গিয়েছিল। অবশ্য বিগত কোন অধিবেশনেই যোগদানকারী সকলকে মুদ্রিত সব ভাষণের কপি দেওয়া হয়নি।

সম্মেলনের সদস্য ও প্রতিনিধিদের উৎসাহে এবারের অধিবেশনে প্রদত্ত পনেরোজন সভাপতি ও উদ্বোধকদের ভাষণের পূর্ণাংশ একত্রে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হল। সম্মেলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ছাড়াও "ভাষণাবলী" বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের (বি, এ; এম, এ পরীক্ষার্থী) ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ কাজে লাগবে।

একটি ভাষণের অল্প কিছু অংশ প্রয়োজনবোধে বাদ দেওয়া হয়েছে; তাছাড়া অন্যান্য সব ভাষণই সম্পূর্ণ ছাপা হয়েছে।

প্রুফ সংশোধনের কাজে শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুনীলময় ঘোষ ও শ্রীঅমিয় চট্টোপাধ্যায় সাহায্য করেছেন। তাঁদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

সূচী ঃ

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ ... ১

দেবেশ দাশ—সম্মেলন সভাপতির ভাষণ ৯

কালিদাস রায়—মূল সভাপতির ভাষণ ১৯

কুমুদরঞ্জন মল্লিক—সাহিত্য শাখার উদ্বোধকের ভাষণ— ৩৭

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—ভারতীয় সাহিত্য শাখার উদ্বোধকের ভাষণ ৪১

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়—সাহিত্য শাখার সভাপতির ভাষণ ৫৭

প্রমথনাথ বিশী—রবীন্দ্রসাহিত্য শাখার সভাপতির ভাষণ ৭৫

সজনীকান্ত দাস—কাব্য শাখার সভাপতির ভাষণ ৮৩

মন্মথ রায়—নাট্যসাহিত্য শাখার সভাপতির ভাষণ ৯৭

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—সংবাদসাহিত্য শাখার সভাপতির ভাষণ ১১৩

বিমল ঘোষ—শিশুসাহিত্য শাখার উদ্বোধকের ভাষণ ১২১

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—শিশুসাহিত্য শাখার সভাপতির ভাষণ ১৩৭

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ—সঙ্গীত শাখার সভাপতির ভাষণ ১৪৭

তারকচন্দ্র রায়—দর্শন শাখার সভাপতির ভাষণ ১৬১

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত—ইতিহাস শাখার সভাপতির ভাষণ ১৮৩

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ

পরিচিতি
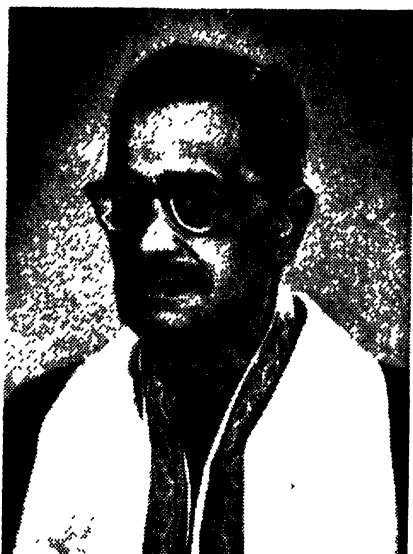
ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বীরভূম জেলায় এঁর জন্ম। ১৯২২ সালে ইংরেজী সাহিত্য নিয়ে এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এর পর পি, এইচ, ডি উপাধি লাভ করেন ১৯২৯ সালে। প্রথম জীবনে রিপন কলেজে কিছুদিন অধ্যাপনার পর প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। ১৯৩৫ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত তিনি রাজসাহী কলেজে প্রথমে উপাধ্যক্ষ এবং পরে অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ছিলেন। ইনি (১৯৫২-৫৭ সালে) পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য। এঁর লেখা উল্লেখ-যোগ্য গ্রন্থ—'Critical Theories and Poetic Practice in Wordsworth's Lyrical Ballads', 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', 'বঙ্গ সাহিত্য পরিক্রমা', 'বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা' প্রভৃতি।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ

সমাগত সুধীবৃন্দ ও সাহিত্য রসিকগণ,

কলিকাতা মহানগরীতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের এই ৩৭তম অধিবেশনে আপনাদিগকে সাদর আমন্ত্রণ ও অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। সাহিত্য সম্মেলনের সফলতা প্রধানতঃ আপনাদের সহৃদয় সহযোগিতার উপরই নির্ভর করে। এই অনুষ্ঠানে সাহিত্য তার নির্জন সাধনা থেকে বেরিয়ে এসে সুরসিক সামাজিক বৃন্দের কাছে তার গোপনচারী আত্মাকে উদ্‌ঘাটিত করতে উদ্যত হয়েছে। যে বৃহত্তর সমাজ পরিবেশে সাহিত্য নিজ প্রেরণা আহরণ করে, যার বক্ষোস্পন্দনের সঙ্গে নিজ আদর্শের তাল রক্ষা করে সে আপন প্রতিনিধিত্ব অনুভব করে, যার সামনে আপনার সুখ-দুঃখ, ঐশ্বর্য-রিক্ততা, সাধনবেগ ও গতিপথে বাধার কথা প্রকাশ ক'রে সে সুহৃদমণ্ডলীর কাছে নিজ অন্তরের ভার মুক্তির স্বস্তি পায়, আজ সাহিত্যের সেই পরম মিলন-লগ্ন উপস্থিত। একান্তভাবে আশা করি যে আমাদের আয়োজনের দীনতা, ব্যবস্থাপনার ত্রুটি, আরাম স্বাচ্ছন্দ্যের অপ্রাচুর্য সবই আপনাদের প্রসন্ন দৃষ্টির তলে লঘু হয়ে যাবে ও যে মূল উদ্দেশ্যের আকর্ষণে আমরা সমবেত হয়েছি তারই দাক্ষিণ্য আপনাদের কাছে বড় হয়ে উঠবে। আবার আপনাদের সুহৃদজন সুলভ স্বাগত সম্ভাষণ জানাই।

এ বৎসরের সম্মেলনের বৈশিষ্ট্য হল যে এটা রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উৎসবের অঙ্গীভূত ও নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন কর্তৃক রবীন্দ্র প্রশস্তি রচনার সমাপ্তি আয়োজন। ইংরেজী বর্ষের ঠিক প্রথম দিনে আমরা এই উদ্দেশ্যেই পশ্চিম সাগর বিধৌত বোম্বাই মহানগরীতে সমবেত হয়েছিলাম। সেই প্রারম্ভিক উৎসবে বিশ্বের মনীষী-বৃন্দ মিলিত হয়ে রবীন্দ্র প্রতিভার প্রতি ভক্তিনম্রচিত্তে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছিলেন। সেই উৎসবে আমরা পুলকিত বিস্ময়ে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বকবি আখ্যার সার্থকতা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করে-ছিলাম। রবীন্দ্রনাথ যে কেবল আমাদের ঘরের মানুষ নন, তিনি যে বিশ্ব আত্মার অতি নিকট আত্মীয়, বিশ্ব সাহিত্য জগতে তিনি যে একটি অভাবনীয় আবির্ভাব তার প্রচুর নিদর্শন পেয়ে আমাদের গৌরববোধ যেরূপ জাগ্রত হয়েছিল,

তেমনি দায়িত্ব বোধের ভারেও আমরা নুইয়ে পড়েছিলাম। আমাদের অনুরাগের ক্ষুদ্র শিশির বিন্দুতে সেই বিরাট ব্যোমচারী, জগৎ প্রদক্ষিণকারী রবিকে কি আমরা প্রতিবিম্বিত করতে পেরেছি—এই সংশয় আমাদের আনন্দের মধ্যে সূক্ষ্ম অতৃপ্তির মত বিঁধেছিল। বোম্বাই অধিবেশনে আমরা রবীন্দ্রনাথের বিশ্বব্যাপী ভূমিকার পরিচয় দেবারই আয়োজন করেছিলাম। কবির স্বদেশীয় ভক্তেরা এই বিশ্বের অর্ঘ্য থালায় তাঁদের নৈবেদ্য সাজাবার সেরূপ সুযোগ পাননি। সেই অতৃপ্ত আগ্রহের দিকে লক্ষ্য রেখেই স্থির হয়েছিল যে এই বৎসর সমাপ্তিতে আমরা আর একটি সম্মেলনে মিলিত হয়ে তাঁর সম্বন্ধে আমাদের নিজের কথা বলব ও রবীন্দ্র আবির্ভাব যে আমাদের কাছে কত অসাধারণ গৌরব মণ্ডিত তাও প্রকাশ করব। সেই সঙ্কল্প পূরণের জন্যই একই বর্ষে দ্বিতীয় অনুষ্টানের আয়োজন হয়েছে। আমাদের অর্ধসমাপ্ত পূজা যদি পূর্ণ হয় তবেই এই অধিবেশনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

কলিকাতা মহানগরীতে রবীন্দ্র জন্ম শত বার্ষিকীর উদযাপন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কলকাতা যে শুধু কবির জন্মস্থান ও আমরা যে কবির পূর্বপুরুষের আবাসে এই মিলন মণ্ডপ নির্মাণ করেছি, এটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হলেও সব চেয়ে বড় কথা নয়। এই নগরী কবি প্রতিভার উন্মেষক্ষেত্র, তাঁব বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র ও তাঁর কার্যজীবনে গভীর ও বহুমুখী প্রেরণার উৎস। পল্লী বাঙলা —শিলাইদহের বিপুল পদ্মা প্রবাহ ও নদীমাতৃক গ্রামগুলি এবং শান্তিনিকেতনের দিগন্ত প্রসারী, মুক্ত প্রান্তর তাঁর কবি-আত্মাকে বিচিত্র বর্ণ-অনুরঞ্জিত, সুরভিত বিকাশের প্রেরণা দিয়েছে তা সত্য। কিন্তু তাঁর প্রতিভা-স্ফূরণে নানা কর্ম সংঘাতময়, বিপুল জনস্রোতে উদ্বেল, উদাস বেগচঞ্চল মহানগরীও যে একটা অপরিহার্য অংশ ছিল তা আমাদের প্রকৃতি সৌন্দর্যের মোহাঞ্জণলিপ্ত চোখে সহজে পড়ে না। মোটকথা, রবীন্দ্রনাথের জন্মস্থান ছাড়াও কলকাতার একটা অন্য পরিচয় আছে, সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-আলোচনায় এর বিশিষ্ট প্রভাবকে আমরা বিশেষ স্থান দিই না। শিলাইদহ ও শান্তিনিকেতনের খ্যাতি একান্ত ভাবে রবীন্দ্র সাহচর্য নির্ভর বলেই আমরা কবি জীবনে তাদের ব্যাপক নির্দেশ করে থাকি। যাই হ'ক কলকাতা পল্লীর গৌরবের পরিমাণ নিয়ে ঈর্ষা করতে চায় না—সে নিজের ন্যায্য প্রাপ্যটুকু পেলেই সন্তুষ্ট থাকবে।

কলকাতার সঙ্গে বালক রবীন্দ্রনাথের যে কি নিবিড় সম্পর্ক ছিল, তা তাঁর জীবন স্মৃতি ও ছেলেবেলার আত্ম কাহিনী থেকেই পরিস্ফুট। আমরা এই অতি আধুনিক যুগে কলকাতার সঙ্গে পল্লীগ্রামের যে চরম বৈপরীত্য ও নিদারুণ বিরোধ দেখতে অভ্যস্ত হয়েছি, রবীন্দ্রনাথের বাল্য-জীবনে উভয়ের মধ্যে

সেই অহি-নকুল সম্পর্ক ছিল না। বিশেষতঃ সহরের সেই স্বল্প লোক অধ্যুষিত ফাঁকার যুগে ও বনেদি বড় লোকের সুবিস্তীর্ণ গৃহ-পরিসরে পল্লীর শ্যামশ্রী, ওর কল্পনার লুকোচুরি খেলার নির্জন কোণ, ওর প্রতিবেশীর জীবন যাত্রার সঙ্গে গবাক্ষের ফাঁক দিয়ে আবছা পরিচয়, ওর সাঁতারের সরোবর ও ছায়াঘন বটগাছ প্রভৃতি পল্লীজীবন-সুলভ বিস্তার ও উদার মুক্তির অসদ্ভাব ছিল না। প্রতিভার উন্মেষ-রহস্য অবশ্য অনির্ণেয়,—প্রমথ চৌধুরী বলেছেন যে শিল্পীর বন্ধনেই মুক্তি। তবু হয়ত অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে এই অর্ধ অবরোধের মধ্যে যে অতৃপ্ত স্বাধীনতা ক্ষুধা বালক চিত্তকে এক অনির্দেশ্য মুক্তি কামনায় পীড়িত করছিল তাই তাঁর পরিণত কবিকল্পনার অনন্ত-বিহারের প্রথম প্রেরণা যুগিয়েছে। তাই ভৃত্য-রাজতন্ত্রে পালিত হয়েও রবীন্দ্রনাথ পরিপূর্ণ মানবতা বোধের পূজারী হয়েছেন; জানলার ফাঁক দিয়ে জগৎ ও জীবনকে দেখে তিনি জীবনের উদারতম রূপকে প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রকৃতি প্রেয়সীর অর্ধাবগুণ্ঠিত মুখ তাঁর প্রাণে যে ঔৎসুক্য জাগিয়েছিল তারই পরিণতি শিলাইদহ ও শান্তি-নিকেতনের লীলাময় প্রকৃতি প্রেম তন্ময়তায়। যে সব পাখী জন্ম থেকেই বনে স্বচ্ছন্দ বিচরণে অভ্যস্ত তাদের গান কাকলীকে অতিক্রম করে না; যে দু' একটা পাখী পিঞ্জরের ফাঁক দিয়ে বনশোভা দেখে ও সংসার কোলাহলের মধ্যে এক আধটা তান আলাপের অবসর পায় তারাই হয়ত পিঞ্জর মুক্তির পর পক্ষী সমাজে শ্রেষ্ঠ গায়কের আসন লাভ করে। পাখী সমাজে যাই হ'ক মানবকবি সমাজে রবীন্দ্রনাথ এই বিরল ব্যতিক্রম।

আমরা যদি অনুমানের অনিশ্চয়তা ছেড়ে প্রমাণিত তথ্যের দৃঢ় ভূমিতে পদক্ষেপ করি তবে রবীন্দ্র প্রতিভা উন্মেষে কলকাতার প্রভাব আরও প্রবলতর বলে প্রতিভাত হবে। তাঁর 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কলকাতার এই বস্তুতান্ত্রিক আবহাওয়াতেই ঘটেছিল। সদর ষ্ট্রীটের যে বাড়ী থেকে তরুণ কবি সূর্যোদয়ের কিরণ সম্পাতের সঙ্গে সমগ্র জগতের প্রীতিপূর্ণ দিব্য দৃষ্টি মিশিয়ে ছিলেন সেইটাই তাঁর কাব্য ভাগীরথীর গঙ্গোত্রী। তাঁর জীবনের বহুমুখী কর্মারম্ভের সবগুলি উৎস এই নগরীর প্রাণচাঞ্চল্যের মধ্যেই উদ্ভূত হয়েছিল। কবি তাঁর বাল্য-জীবনের কলিকাতার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা যেন কিশোর কল্পনারঞ্জিত মায়া-পুরীর মত মনে হয়। ঠাকুর বাড়ীর যে আবহাওয়া তাঁকে একদিকে বাধা-নিষেধের বেড়া দিয়ে অপর দিকে সাহিত্য সঙ্গীত সাধনার দৃষ্টান্ত ও উৎসাহ দিয়ে তাঁর কল্পনা উচ্চৈঃশ্রবার উপর যুগপৎ লাগাম ও অঙ্কুশ প্রয়োগ করেছিল সেটা কলকাতার বাইরে দুর্লভ ছিল। তাঁর হিন্দু মেলার সঙ্গে সংশ্রবের মধ্য দিয়ে স্বাদেশিকতার স্ফূরণ, রাখীবন্ধন উৎসবে যোগদান, অভিনয় ও নাট্য প্রযোজনায়

অংশ গ্রহণ—এ সবই এই মহানগরীব দান। কলকাতাব সমাজ-জীবনেব আকর্ষণও তাঁর উপর প্রবল ভাবে পড়েছিল। তাঁর ধর্মজীবন ব্রাহ্ম সমাজের নিবিড় সাহচর্যে ও তাঁর পিতার দৃষ্টান্তে এবং ধর্মবিষযক বাদ বিতণ্ডার উত্তেজনায় এখানেই আত্ম-সমীক্ষায় স্থির হয়েছিল। কলকাতার তত্ত্ব জিজ্ঞাসু যুবক মধ্য-জীবনে শান্তিনিকেতনের ঋষিরূপে প্রকাশিত হন।

কিন্তু এ সব ত কবিজীবনে বাহ্য। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সাধনাব মধ্যেও মহানগরীর জটিল জীবনচ্ছন্দ যে চরণক্ষেপ করেছে তার প্রমাণও বিরল নয়। তবে পল্লী অঞ্চলের এককেন্দ্রিক জীবন ধাবার অন্তর্গূঢ় চেতনাটি যত সহজে ধবা যায় কলকাতার দুর-বিক্ষিপ্ত নানামুখী কর্মজালের মধ্যে তার পরিচয়টি তত স্বপ্রকাশ নয়। শিলাইদহের ঘন পত্রপল্লব ও অনন্ত প্রবাহিনী নদীর মধ্যে যে আত্মা সূর্যোদয়ের মতই সুস্পষ্ট, শান্তিনিকেতনেব ঊষব প্রান্তরে যার আবির্ভাব নিঃশব্দতার গভীরে মন্ত্রের ন্যায় ধ্বনিময়, কলকাতার কলকারখানার ধোঁয়ায় ও কোলাহলে, হাজার রকম কাজের ও অকাজেব ভিড়ে চিত্ত বিক্ষেপকারী শত শত হুজুক ও আমাদের অস্থিরতায় তার সন্ধান মেলা দুরূহ। কবিতা সাধারণতঃ বিশেষের চিহ্ন লুপ্ত করে আমাদের নির্বিশেষ ও সার্বভৌমের রাজ্যে নিয়ে যায়, তার সূতিকাগারের চারিদিকে এক রহস্য যবনিকা টেনে দেয়। যেখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে পরিবেশের একটি অসীম দ্যোতনা নিহিত কাব্য সেখানেই পরিবেশ সচেতন হয়ে ওঠে। সুতরাং রবীন্দ্রকাব্যের মধ্যে সহর-প্রতিবেশের ছাপ ওর আদর্শ জ্যোতিমণ্ডলের মধ্যে অলক্ষিতই থাকবে। তাঁর 'চিত্রা'র 'নগর সঙ্গীত' কবিতাটিতে নাগরিক জীবনের খরবেগ, আবর্তসঙ্কুল, আবিল প্রবাহ যে তাঁর কবি কল্পনাকে সাময়িক ভাবে আকৃষ্ট ও আবিষ্ট করেছিল তার নিদর্শন বহন করে।

তবে তাঁহার গল্প উপন্যাস-নাটকে সহর জীবনের ছাপটি উজ্জ্বলবর্ণে পরিস্ফুট। পল্লীর মানুষ কলকাতার হাঁপধরান, নিষ্করুণ জনাকীর্ণতায় এসে পড়লে যেমন একটা আশ্রয়হীনের অস্বস্তি অনুভব করে তার কাব্যরূপ 'বধূ'-তে ও গল্পরূপ ফটিকের করুণ কাহিনীতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাঁর 'ঠাকুরদাদা' 'কাবুলিওয়ালা'' সহরের মধ্যে পল্লীস্মৃতিরোমন্থনের আখ্যান। 'নষ্টনীড়' ও 'চোখের বালি' কলকাতার ক্ষুদ্র, আত্মকেন্দ্রিক পরিবার জীবনে কেমন করে জীবন যাত্রার আবর্তনের পাকে পাকে মনে গভীর দাগ কেটে বসে নীরব বিপ্লব ঘটে যায়, অন্তর গুহায় আগুন অল্প অল্প ধূমায়িত হতে হতে হঠাৎ একদিন প্রদীপ্ত শিখায় জ্বলে উঠে তার চমৎকার উদাহরণ। পল্লীগ্রামে খবর ছড়িয়ে পড়ে, কুৎসা মুখর হয়ে উঠে ও অত্যুৎসাহী প্রতিবেশী মণ্ডলী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের

খোঁচা দিয়ে সচেতন করে তোলে। গল্পে ভূপতি ও চারু ও উপন্যাসে মহেন্দ্র হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করে যে তাদের মন কক্ষপথ পরিবর্তন করেছে, তাদের ভালবাসা পাত্রান্তরে ন্যস্ত হয়েছে। সহরের বহিঃসম্পর্কহীন জীবনযাত্রাতেই এই অতর্কিত পথবদল সম্ভব। 'গোরা'য় কলিকাতায় উদ্ভূত জীবন সংঘাত সমগ্র দেশের বিস্তীর্ণ পটভূমিকায় ছড়িয়ে পড়েছে, গোরা-সুচরিতার, বিনয়-ললিতা ও আনন্দময়ী-পরেশের ব্যক্তিগত সমস্যা একটা প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যপ্তির মধ্যে তীক্ষ্ণতাকে হারিয়েছে। 'ঘরেবাইরে', 'চতুরঙ্গ' প্রভৃতি উপন্যাসেও ঘটনাস্থল যেখানেই থাক, কলকাতার মাটি থেকে অঙ্কুরিত বিপ্লববাদ সমস্ত ঘটনা প্রবাহকে অনিবার্য ভাবে নগরকেন্দ্রিক করে তুলেছে। কলকাতার সমাজ বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য ও মানস প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথের গল্প উপন্যাসে একটা শাশ্বত রূপ পেয়েছে।

তাঁর প্রথম যুগের অধিকাংশ নাটকেই কলকাতার জীবন থেকে বিষয় বস্তু ও নাট্য প্রেরণা সংগৃহীত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'শেষ রক্ষা', 'চিরকুমার সভা', 'বৈকুণ্ঠের খাতা' প্রভৃতি নাটক প্রহসনে কলকাতার যে যৌবনোচ্ছল, হাস্য পরিহাসে উতরোল, প্রণয়লীলায় আবেশময় রূপটি ফুটে উঠেছে তা আজকালকার রাজনীতিমত্ত, বৈষয়িকতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত, শোভাযাত্রায় সচল ও বক্তৃতায় মুখর কলকাতার সঙ্গে নিঃসম্পর্ক বলে মনে হতে পারে। কবির প্রথম যৌবনে কিন্তু কলকাতার এই ইটকাঠের মূর্তি তরুণ প্রাণের আনন্দ হিল্লোল, ও অসম্ভব আশা-কল্পনার যাদুমন্ত্রে রূপকথার মায়ারাজ্যে রূপান্তরিত হয়েছিল। যে কবি এর বস্তুকঙ্কাল ভেদ করে অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য-সুষমার স্বরটি আবিষ্কার করেছিলেন, হরিপদ কেরাণীর জীর্ণবস্ত্রের অন্তরালে আকবর বাদশার রাজবেশ দেখেছিলেন, কিনু গোয়ালার গলির পুঞ্জীভূত আবর্জনাস্তূপের পিছনে দিব্য দীপ্তির ঝলকে মুগ্ধ হয়েছিলেন, বিবাহ বাড়ীর বীভৎস কোলা-হলের মধ্যে সানাইএর সুরের সৌন্দর্য লোকের বার্তা শুনেছিলেন, তিনি শুধু জন্মসূত্রে নয়, প্রতিভার রাজকীয় অধিকারে এই মহানগরীর মালিকানা স্বত্বে প্রতিষ্ঠিত।

বন্ধুগণ, রবীন্দ্রজীবনের সঙ্গে কলকাতার সম্পর্কের কথা সবিস্তারেই আলোচনা করলাম। আশাকরি আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইনি। বোধহয় এইটিই রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শেষ অনুষ্ঠান। আমরা এই উপলক্ষ্যে অসংখ্য সভা করেছি। অসংখ্য বক্তৃতা করেছি ও শুনেছি, প্রশস্তি রচনার একটি বর্ষব্যাপী মালা গেঁথেছি। সে মালা কি কবির কণ্ঠে সত্য সত্যই পৌঁছেছে? তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি সত্যই স্পষ্টীকৃত হয়েছে?

তাঁকে কি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনচর্যার মধ্যে নামিয়ে আনতে পেরেছি, না আমাদের উপাস্য তেত্রিশ কোটি দেবমণ্ডলীর মধ্যে নবতম দেবমূর্তিরূপে অনায়ত্ত ভাবলোকে তাঁর প্রতিষ্ঠা করেছি? আশাকরি এই প্রশ্নের আপনারা একটা বাস্তব মীমাংসা করতে পারবেন। আমি শুধু একটি কথা বলেই আমার বক্তব্যের উপসংহার করব। আজ বিজ্ঞান মারাত্মক রূপ নিয়ে আমাদের সামগ্রিক ধ্বংস সাধনে উদ্যতবজ্র হয়েছে। আমাদের সাধারণ নীতিজ্ঞান ও কল্যাণবুদ্ধি এই ধ্বংসলীলা নিরোধে অক্ষমতা দেখাচ্ছে। বিশ্বের এই সঙ্কটমূহূর্তে রবীন্দ্রনাথ এই নূতন জীবনবাণী নিয়ে আমাদের সামনে আবির্ভূত হয়েছেন। এই বাণী ভারতের শাশ্বত, বহুপরীক্ষিত বাণী। পাশ্চাত্ত্য কবি ও মনীষিগণ ইউরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির আর কোন ভবিষ্যৎ দেখতে পারছেন না। প্রচলিত অর্থনীতি, বিজ্ঞান শাসিত জীবন যাত্রা ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা তাঁদের মতে ব্যর্থ চক্রাবর্তনে জীবনীশক্তি নিঃশেষ করছে—বিশ্ব-জোড়া আঁধারে কোন নূতন পথ খুঁজে পাচ্ছে না। সমস্ত বিশ্ব রবীন্দ্রনাথকে প্রশস্তিজ্ঞাপন করছে শুধু কবি বলে নয়, নব জীবনবেদের উদগাতারূপে। এই অবস্থায় আমরা যাঁরা নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন আহ্বান করে রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রতি পূজার্ঘ নিবেদনের জন্য সমবেত হয়েছি, তাঁদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য কি হবে তা নির্ধারণ করারও দায়িত্ব নিয়েছি। আমরা রবীন্দ্রনাথের কাব্য সৌন্দর্যে শুধু মুগ্ধ না হয়ে তাঁর সামগ্রিক জীবন দর্শন, তাঁর অধ্যাত্ম প্রত্যয়, তাঁর উদার ও বিশ্বজনীন, সর্বসমন্বয়কারী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করবার জন্য যদি প্রস্তুত হই, ও তাঁর বাণী যদি আমাদের সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে পারি তবেই আমাদের রবীন্দ্রপূজা সার্থক হবে। আসুন আমরা সকলে রবীন্দ্রনাথের চির-অমর আত্মার নিকট তাঁর জীবন নির্দেশ অনুসরণের শক্তি প্রার্থনা করে নিই।

বন্দে মাতরং।

দেবেশ দাশ

সম্মেলন সভাপতির ভাষণ

পরিচিতি

দেবেশ দাশ

১৯১১ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে এঁর জন্ম। শিক্ষা সুরু হয় কলকাতায়, শেষ হয় ইংলণ্ডে। ইংরাজী সাহিত্য অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে নিখিল ভারতীয় প্রতিযোগিতায় বৃত্তি পেয়ে ইনি ইংলণ্ডে যান এবং আই, সি, এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৩৪ সালে ইনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে চাকুরী জীবনের বেশীর ভাগ অংশই দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাজে অতিবাহিত করছেন। ইউরোপে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন দুবার। এঁর প্রথম গ্রন্থ 'ইয়োরোপা' রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এরপর সরকারী কাজের চাপে সাময়িকভাবে সাহিত্য-সাধনা অবলুপ্ত হয় এবং পরে আবার তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে ফিরে আসেন। এই পর্বে তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'রাজোয়ারা'। এঁর 'রক্তরাগ' ভারতীয় ভাষার উপন্যাস হিসাবে জার্মান ভাষায় অনুবাদ প্রদর্শিত হবার গৌরব লাভ করে। এঁর অন্যান্য গ্রন্থ —'প্রেমরাগ', 'অর্ধেক মানবী তুমি', 'রোম থেকে রমনা' প্রভৃতিও উল্লেখযোগ্য। ইনি নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন প্রতিষ্ঠানটির গত কয়েক বৎসর যাবৎ সভাপতি রূপে নির্বাচিত হবার গৌরব লাভ করছেন।

দেবেশ দাশ

সম্মেলন সভাপতিব ভাষণ

নিখিল ভাবত হতে আহবিত আমাদেব এই দীপশিখা। এব আলোকে বাংলাব পূণ্য মন্দিবে আমাদেব পবম প্রণাম চবম সার্থকতা লাভ করুক।

দীর্ঘ পনেব বছব পবে আমবা আবাব বাংলাব শ্যামল কোলে সাহিত্য সম্মেলনে সমবেত হযেছি। গৌহাটি থেকে আমেদাবাদ, দিল্লী থেকে ব্যাঙ্গালোব পর্যন্ত এই বিবাট দেশেব প্রত্যেক গুরুত্বময কেন্দ্রে আমবা সংস্কৃতিব সাগবসঙ্গমে তীর্থযাত্রা কবেছি। বাংলা সাহিত্যেব বাণী সঙ্গে নিযে গেছি। সেখানকাব বাণী ও মনেব সঙ্গে কবেছি বিনিময। কবেছি স্থাপিত আত্মাব আত্মীযতা। ভাবতেব প্রতি বাজ্যে প্রায চল্লিশটি সহবে আমাদেব সভ্যমণ্ডলী বিস্তৃত। করুণাহীন জীবন সংগ্রামেব নিষ্কৃতিহীন দিনবজনীব মধ্যেও আমবা বাংলাব দীপশিখা উজ্জ্বল বাখতে চেষ্টা কবেছি। ভুলিনি যে ভাবতেব সামগ্রিক সংস্কৃতিব জন্যই বাংলাব সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে উজ্জ্বল বাখতে হবে।

বাংলাব দীনসেবক আমবা দূব হতে দূবান্তবে গিযেও সর্বদা মনে বেখেছি কবিগুরুব সান্ত্বনাবাণী—'তাই লিখি দিল বিশ্ব নিখিল দু বিঘাব পবিবর্তে''। সেই বিশ্ব নিখিলকে ভাবতেব সব ভাষাব মধ্যে একমাত্র বাঙ্গালীব এই সাহিত্য প্রতিষ্ঠানই পাঁচ বছব আগে আগ্রা অধিবেশনে ইউনেস্কোব মাধ্যমে আমন্ত্রণ কবে বাংলাব বাণীব সঙ্গে নব পবিচয স্থাপন কবে দিযেছিল। সেই বিশ্ব নিখিলকে এই ইংবেজী বছবেব উদ্বোধন সমযে আবাব বোম্বাই অধিবেশনে আপন হৃদযে আহ্বান কবেছিল। বিশ্বেব অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে নিজেকে অনুভব কবেছিল। পৃথিবীব্যাপী ববীন্দ্রশতবার্ষিকী উৎসবমালাব যবনিকা সর্বপ্রথম এই সম্মেলনই উত্তোলন কববাব গুরু দাযিত্ব পালন কবেছিল। কবিগুরুব সত্তব বৎসব বযঃপূর্তি উৎসবে শবৎচন্দ্র অভিনন্দন বচনা কবে লিখেছিলেন—''তোমাব প্রতি চাহিযা আমাদেব বিস্মযেব অবধি নাই।'' তেমনি বিস্মযভাবে অভিভূত হৃদযে অবনত শিবে আমবা আজ নিবেদন কবছি—

ওগো মা, তোমায দেখে দেখে
আঁখি না ফিবে!

তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে।

আমাদের তীর্থযাত্রার মধ্যে সর্বত্র রবীন্দ্রনাথের ধ্যানের ভারতের ঐক্য আর অন্তরের একীকরণের মহান চিত্র দেখেছি এবং দেখাবার চেষ্টা করেছি। এক দেশ এক আত্মার বন্ধনে মণিহার গাথা ভারতকে তার সাহিত্যে গ্রথিত করবার স্বপ্ন দেখেছি। ভূগোলের সীমান্ত কৃত্রিম, ইতিহাসের রূপান্তর ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু অন্তরের অসীমতায় মানুষের মুক্তির যে সৃষ্টি, সাহিত্যের স্বর্গলোকে তার যে রূপায়ণ কবিগুরু করেছেন তা বিশেষ করে নিখিল ভারতের। যে সাহিত্য তিনি সৃষ্টি করেছেন, যে স্বপ্ন দেখেছেন ও যে সাধনায় মগ্ন থেকেছেন তা বাংলা দেশের সীমা অতিক্রম করে, বাংলা ভাষার বাধা বিলোপ করে নিখিল ভারতকে দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করে তুলেছে। বেদমন্ত্রের মত সনাতন সে বাণী আধুনিক গীতিকবিতার মত স্নিগ্ধ সুন্দর।

আজ থেকে ষাট বছর আগে এই কলকাতা সহরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রদেশের বিশিষ্ট নেতাদের নিজ ভবনে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সেই ঘটনাকে তিনি সম্পূর্ণ নিজস্ব ভঙ্গিতে স্মরণীয় করে নিলেন। নিমন্ত্রিতদের অনেকেই বাংলা জানতেন না। কিন্তু এমনি বাংলায় তিনি একটি গান রচনা করলেন যা সর্বভারতের কাছে সহজ-বোধ্য হয়ে গেল। সেই গানটি: অয়ি ভুবনমনোমোহিনী।

ভারত আত্মার প্রতিমূর্তি, ভারতবোধের পূর্ণ প্রতীক রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ও প্রেরণা ভারতের সর্বত্র সচেতনে ও মনের অবচেতনে হঠাৎ প্রকাশিত হতে দেখছি। একটি ঘটনার উল্লেখ করি। কয়েক বছর আগে বিশ্ববিখ্যাত বিদেশী নেতাদের সংবর্ধনার জন্য একটি রাজসিক অনুষ্ঠান হয়েছিল। এই উপলক্ষ্যে একজন প্রসিদ্ধ অবাঙ্গালী কবির বিশেষ ভাবে রচিত উদ্বোধন সঙ্গীত হচ্ছিল। সঙ্গীতলহরী বিপুল জনতার অন্তর মুগ্ধ করে তুলছে এমন সময় পরিচিত ভঙ্গি, সুর ও শব্দরাশি মনকে সচকিত করে তুলল। এ ত কবিগুরুর একটি অমর সঙ্গীতের সুন্দর অনুরণন। না, অনুকরণ বলব না। কারণ, যা এই রচয়িতার মগ্ন চৈতন্যের মধ্যে মিশে গিয়ে অস্তিত্বের অংশ হয়ে গিয়েছে তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশকে অনুকরণ বলি কোন প্রাণে?

আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে
কখন আপনি

তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী!

দেশকে বিশ্বময়ীব বিশ্বমায়ের রূপে ধ্যান করে রবীন্দ্রনাথ শুধু বঙ্গবাণী নয়, বঙ্গের বাইরে যাঁরা জীবন অতিবাহিত করছেন তাঁদেরও নূতন দৃষ্টি ভঙ্গি এনে দিয়েছেন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সেই শিক্ষা আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করছি।

"বাহ্য সাম্যকে যারা চায় তারা ভাষা বৈচিত্র্যের উপর স্টীমরোলার চালিয়ে আপনার রাজরথের পথ সমভূম করতে চায়! পাঁচটা বিভিন্ন ফুলকে কুটে দলা পাকালেই তাকে শতদল বলা যেতে পারে না।....বাইরের যে একতা তা হচ্ছে প্রলয় তাই একাকারত্ব; আর অন্তরের যে একতা তা হল সৃষ্টি,—তাই ঐক্য।"

সেই ঐক্য সাধনাই সাহিত্য সম্মেলনে সাধনা।

সেই সাধন সূত্রে আমরা বিভিন্ন রাজ্যের মনীষীদের সঙ্গে মিলিত হই। সেই সূত্রে দেখেছি কি গভীর ভাবে তাঁরা বাংলা সাহিত্যের প্রতি, বিশেষত রবীন্দ্রনাথের প্রতি ঋণ ও কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। তার দৃষ্টান্ত লিখিত নজীর দিয়ে দেখতে হবে না। শুধু পুঁথিতে নয়, পথেতে; শুধু মৌখিক কথাতে নয়, মানসে গাথাতে তা আকাশের নীলিমার মত সহজে বিরাজ করছে। এ ত শুধু প্রভাব নয়; এ যে প্রেরণা।

রাজ্যে রাজ্যে তারই দীপ্ত শিখা আমাদের অন্তস্তলকে আলোকিত, পুলকিত করে তুলেছে। আমরা শুনেছি জব্বলপুরের পৌর প্রধান মেয়র ও প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ভবানীপ্রসাদ তেওয়ারীর কণ্ঠে মর্মর প্রস্তরচ্ছায়ায় নর্মদা লহরীকে উদ্বেলিত-করা রবীন্দ্রসঙ্গীত; পূব বাংলার মত মেঘে ঢাকা জল থৈথৈ কেরলে মাঝি মাল্লার গান:

আমার সোনার কেরলা
আমি তোমায় ভালবাসি;

ধূ ধূ বিস্তৃত মরু প্রান্তরে বিশাল বক্ষ রাজপুতের ব্যাকুল কণ্ঠে কথা ও কাহিনীর আবৃত্তি; পশ্চিম ভারতের শিক্ষিত কিন্তু স্বাধীনতাহীন অন্তঃপুরিকার দীর্ঘশ্বাস:

আমি সামান্য মেয়ে
আমায় তুমি চিনবে না ক'

*   *   *

হায়রে সামান্য মেয়ে
হায়রে বিধাতার শক্তির অপব্যয় ;

পীর পাঞ্জাল গিরিশৃঙ্গের উপর তুষার শুভ্রতা স্বর্ণরশ্মিতে রঞ্জিত হয়ে ওঠার সময় কাশ্মীরী যুবকের আবেগচঞ্চল মৃদুভাষ ঃ

এই পশ্চিমের কোণে রক্তরাগ রেখা
নহে কভু সৌম্যরশ্মি অরুণের লেখা
তব নব প্রভাতের। এ শুধু দারুণ
সন্ধ্যার প্রলয় দীপ্তি।
স্বার্থদীপ্ত লুব্ধ সভ্যতার
মশাল হইতে লয়ে শেষ অগ্নিকণা।

জীবনের বিশিষ্ট ক্ষেত্র থেকেও এমন প্রচুর উদাহরণ পেয়েছি। শুধু একটি মাত্র জীবনী কথা উল্লেখ করি। দু বছর আগে সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনে আপনারা শুনেছিলেন যে কর্ণাটকের একজন তখনকার দিনের অজানা সন্তান যৌবনে, বহু বিশিষ্ট ভারতীয়ের মতই গীতাঞ্জলি মূল ভাষায় আস্বাদ করবার জন্য বাংলা শিখতে আরম্ভ করেন। আদর্শ ও স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি কালে পূজ্য রাজনীতিক, কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী ও রাজ্যপাল হয়েছিলেন। এই শ্রীদিবাকরের মত আরো বহু মনীষীর এরূপ স্বীকৃতি আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে।

এমনি আরো কত ঘটনা আজ মনে পড়ছে। প্রাচীনকালে স্বর্ণ ভূমি বলে পরিচিত ব্রহ্মদেশে জাপানী আক্রমণ স্থরু হল। মাথার উপরে বোমার হামলা ; চোখের সামনে দুর্গম পাটকাই বুম শৈলমালা ; পায়ের নীচে বর্মা আসাম সীমান্তের "সবুজ নরক" ; চারি ধারে ক্ষুধা তৃষ্ণা দস্যু আর মৃত্যু। তার মধ্য দিয়ে ভারতের দিকে এগিয়ে আসছে সভ্যতা ও সুখের আশ্রয় থেকে উৎপাটিত অসহায় জনস্রোত। জীবনের মধ্যে মরণের সঙ্গে মুখোমুখী হয়ে বহু লোক, বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে শাশ্বত শক্তির সন্ধান পেয়েছিলেন। কেমন করে আমি ভুলব আমাদের আগ্রা অধিবেশনের হিন্দী সাহিত্য শাখার সভাপতি স্বর্গীয় প্রসিদ্ধ কবি বালকৃষ্ণ শর্মা নবীনের কথা—যিনি মৃত্যু-

শয্যায় অসহ্য যন্ত্রণা চেপে হাসিমুখে আবৃত্তি করেছিলেন—"মোর মরণে তোমার হবে জয়?"

এই প্রসঙ্গে ফরাসী মহিলা কবি কম্পনেস্ দ্য নুয়াইলে ও বিখ্যাত ফরাসী প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেঁসোর কথা মনে পড়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ফ্রান্সের কি পরিণতি হবে তা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। বিরাট জার্মান কামান 'বিগ বার্থথার' গর্জন উপেক্ষা করে তাঁরা গীতাঞ্জলির মধ্যে সান্ত্বনা সন্ধান করেছিলেন। আরো মনে পড়ে তরুণ ইংরেজ কবি উইলফ্রেড ওয়েনের কথা। ১৯১৮ সালে যে দিন বিশ্বযুদ্ধের শান্তি ঘোষণা করা হল সেই দিনই তিনি শত্রুর শেলের আঘাতে নিহত হন। তার পকেট বুকে সেদিন লেখা ছিল কবিগুরু অমৃত নিষিক্ত সান্ত্বনাবাণী।

মৃত্যু থেকে অমৃতে, জীবনের অমৃতে শরণ নিতে চাই।

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বরেণ্য ফরাসী সাহিত্যিক আঁদ্রে জিদের মতে মৃত্যু সম্বন্ধে এত গভীর সুন্দর মন্ত্র পৃথিবীতে আর কোন কবি রচনা করেননি। সেজন্যই রবীন্দ্ররচনায় জীবনের শুধু সংকেত নয় সন্ধান, শুধু আবাহন নয় আরাধনা পাই। আমাদের গত বোম্বাই অধিবেশনে বিখ্যাত মার্কিণ মনীষী নর্ম্যান কাজিন্স্ বলেছিলেন যে তাঁর যৌবনকালে সমৃদ্ধ আমেরিকায় বিষম আর্থিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল। দেশব্যাপী নিরাশার মধ্যে তিনি ও তাঁর মত বহু সত্য সন্ধানী রবীন্দ্ররচনায় নূতন আশা ও বাস্তব জীবনের ক্ষয় ক্ষতির হিসাবের উর্ধে নিস্কৃতি পেয়েছিলেন। নিত্য তুষারাবৃত আইসল্যাণ্ডের সাহিত্যিক ম্যাগনুসন বোম্বাইয়ে আমাদের শুনিয়ে গেছেন যে তার প্রকৃতির নিষ্ঠুর লীলার দেশে রবীন্দ্রনাথের মরণের খেলার রূপ জীবনকে অপরূপ মহিমায় দেখতে শিখিয়েছে। আঁদ্রে জিদের ভাষায় "তাঁর কবিতা জীবনের প্রতি প্রশান্ত দৃষ্টিপাতকারী এক মহান স্বপ্নদ্রষ্টার মন্ত্র।....তাঁর রচনায় মানবের পরিপূর্ণ রূপ ও বিশ্বে তার প্রকাশ খুঁজে পাওয়া আমাদের অশান্ত আত্মার পক্ষে কি স্নিগ্ধ অভিজ্ঞতা।"

বহির্জগতের কাছে কবিগুরুর এই প্রকাশ শুধু বিস্ময় সৃষ্টি করেনি। রাশিয়া প্রভৃতি দেশে তাঁর সাহিত্যের অসামান্য জনপ্রিয়তা ত স্থূল কথা। বস্তুতন্ত্রে সমৃদ্ধ বহির্জগৎ যে তাঁর মাধ্যমে প্রাচ্যবাণীর মধ্যে মানব ও অতিমানব জীবনের নব ও দিব্য অর্থ খুঁজে পেল তার চেয়েও বড় কথা আছে। বহু পাশ্চাত্ত্য মনীষী সে তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু জগৎ যে রবীন্দ্র সাহিত্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সংহত সামঞ্জস্যময় জীবনের রূপ খুঁজে পেল সেটা আরো এই আবিষ্কারই এই শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা, মহত্বপূর্ণ ঘটনা।

এক সময়ে ঐশ্বর্যদৃপ্ত পৃথিবী শুনে স্তম্ভিত হয়েছিল যে পৃথিবীর সবচেয়ে

আলোকোজ্জ্বল নগরী নিউইয়র্কের চেয়ে একটি কমলকলি কবির কাছে বেশী তাৎপর্যপূর্ণ। অন্তরে সম্পদের প্রতি উদাসীনতাকে তিনি যে ভর্ৎসনা করেছিলেন তাতেও পাশ্চাত্ত্য জগৎ আশ্চর্য হয়েছিল। তারা ভারতের অবনত পরপদানত অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিল যে কবির বাণী যে যুক্তিগ্রাহ্য নয় ভারতবর্ষই তার প্রমাণ। দীপ্ত উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, যে ধূলিতে ভারতের মানব, বিশ্বের বঞ্চিত লাঞ্ছিত মানব দলিত সেই ধূলিকণা তাঁর কাছে পবিত্র। তবু সেই যুগেই দার্শনিক সাহিত্যস্রষ্টা উইল ডুরাণ্ট তাঁর বই "দি কেস ফর ইণ্ডিয়া" উৎসর্গ পত্রে রবীন্দ্রনাথকে নিবেদন করেছিলেন— "আপনিই সেই কারণ যে জন্য ভারতের স্বাধীন হওয়া উচিত।"

আজ সেই স্বাধীন ভারতে "উচ্চ যেথা শিব", সেই স্বর্গে পৃথিবীর সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে আমরা রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উৎসব করছি। কিন্তু উৎসব পালন ও শ্রদ্ধা নিবেদনই সমাপন নয়; এ শুধু উদ্বোধন।

নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ,
ভারতের সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

সেই স্বর্গ সাধনার জন্য আমাদের প্রত্যেকের বিশেষ দায়িত্ব আছে। সম্মেলনের সভ্য হিসাবে, বাঙ্গালী হিসাবে, ভারতীয় হিসাবে, এবং সবার উপরে বিশ্বের মানব হিসাবে। আজ তাই আত্মজিজ্ঞাসা করতে হবে যে এই মহান ঐতিহ্যের উত্তরসাধক হবার যোগ্যতা আমরা অর্জন করছি কিনা।

বাহিরের হিসাবে প্রায় "সব সম্পদ খোয়ায়ে" আমরা কোন মহাসম্পদ লাভ করতে চলেছি? আমার এই সামান্য নিবেদনে তার হিসাব করবার স্থান নেই। সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতিতে বিশেষজ্ঞ সুধীগণ সে সম্বন্ধে পথনির্দেশ দিবেন। কিন্তু সম্মেলনের সভ্য হিসাবে আমাদেরও বহু চিন্তার অবকাশ আছে। নিখিল ভারতের পটভূমিকায় আমাদের কর্মক্ষেত্র বিশাল, কিন্তু ক্ষমতা সীমিত, কর্মী সংখ্যা আরো পরিমিত। তবু আমাদের আছে বুকে বল, মুখে হাসি ও মনে সাহস। আজ আমাদের প্রয়াস অগ্নিস্ফুলিঙ্গ মাত্র। তবু এই বিরাট জাতির মনে বার বার আলো জ্বালাবার চেষ্টা করব এবং হয়ত একদিন আলো জ্বলে উঠবে। সেই আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে শুধু বাংলা নয়, সারা ভারত।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে যে সব বাঙ্গালী বসবাস করছেন তারা কোনদিন নিজেদের স্থানীয় অধিবাসীদের স্বতন্ত্র করে দেখেন নি। তারা কোনদিন প্রবাসী

ছিলেন না। মনের সম্পদে তারা কোন মনোপলি বসান নি। আমি অকুণ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করতে চাই যে বাঙ্গালী যেখানে গিয়েছে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি। কাউকে বঞ্চিত করেনি, কিছু সঞ্চয় করেনি। শুধু প্রাণধারণের জন্য যা নিয়েছে সাংসারিক হিসাবে তার মূল্য তুচ্ছ। কিন্তু দিয়েছে তারও সাংসারিক মূল্যের হিসাব করা যাবে না। কারণ আমরা গড়িনি কোন বেড়াজাল নিজেদের চারপাশে, তৈরী করিনি কোন নতুন সমাজ সমস্যা, রচিনি কোন সংকীর্ণ রাজনীতি। আমরা যা দিয়েছি তা বিশ্বকবির ভাষায়

"পূর্ব বায়ে
বঙ্গের অঙ্গন হতে দিকে দিগন্তরে
সহস্র বর্ষণধারা দিয়েছে ছড়ায়ে
প্রাণের আনন্দ বেগে পশ্চিমে উত্তরে।"

এক কথায় আমাদের যে মহাসম্পদ ছিল, আমরা যে 'ধনে হইয়া ধনী মণিরে মানিনি মণি' তা হচ্ছে বাংলা হতে উৎসারিত আমাদের নিখিল ভারতীয়ত্ব।

বাংলার প্রাণবন্যার স্রোত যদি মন্থর হয়ে আসে, আমরা আবার নব ভগীরথের সাধনা করব। নতুন খনন করা নদীপথে প্রাণপ্রবাহ বহিয়ে দিতে চাইব। বাঙ্গালী জীবন মন্থন করা বিষে নীলকণ্ঠে শিবের সাধনা করেছে। আমরা আবার সেই মহান সাধনে বসব। আজকের সমস্যাসঙ্কুল দেশে অমৃত নিষেকের তপস্যা করব। এবং দধিচীর সেই সিদ্ধি শুধু বাঙ্গালী নয়, সমগ্র ভারতবাসী আগ্রহে বরণ করে নেবে। পরমত্ব যদি থাকে, আমরা কোথাও পর হব না।

সেই পরমত্বেরই পূজারী আমরা সাহিত্য সম্মেলনের সামান্য সেবক আর সভ্যরা। জানি যে জ্বালানো হয়নি এখনো অনেক দীপ, বাজানো হয়নি বহু মঙ্গলশঙ্খ। তবু জানি যে আমাদের বাহুতে নব বল সঞ্চার করবে বাংলার মাটি, শিরে আশীষ ঝরাবে তার স্নিগ্ধসমীর, দৃষ্টিতে দিব্য সংকেত দেবে তার শ্যামল সৌন্দর্য। আমরা ত একা নই।

বাংলার কবি সন্ধ্যাকর নন্দী হাজার বছরেরও আগে দেব ভাষায় দেশমাতার বন্দনা গেয়েছিলেন্:

দরদলিত-কনক কেতক কান্তিমপ্যশেষকুসুমহিতাম্
অরবিন্দেন্দীবরময়-সলিল-সুরভি-শীতল শ্বসানাম্।

সেই বাংলার বন্দনাগান আমরা এখনো করি। ধ্যানের ধন আকুল আবেগে বিশ্বময় বিশ্বময়ীতে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। কোথায় যে বাংলার শেষ আর ধরণীর সুরু তার সীমারেখা মুছে যায়। শুধু মনে থাকে বিশ্বকবির বাণী—"বাংলা দেশের চিত্ত সর্বকালে সর্বদেশে প্রচারিত হোক; বাংলার বাণী সর্বজাতি সর্ব মানবের বাণী হোক। আমাদের বন্দে মাতরম্ মন্ত্র বাংলা দেশের বন্দনা মন্ত্র নয়—এ হচ্ছে বিশ্বমাতার বন্দনা।......আমরা মানব বিধাতার রাজপথে মহা-মানবের গান গেয়ে বেড়াব।....মহাবিশ্বের পথকেই আমাদের দেশ বলে গ্রহণ করব।"

এই আমাদের সাহিত্য সম্মেলন।

কালিদাস রায়

অধিবেশনের মূল সভাপতির ভাষণ

পরিচিতি

কবিশেখর কালিদাস রায়

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার কড়ুই গ্রামে প্রখ্যাত বৈষ্ণবকবি লোচন দাস ঠাকুরের পরিবারে এঁর জন্ম। কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে বি, এ পাশ করেন। তারপরে রংপুর জেলার একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। ১৯২০ সাল পর্যন্ত উক্ত বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ছিলেন। পরবর্তীকালে কলকাতায় শিক্ষকতা করেন। ১৯৫৩ সালে শিক্ষকতা থেকে অবসর গ্রহণ করে পূর্ণোদ্যমে সাহিত্যের সেবা করছেন এবং নানাভাবে শিক্ষাবিভাগের সঙ্গে জড়িত আছেন। রংপুরে শিক্ষকতার সময় রংপুর সাহিত্য পরিষদ থেকে তিনি কবিশেখর উপাধি পান। ১৯৫৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি জগত্তারিনী পদক লাভ করেন। বল্লরী, পর্ণপুট, ব্রজবেণু, ঋতু মঙ্গল, ক্ষুদকুঁড়া, রসকদম্ব, হৈমন্তী এবং বৈকালী তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। আহরণী, আহরণ ও সন্ধ্যামণি এঁর নির্বাচিত কাব্যের সংকলন। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য, বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, সাহিত্যপ্রসঙ্গ ও শরৎসাহিত্য এঁর সমালোচনা গ্রন্থ।

কালিদাস রায়

মূল সভাপতির ভাষণ

সমবেত মহোদয় ও মহোদয়াগণ—

এই সাহিত্য-সম্মেলনে যে দায়িত্বভার আমার উপর অর্পিত হইয়াছে, তাহার মর্যাদা আমি রক্ষা করিতে পারিব কিনা এই চিন্তায় 'দ্বিধায় জড়িত পদে কম্প্রবক্ষে নম্রনেত্রপাতে' আপনাদের পুরোভাগে দাঁড়াইয়াছি। প্রাক্তন দিল্লীশ্বরদের গৌরবময় শাহী সমারোহ স্মরণ করিয়া দিল্লীর মসনদে উপবিষ্ট হতভাগ্য বাহাদুব শাহের যে মনোভাব হইত, সেই মনোভাব আমাকে আবিষ্ট করিতেছে। উচ্চৈঃশ্রবার পৃষ্ঠে ইন্দ্রকেই মানায, তাঁহার অনুজ খর্বকায় উপেন্দ্রকে মানায় না। যাহাই হউক, আজিকার অনুষ্ঠানে আমার পৌরোহিত্যের সাফল্য আপনাদেব সহৃদয় সহযোগিতাব উপরই নির্ভর করিতেছে।

কাসিমবাজারে অনুষ্ঠিত প্রথম প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনে আমি ছিলাম একজন কিশোর স্বেচ্ছাসেবক, সভাপতি রবীন্দ্রনাথের বিশ্রামকক্ষেব দ্বারে দৌবাবিক। ৭ম ও ৮ম সম্মেলনে আমাব বচিত গানে সম্মেলনের উদ্বোধন হইয়াছিল। আজ ৫৪ বৎসর পরে সেদিনেব সেই নগণ্য কিশোর-স্বেচ্ছাসেবক ভাবতীয় বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনেব মূল-সভাপতি—এ যেন From Long Cabin to White House, এ মর্যাদা আমার কল্পস্বপ্নের অতীত। এজন্য আমার আয়ুর অধিদেবতাকে প্রথমেই প্রণাম জানাই। আর এই সঙ্গে সগৌরবে স্মরণ করি এই সম্মেলনের সূতিকাগৃহে শঙ্খধ্বনি করিয়াছিলেন আমার গুরুদেব স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার উদ্দেশেও প্রণাম জানাই।

প্রাদেশিক সম্মেলন দ্বাবিংশ অধিবেশনের পর লুপ্ত হয়—দীর্ঘ ২১ বৎসব পরে তাহাকে পুনর্জীবিত করা হইয়াছে গ্রাম্য পরিবেশে।

এবার তাহার অধিবেশন হইয়া গেল সাহিত্যরথী ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়েব পল্লীভবনে। ভারতীয় সম্মেলনের সপ্তত্রিংশ অধিবেশনে আমরা এখানে মিলিত হইয়াছি। বলা বাহুল্য, সাহিত্য-সৃষ্টি বা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনের উৎকাঙ্ক্ষার দাবি করে না এই সম্মেলন। কারণ, তাহা তো যৌথ বা সমবায়-মূলক অনুষ্ঠান নয়। ইহার মুখ্য সারস্বত ব্রত সারা ভারতের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র-গুলিতে পরিক্রমা করিয়া সাহিত্যের পরিবেশে প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মৈত্রীসংযোগ স্থাপন এবং তাঁহাদের সহিত ভারতীয় অবাঙ্গালীদেরও ভাবের আদানপ্রদানে স্থবিধা-দান।

সৌভাগ্যবশতঃ এই সম্মেলন, কেবলমাত্র সাহিত্যিকদের সম্মেলন নয়। তাহা হইলে এ সম্মেলন এত দিন টিকিয়া থাকিত না। এই সাহিত্য-সম্মেলন— সাহিত্যের সঙ্গে যে-কোন ভাবে যাঁহারা সংশ্লিষ্ট তাঁহাদেরই সম্মেলন। ইহাতে সাহিত্যস্রষ্টা, সমালোচক, বার্তাজীব, ধর্মব্যাখ্যাতা, সাহিত্যপঞ্জীকার, বিবিধ জ্ঞানশাখার গবেষক ও প্রবন্ধকার, সাহিত্যশিক্ষক ইত্যাদি সকলের স্থান তো আছেই, তাহা ছাড়া, সাহিত্যের সহিত যে-সকল শিল্পকলার আত্মীয়তা আছে তাহাদের সাধকবৃন্দেরও যথা-যোগ্য স্থান আছে। যে কোন বিষয়কে সরস ভঙ্গীতে পুষ্পিত ভাষায় বিবৃত করিলেই যখন সাহিত্য হয়, তখন যে-কোন বিষয়ের লেখক মাত্রেরই এ সম্মেলনে যোগদানের অধিকার আছে।

উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত মনীষীরা সাহিত্যবিষয়ে উদাসীন হইলেও তাঁহাদের সম্মেলনে আমন্ত্রণ করিয়া আনা উচিত। তাঁহাদের মনে সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ উদ্দীপিত করিতে পারিলে সাহিত্য সমাজের যথেষ্ট ইষ্ট সাধিত হইতে পারে। সর্বোপরি চাই সাহিত্য-পাঠকদের। আমরা লিখি তাঁহাদের জন্যই। তাঁহাদের পক্ষ হইতে বর্তমান সাহিত্য সম্বন্ধে কি বক্তব্য আছে তাহা শুনিবার স্থযোগ এই সাহিত্য-সম্মেলনেই পাওয়া যাইতে পারে। বিক্রীত পুস্তকের সংখ্যার দ্বারা স্থধী রসজ্ঞ পাঠকদের মতামত বুঝা যায় না। লম্বশাটিপটাবৃত অপকৃষ্ট গ্রন্থও চানাচুরভাজার মতো বহুল পরিমাণে বিক্রীত হইতে পারে। আমি তো মনে করি—লেখকদের সঙ্গে আদর্শ পাঠকদের সম্মেলনই আদর্শ সাহিত্য-সম্মেলন।

সম্মেলনের শাখা ক্রমে বাড়িতেছে—তরুর বয়স বাড়িলেই শাখা বাড়ে। শাখাবৃদ্ধির ফলে সাহিত্যস্রষ্টাদের এই সম্মেলনে আকর্ষণ করিয়া আনার স্থবিধা হইয়াছে। প্রতিবৎসর কয়েক জন সাহিত্যিককে অনাড়ম্বর সংবর্ধনা দানের ব্যবস্থা করিলে সম্মেলনে সাহিত্যিক সংখ্যা বাড়ানো যাইতে পারে।

বঙ্গদেশের রাজধানীতে এবার যখন অধিবেশন হইতেছে তখন বাংলার বিবিধ প্রতিষ্ঠানের কাছে আমরা কি প্রত্যাশা করি তাহার উল্লেখ করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

বাংলা সাহিত্যের দিকে বাংলার রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কৃপাদৃষ্টি পতিত হইয়াছে স্বীকার করি,—কিন্তু সাহিত্যের ফলন বাড়াইতে হইলে—চাই কৃপাবৃষ্টি। দেশের মুক্তিসংগ্রামে ও জাতীয়তার উদ্বোধনে বাংলা সাহিত্যের দান অমূল্য ও অতুল্য। এই বাংলা সাহিত্যকেই জাতীয় সংহতি সাধনের, জাতীয় চরিত্রের

উৎকর্ষবিধানের ও আদর্শ নাগরিক গঠনের ভারও লইতে হইবে। অতএব সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে, সাহিত্য প্রচারে ও সাহিত্যিকদের সংসারভার লঘুকরণে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের অধিকতর সাগ্রহ অবধান আমরা প্রত্যাশা করি।

দেশের ভূস্বামীরা ছিলেন সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষক—এমনকি অনেকের প্রতিপালক। প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মেলন তাঁহাদের প্রভূত অকুণ্ঠিত আনুকূল্যেই পরিপুষ্ট হইয়াছিল। নানাভাবে তাঁহারাও সাহিত্যের সেবাই করিতেন। জমিদারি প্রথা বহিত হইয়াছে। আমরা প্রত্যাশা কবি, সরকার তাঁহাদের সেই সেবা-ভার গ্রহণ করিবেন।

রবীন্দ্রনাথের 'পুরস্কার' কবিতায় দুঃস্থদুর্গত কবি, রাজা মহেন্দ্র রায়ের শ্রীহস্ত হইতে—বৃত্তি নয়, ব্রহ্মোত্তর নয়, পুরস্কার নয় একটি ফুলের মালা মাত্র পাইলেন—সেই মালাতেই 'সরস্বতীর সঙ্গে লক্ষ্মী বাঁধা' পড়িলেন। কি করিয়া? জনগণই রাজসম্মানপ্রাপ্ত কবির প্রতিপালক হইয়া উঠিল। বৃত্তি নয়, পুরস্কার নয়, মহেন্দ্র রায়েরা যদি একটা ফুলের মালা দিয়াও সাহিত্যিকদের সম্মানিত করেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের সামাজিক প্রতিপত্তি ঢের বাড়িয়া যায়—তাহাতে অর্থনীতিক সুবিধাও হইতে পারে। রাজা মর্যাদা না দিলে এদেশে প্রজা মর্যাদা দেয় না। রাজা নাই, রাজার অনুকল্প তো আছে। কথা-সাহিত্যের শাখা অনেকটা আত্মনির্ভর হইয়াছে—কথা সাহিত্যিকরাই আসল গণতন্ত্রের সাহিত্যিক। কারণ, জনগণই তাঁহাদের প্রতিপালক। অন্যান্য শাখার সাহিত্যিকদের এখনো মহেন্দ্র রায় চাই।

যে-কোন দান স্বতঃপ্রণোদিত হইলে গ্রহীতার মর্যাদাহানি হয় না—দাতারও মহিমা বাড়ে। সাহিত্যিকরা তো পূজারী, তাঁহাদের প্রাপ্যের নাম দক্ষিণা। দক্ষিণা কি চাহিতে হয়? মা-সরস্বতীকেও মা-মনসার মতো চাঁদ সদাগরের বামহস্তের একটা ফুলের জন্য ভিখারিনী হইতে হইলে সমগ্র সারস্বত সমাজেরই মর্যাদাহানি হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের পঠনপাঠনের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্যানুরাগী সজ্জনগণের প্রদত্ত পদক পুরস্কার সাহিত্যিকদের বিতরণ করেন। কিন্তু রাজসূয় যজ্ঞের ভাণ্ডারী হইয়াই তো কর্ণ দাতাকর্ণ নামে ভুবনবিখ্যাত হ'ন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজ ভাণ্ডার হইতেও কিছু প্রদেয় কি নাই? বিশ্ববিদ্যালয় বিনা অর্থব্যয়েই ডি, লিট ডিগ্রী দিয়া কি দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের সম্মানিত করিতে পারেন না? একটা থিসিসের চেয়ে একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিকের সারা জীবনের মৌলিক অবদানের মূল্য কি কম?

সাহিত্য পরিষদ যথেষ্টরূপ আর্থিক আনুকূল্য পাইলে প্রাচীন সাহিত্যের

উদ্ধার, প্রকাশ ও প্রচারে অধিকতর সক্রিয় হইতে পারিয়া বর্তমান সাহিত্যের দিকেও অবহিত হইতে পারে।

প্রত্যেক স্কুল-কলেজে সাহিত্যিক আবেষ্টনীর সৃষ্টি করা উচিত এবং শিক্ষকদের সাহিত্য-পাঠনা যাহাতে কেবল পরীক্ষাভিমুখিনী না হইয়া হৃদয়াভি-মুখিনী হয় সে দিকে অবহিত হওয়া উচিত। Higher Secondary পরীক্ষার প্রবর্তনের পর কিশোর বয়সেই অধিকাংশ ধীমান জ্ঞানানুরাগী ছাত্রগণের বিচ্ছেদ ঘটিতেছে সাহিত্য হইতে। ইহাদেরই অনেকের মধ্যে সাহিত্যিক প্রতিভা অঙ্কুরিত অবস্থায় বিদ্যমান। যাহাতে ইঁহাদের অঙ্কুরিত শক্তি উন্মেষ লাভের সহায়তা পায়—সেজন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে এবং কলেজের বিজ্ঞানবিভাগেও সাহিত্যিক আবেষ্টনীর সৃষ্টি করা উচিত। সকল সাহিত্যিকেরই সাহিত্যে দীক্ষা লাভ ঘটে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে। যে শক্তি স্ফুলিঙ্গাবস্থায় আছে—তাহা এধাপেক্ষ, তাহাকে এধ অর্থাৎ ইন্ধন দিতে হইবে প্রত্যেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে।

পাঠাগারগুলি সাহিত্য প্রচারে ও সাহিত্যিক মানস গঠনে সর্বাপেক্ষা অধিক সহায়তা করিতে পারে। কেবল প্রমোদ-পিপাসা নিবৃত্তি নয়, সাহিত্যানুরাগ উদ্দীপন, জ্ঞানবর্ধন, বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিপূরকতা সাধন ও তদ্দ্বারা চিত্তোৎ-কর্ষ বিধান, যদি পাঠাগারগুলির লক্ষ্য হয়, তাহা হইলেই পাঠাগারগুলি এক একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতে পারে। তাহা ছাড়া, পাঠাগারগুলিকে উদীয়মান সাহিত্যিকদের অনুশীলনক্ষেত্ররূপে পরিণত করিতে পারিলে সেগুলির মূল্যমর্যাদা ঢের বাড়িয়া যাইতে পারে।

সাময়িক পত্রগুলি নিরপেক্ষ সমালোচনার দ্বারা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে সাহায্য করিতে পারে। আবর্জনা বর্জনের সম্মার্জনী তো তাহাদেরই অধিকারে। প্রকাশকরা পাণ্ডুলিপি নির্বাচনে সতর্ক ও সুবিচারক হইলেও সৎসাহিত্য সৃষ্টির সহায়তা করা হয়।

এ সব হইল বহিরঙ্গীয় কথা—'এহো বাহ্য' 'আগে' কিছু কহিতে হয় অর্থাৎ—বর্তমান সাহিত্যের গতিবিধি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে হয়। কাঁসর বাজাইবার বা চন্দন বাটিবার জন্য কেহ পুরোহিত ডাকে না।

বর্তমান সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কতটা সক্রিয়—তাহার আলোচনা বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের শততম বর্ষে অসমীচীন হইবে না।

ভারতীয় রস-সাধক ও জ্ঞান-গুরুগণের বহুযুগের তপস্যা পুঞ্জীভূত হইয়া ত্র্যম্বকের রাশীভূত অট্টহাস্যের কিরীট শিরে যে নব হিমাচল দুর্নিরীক্ষ্য ভাস্বরতায় বিরাজ করিতেছে—তাহাই তো রবীন্দ্রনাথের মহাসারস্বত জীবন। তাহা হইতে

বহু রসধারা বিগলিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যভূমিকে উর্বরা, সুফলা, শস্য শ্যামলা করিয়াছে। 'সেই ধারাগুলির কোনটি শ্রাবণের গঙ্গার মতো কূলপ্লাবিনী ও ফেনিলোচ্ছলা। কোনটি নিদাঘের ময়ূরাক্ষীর মতো শীর্ণ দেহে বহমান। কোনটি নিরঞ্জনার মতো অন্তঃসলিলা, আবার কোনটি সরস্বতীর মত বিলুপ্ত।

প্রথমে কথা-সাহিত্যের ধারার কথা বলি—কারণ, এই ধারা সর্বাপেক্ষা খরস্রোতা ও উদ্‌বেলিতা। রবীন্দ্রপ্রতিভার উত্তুঙ্গ ভৃগুভূমিতে এই ধারার জন্ম। ইহারই একটি উপধারা কবিগুরুর নষ্টনীড়, নৌকাডুবি, ও চোখের বালির কন্দর হইতে বিগলিত হইয়া শরৎচন্দ্রের সাধনার সানুভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বাস্তবতার সমতলে অবতবণ করিয়াছে। ইহাই বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া বঙ্গসাহিত্য ভূমিকে পরিবেষ্টন কবিযাছে।

বর্তমান যুগের কথা-সাহিত্যে যে বাস্তবনিষ্ঠতা, দৃষ্টির অন্তর্মুখিতা, জীবন ও ভুবন সম্বন্ধে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী, মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ, মিথ্যাচারে অসহিষ্ণুতা, সামাজিক অবিচার অনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহভাব, যথাযথ পরিবেশসৃষ্টি, নির্যাতিত পতিত দুর্গতদের প্রতি সমবেদনা, সংস্কারগত দ্বন্দ্ব, অন্তর্দ্বন্দ্ব, চরিত্রচিত্রণে জীবনীসঞ্চার ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়—সে সমস্তের সূত্রপাত হইয়াছে তরুণ কথা-সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের গল্প ও উপন্যাসে। এ যুগের কথাসাহিত্যে অবশ্য ইউরোপীয় কথাসাহিত্যের প্রভাবও বর্তমান। তাহা আমার আলোচ্য নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবর্তিত যে ধারা ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত বৌঠাকুরাণীর হাট ও রাজর্ষির মধ্য ধিয়া প্রবাহিত হইয়া এত দিন সৈকতসুপ্ত হইয়াছিল, সে ধারা বাস্তব জীবনরসে পুষ্ট হইয়া ইদানীং উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছে।

রাজনীতিক পটভূমিকায় উত্তমপুরুষীয় জবানীতে স্বগতোক্তিমূলক ও বাদানুবাদে উন্মেষিত 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের ধারা প্রবাহিত হয় নাই। বর্তমান যুগের মুক্তিসংগ্রামের পটভূমিকায় রচিত উপন্যাসগুলি স্বতন্ত্র প্রকৃতির। এইগুলিতে রাজনীতিকতার চেয়ে সামাজিকতাই প্রবল। সমাজের উপর রাজনীতির প্রভাবসঞ্চার এগুলির মূল উপজীব্য। শ্রেয়োবোধের দ্বারা অনু-প্রাণিত ভারতীয় সংস্কৃতির পটভূমিকায় রচিত নানা সমস্যাকীর্ণ এপিক্ উপন্যাস 'গোরা' নিঃসঙ্গ সন্ধ্যাতারার ন্যায় আজিও একক। বর্তমান যুগের কথা-সাহিত্য উর্দ্ধে চাহিয়া ইহাকে ভক্তিভরে প্রণাম জানাইয়া স্বকীয় পথে আগাইয়া চলিয়াছে।

'শেষের কবিতায়' রহস্যঘন প্রেমের কুহেলিময় আকাশে বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের আতশবাজি বর্তমান যুগের কথাসাহিত্যিকদের স্তম্ভিত করিয়াছে। তাঁহারা ঐ সৃষ্টিকে অস্থিমজ্জারক্তে কায়মনোবাক্যে কবিপুরুষ যিনি তাঁহার পক্ষেই সম্ভব এই বিবেচনা করিয়া অনুকরণের চেষ্টাও করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের

দেশকালের উত্তরাধিকারই বর্তমান কথা সাহিত্যের একমাত্র সম্বল নয়। রবীন্দ্রনাথের পরে দেশের রাষ্ট্রীয় জীবনে, সমাজে, সংস্কৃতিতে, পারিবারিক জীবনে যুগান্তর ঘনিয়া গিয়াছে। বর্তমান যুগসমস্যা বহু উপাদান, উপকরণ ও প্রেরণা যোগাইয়াছে। যুগচক্রের আবর্তন এত দ্রুত যে অনেক লেখক প্রকৃতিস্থ চিত্তে ভাবিবার অবসর পান নাই-- Recollection in Tranquillity ও সম্ভব হয় নাই। যাহা যাহা ঘটিতেছে তাহাব আলোক চিত্র তুলিয়া তাহাতে বর্ণসংযোগ মাত্র করিয়াছেন। যুগধর্মের আনুগত্য, জাতীয় জীবনের বৈচিত্র্য, এবং ক্রমবর্ধমান পাঠক সংখ্যার চাহিদা কথাসাহিত্যের দ্রুত প্রসারের জন্য প্রধানতঃ দায়ী। ফলে, রবীন্দ্রনাথের প্রভাব হইতে বর্তমান কথাসাহিত্য বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে।

ঐকতান কবিতায় কবি বলিয়াছেন--যাহাদেব উপর ভর দিয়া সমাজ সংসার চলিতেছে সেই সকল শ্রমশিল্পী, কৃষিজীবী ও ঘর্মাক্ত কর্মীদের জীবনে তিনি নিজের জীবন যোগ করিতে পাবেন নাই। কারণ, ঐ সমাজ সংসারের অতি ক্ষুদ্র অংশে সম্মানের চির নির্বাসনে সমাজের উচ্চ মঞ্চে সংকীর্ণ বাতায়নে তিনি বসিয়া আছেন। তাহাদের কথা লিখিতে গেলে কৃত্রিম পণ্যে পশরা ভরাইতে হইত। তিনি কবিতা সম্বন্ধে এ কথা বলিলেও কথা-সাহিত্য সম্বন্ধে তাহা অধিকতর সত্য। কবিতায় অভিজ্ঞতা ব্যাপক না হইলেও চলে। বর্তমান যুগের কথাসাহিত্যিকরা যাহাদের কথা লইয়া রসসৃষ্টি করিয়াছেন--তাহাদের জীবনে জীবন যোগ করিবার অনেক সুযোগ পাইয়াছেন। কারণ, ইহাদের অনেকেই পল্লীভূমির অল্পবিত্ত কিংবা মধ্যবিত্তঘরের সন্তান। বাংলার পল্লীভূমিকে বলয়িত করিয়া আছে পুষ্পফলাঢ্য বল্লী-পিহিত তরুগুল্ম, কমল-কুমুদে অলংকৃত জলাশয় এবং কেদারবাহিনী জলধারা। প্রকৃতির ভক্ত পূজারী কবি এই পরিবেষ্টনীর শোভায় মুগ্ধ হইয়াই যেন ফিরিয়াছেন কিংবা দূর হইতে দিগন্তের পটে অঙ্কিত পল্লীশ্রীর চিত্র সৌন্দর্য উপভোগ করিয়াছেন—পল্লীজীবনের মর্মস্থলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার সুযোগ হয় নাই। বাংলা সাহিত্যের তাহাতে হয়তো ক্ষতি হয় নাই। কারণ, পল্লীবাসীদের মর্মন্তুদ দুঃখ দৈন্য তাঁহার চিত্তে হয়ত রসোদ্বোধন করিত না—পল্লীজীবনের কদর্যতা ও অশুচিতা হয়তো তাঁহার চিত্তকে বিষাইত, রসাইত না। Yarrow unvisited থাকাই বোধ হয় ভালোই হইয়াছে।

বর্তমান যুগের অধিকাংশ কথাসাহিত্যিক আবাল্য পল্লীজীবনের সঙ্গে পরিচিত—তাহার পাপ, তাপ, দুঃখ, দৈন্য কোনটাই তাঁহাদের কাছে অপ্রত্যাশিত নয়—তাই তাঁহারা শোচনীয়কেও সাহিত্যে রোচনীয় করিতে পারিয়াছেন

কতকটা ভুক্তভোগীব সহানুভূতি দিয়া। ইঁহাবা সমাজেব সোপান বাহিয়া নামিতে নামিতে নিম্নতম স্তব পর্যন্ত পৌছিয়াছেন। ফলে, সর্ববিধ দুর্গতি, দুর্দশা, দুর্মতি, ঘৃণ্যতা, অশুচিতা, কুশ্রীতাব সম্মুখীন হইতে হইযাছে ইঁহাদেব। সেজন্য যথেষ্ট সহনশীলতা ক্ষমা, ধৈর্য, উদাবতা, সহৃদযতা ও দবদেব প্রযোজন হইযাছে। শুধু তাহাই নয, নির্যাতিত, লাঞ্ছিত দুর্গতেব মূক মুখে ভাষা দিতে ও শুষ্ক বুকে আশাব সঞ্চাব কবিতে হইযাছে। ইঁহাদেব কেহ কেহ বীভৎসতাকেও বসে পবিণত কবিবাব চেষ্টা কবিযাছেন। ইঁহাবা শুধু সৃষ্টিমূলক কল্পনাব (Constructive Imaginatoin) উপব নির্ভব না কবিযা প্রত্যক্ষলব্ধ অভিজ্ঞতাব উপব নির্ভব কবিযাছেন। ফলে ইঁহাদেব সৃষ্ট চবিত্র-গুলি ভাব বিগ্রহ (Personified Ideas) নয, বক্ত মাংসে জীবন্ত মানুষ।

ইঁহাদেব সৃষ্টিব স্থানকালপাত্রগত পবিধিও ঢেব বাড়িযা গিযাছে। ভৌগোলিক পবিধি বাংলাব সীমা ছাড়াইযা গিযাছে। কালগত সীমা অতীতেব নানা যুগ চলিযা গিযাছে—আব পাত্রগত পবিধি সর্বশ্রেণীব মানুষকে বলযতি কবিযাছে।

পল্লীজীবনেব ন্যায বিবর্তিত পৌবজীবনও ইঁহাদেব বচনাব উপজীব্য হইযাছে। যে শান্ত নিরুপদ্রব স্বচ্ছন্দ বৈচিত্র্যহীন, অক্ষুব্ধ পৌব পবিবেশে পূর্বসূবিবা সাহিত্য সাধনা কবিযাছেন—সে পৌবজীবন আব নাই—এখন চাবিদিকে অসন্তোষ, অসহিষ্ণুতা, বিক্ষোভ, দৈন্য, দুঃখ, নিবাশ্রযতা, কর্মক্ষেত্রে, সংসাবে, অর্থনীতিক ক্ষেত্রে পাবিবাবিক জীবনে সর্বত্র বিপর্যয। বৈজ্ঞানিক সভ্যতাব অভিযানে সর্বত্র ভাঙন গড়ন, কলকাবখানাব বিস্তাব, শ্রমিক সমস্যা সামাজিক ক্ষেত্রে স্ত্রী-শিক্ষাব প্রসাব, স্ত্রী-স্বাধীনতা, সহশিক্ষা, আপিসে আপিসে সহকর্মিতা, বিবাহবিচ্ছেদ আইন, জাতিভেদ প্রথাব শিথিলতা, নবনাবীব বিলম্বিত বিবাহ,—সর্বোপবি সাম্প্রদাযিক দ্বন্দ্ব, প্রাদেশিকতাব অসূয়া, বিঘ্ন বিপত্তিব মধ্যে স্বাধীনতা লাভ, দেশবিভাগ, জমিদাবি উচ্ছেদ, উদ্বাস্তু সমস্যা—পৌব-জীবনে এই সমস্ত সমস্যা জটিলতা ও গ্রন্থিলতাব সৃষ্টি কবিযাছে। সমস্তই বর্তমান কথা সাহিত্যেব উপজীব্য হইযাছে। এই সমস্ত শুধু উপাদান ও প্রেবণা যোগায নাই, ভাবাদর্শ, চিন্তাধাবা ও দৃষ্টিভঙ্গীবও পবিবর্তন ঘটাইযাছে। বহু প্রতিষ্ঠান, অনুষ্ঠান, সংস্কাব, ঐতিহ্য ও ধাবণাব মূল্যেবও আমূল পবিবর্তন হইয়াছে। ফলে, আদর্শবাদী ববীন্দ্রনাথেব বসভূযিষ্ঠ ভাবাদর্শ ও ইহাদের রূপভূয়িষ্ঠ ভাবাদর্শ—এই দুয়েব মধ্যে অনেকটা ব্যবধান ঘটিযা গিয়াছে।

ইঁহাদেব তথ্য-প্রধান বচনাব বাস্তব-জীবন-সত্য কবিগুরুব আদর্শবাদের

ভাবপ্রধান সাহিত্যিক সত্যের মঠের গোপুরমে প্রণাম নিবেদন করিয়া মাঠ, ঘাট, হাটের পানে চলিয়া গিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ছিল organic whole. ইঁহাদের অনেক উপন্যাস Mechanical structure—সেজন্য তাহা ইচ্ছামত বাড়াইতে কমাইতে পারা যায়। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি ভাস্কর্যের, বর্তমান যুগের কথা সাহিত্যিকদের অনেক সৃষ্টি স্থাপত্যের সগোত্র।

ইঁহাদের কেহ কেহ অক্ষুণ্ণ বাস্তবনিষ্ঠার দোহাই দিয়া নরনারীর যৌন-জীবনের গুহ্য তথ্যগুলিকেও রচনার উপজীব্য করিয়া তুলিতে ইতস্তত: করেন না। রবীন্দ্রনাথ সকল প্রাকৃত সত্যকে সাহিত্যের সত্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই—তাঁহার মতে—

"ঘটে যা, তা সব সত্য নহে।" (ভাষা ও ছন্দ)

বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিকের যে অবল্‌গিত স্বাধীনতা আছে—সাহিত্যিকের তাহা নাই।

পরবর্তী ব্রাহ্মণ লেখকদের পক্ষে যেরূপ নিরঙ্কুশ নির্ভীকতার সহিত আপন সমাজের সর্ববিধ গ্লানিগলদের কথা লইয়া কথাসাহিত্য রচনা সম্ভব হইয়াছে, ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সেভাবে পর সমাজের ঐ সব কথা লইয়া সাহিত্য রচনা করা সম্ভব হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কোন জীবনচিত্রকে গাঢ়বর্ণাঢ্য করিয়া অঙ্কন বা কোন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বা মনোবৃত্তিতে অতিরিক্ত Emphasis আরোপের পক্ষপাতী ছিলেন না। সেজন্য বহুদিন পর্যন্ত তাঁহার পাঠক সংখ্যা ছিল অল্প। উদাসীন, তন্দ্রালু জড়ভাবাপন্ন পাঠকের চোখে আঙুল দিয়া চেতাইবার জন্য এই Emphasis. শরৎচন্দ্রকে চোখে আঙুল দিয়া অনেক কিছু দেখাইতে হইয়াছে। তদদ্বারা তিনি দেশে পাঠক-জনতার সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন। পরবর্তী লেখকরা উদগ্রীব পাঠক-জনতাকে সহজে পাইয়া গেলেন। তবু তাঁহাদেরও পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য মাঝে মাঝে চোখে আঙুল দেওয়ার প্রয়োজন হয়। কল্পনাতীত বৈচিত্র্য সৃষ্টি বা অপ্রত্যাশিতের আবির্ভাবের চমক দেওয়াও চোখে আঙুল দেওয়া।

রবীন্দ্রনাথ এদেশে ছোট গল্প রচনার প্রবর্তক। তিনি নানাশ্রেণীর গল্পই লিখিয়া গিয়াছেন। প্রায় সব শ্রেণীর ধারাই প্রবাহিত আছে। তবে অতিপ্রাকৃতের রহস্যময়তায় আবিষ্ট গল্প ক্বচিৎ কখনও দুই একটা চোখে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের অনেক গল্প গীতিকবিতার রসে পরিষিক্ত। এই ধারার গল্প এই বাস্তব-সর্বস্বতার যুগে দুর্লভ। ক্রমবিবর্তমান প্রগতিতৎপর পৌর জীবন এযুগে ছোট গল্পের

রচনার নানা ভাবে প্রেরণা ও বহু উপজীব্য যোগাইয়াছে এবং নরনারীর জীবনের নানা রহস্যময় গূঢ় তথ্য বহু ছোট গল্পে প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে। বর্তমান সাহিত্যে ছোট গল্পই সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। উপন্যাস রচনায় সকলে তেমন সাফল্য লাভ করেন নাই—কিন্তু উৎকৃষ্ট ছোট গল্প অনেকেই লিখিতে পারিয়াছেন। অনেক গল্প পাশ্চাত্য জগতের শ্রেষ্ঠ গল্পের সহিত পাংক্তেয় হওয়ার যোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্য ও বর্তমান কথাসাহিত্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবধান ঘটাইয়াছে ভাষা। কি উপন্যাসে কি ছোট গল্পে রবীন্দ্রনাথের মতো চন্দন কঙ্কুমাক্ত পুষ্পিত ভাষা, ব্যঞ্জনাগর্ভ, বক্রোক্তিঘন পরিহাস বিজল্পিত বাচনভঙ্গী আর তাহাতে কৌতুকোজ্জলা বুদ্ধির চাতুর্যকলার শ্রীসঞ্চার বর্তমান কথাসাহিত্যে লক্ষিত হয় না। তবে পাত্রপাত্রীর মুখের সংলাপের বর্ণে বর্ণে যথাযথতা তাহাদের চরিত্রে জীবনীশক্তির সঞ্চার করে। যাহার মুখে যে জবান শোভা পায় তাহারই যথাযোগ্য প্রয়োগ করার চেষ্টা দেখা যায়।

কেহ কেহ বলিবেন—ইক্ষুক্ষেত্র যে আগাছার জঙ্গলে ভরিয়া উঠিতেছে তাহার কথা তো—আমি কিছুই বলিলাম না। উত্তরে বলি—আগাছা রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত ধারার ফসল নয়—ইক্ষুই সে ধারার রসে পুষ্ট। কালের কৃষাণ অবিলম্বে সব আগাছা নিড়াইয়া ফেলিবে। ইক্ষুই শর্করায় পরিণত হইয়া টিকিয়া থাকিবে দীর্ঘকাল, আগাছা, গবাদি পশুর দু-দিনের খাদ্য হইবে। ইহা ছাড়া আর কী বলিবার আছে?

এইবার কবিতার কথা বলি। 'সৎকবিতার ধারা' বসন্তকালের নদীধারার মত শীর্ণ দেহে প্রবাহিত।

কবিগুরুর 'প্রসাদ' কবিতার "তপন তোমার স্বপন দেখি যে করিতে পারি না সেবা"—শিশিরকণার এই আক্ষেপোক্তির উত্তরে গগনের রবি বলিয়াছেন—

"ছোট হয়ে আমি রহিব তোমারে ভরি
তোমার ক্ষুদ্র জীবন গড়িব হাসির মতন করি।"

আমার ব্যাখ্যা,—কবিতার রবি কবিগুরু নিজে, আর শিশির-কণা তাঁহার অনুবর্তিগণ। তাহাদেরই কাছে গুরু লঘু হইয়া, ছোট হইয়া ধরা দিয়াছেন বলিয়া তিনি তাহাদের অধিগম্য হইয়াছেন। তাঁহার এইরূপ যেন বিশ্বকর্মার শাণযন্ত্রে আরূঢ় অনলোজ্জ্বল দুনিরীক্ষ্য তপনদেবের 'হৃতখরকরজালে ধৃত-চূড়াবনমাল' নয়নাভিরাম মূর্তি। কবির এই শান্তিততেজা বরাভয়পাণি সহনীয়াদ্যুতি প্রসন্ন মূর্তিরই অনুবর্তন সম্ভব হইয়াছে। তাঁহার অনুবর্তীরা

তাঁহার যৌবনের কবিতার ধারা যথাসাধ্য রক্ষা করিয়াছেন কালীঘাটের নালীগঙ্গা যেমন কাশীতল-বাহিনী গঙ্গার ধারা রক্ষা করিতেছে তেমনি।

ইঁহারা কবিগুরুর রোমাণ্টিক দিকটারই অনুসরণ করেন। ইঁহারা কবিগুরুর রচনার পারিপাট্য, পরিচ্ছন্নতা, ছন্দোবৈচিত্র্য, অনেকটা অধিগত করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু কবিগুরুর মৌলিক অলংকার-প্রয়োগের শক্তি ইঁহারা পান নাই। তাঁহার যুক্তিমূলক, আবেগাত্মক, স্মৃতিচিত্রমূলক, স্বপ্ন-চিত্রমূলক ও সঙ্গীতাত্মক অনুক্রমগুলিও সাধ্যমতো অধিগত করিয়াছেন।

এই সমস্ত হইল বহিরঙ্গের কথা, ইঁহারা গুরুর সৃষ্টির ঐশ্বর্য ও চাতুর্যের চেয়ে মাধুর্যেরই অধিকতর অনুরাগী ও অনুবর্তী। সীমা অসীমার মিলনরহস্য তাঁহার রসাত্মক দার্শনিকতা, বিশ্বজনীনতা, অবাস্তবিকার উদ্দেশে প্রেম, ভগবৎ প্রেম, ঔপনিষদী ভাবধারা, আধ্যাত্মিকতা, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি গভীর অবিচল শ্রদ্ধা, অকপট দেশপ্রেম, ভাবগদগদ প্রকৃতি প্রেম, আর Symbolism, Mysticism ইত্যাদির—নানা প্রকার Ism এর প্রভাব ইঁহাদের রচনায় দেখা যায় না। গুরুর শিক্ষায় প্রকৃতির সৌন্দর্য ইঁহাদের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে—কিন্তু প্রকৃতিপ্রেমে তন্ময়তা ইঁহাদের রচনায় নাই। হৃদয়াবেগ ইঁহাদের রচনার প্রধান প্রেরণা, হৃদয়াবেগে সর্বত্র সংযম নাই। বাণীচিত্র-অঙ্কনে ইঁহাদের দক্ষতা দেখা গেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিত্রে প্রাণ সঞ্চার হয় না। ভাস্কর্য অপেক্ষা মণ্ডনকলার (Decorative art) সঙ্গে ইঁহাদের রচনার সগোত্রতা নিকটতর। ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃতির কথা ইঁহারাও লেখেন—কিন্তু তাহাতে গভীর শ্রদ্ধা বিম্বিত হয় না। রবীন্দ্রনাথের কবিতার রহস্যময়তার অধিকারী হ'ন নাই বলিয়াই হয়ত ইঁহাদের রচনা স্বচ্ছ, প্রাঞ্জল ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট।

যাহাই হউক, ইঁহাদের রচনা রবীন্দ্রসাহিত্য-মন্দিরের সোপানের কাজ করিতেছে এবং করিবে। ইঁহাদের অনেক কবিতা গুরুর কবিতার ভাষ্য বা ব্যাখ্যান। রবীন্দ্রসাহিত্যের গাঢ় রসকে ইঁহারা তরলায়িত করিয়া পরিবেশণ করিয়াছেন। ইঁহাদের রচনাকে রবীন্দ্র-কাব্যসম্ভারের পরিশিষ্টও বলা যাইতে পারে। কবি যে-যে চিত্রের আদ্‌রা রাখিয়া গিয়াছেন ইঁহারা সেগুলিকে রঙ দিয়া ভরাইয়াছেন। বৃত্তাংশকে বৃত্তে পরিণত করা সহজ—রবীন্দ্রনাথের হাতের আঁকা দ্বিতীয়ার চন্দ্রের মতো কোন কোন বৃত্তাংশকে ইঁহারা পূর্ণাঙ্গ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের অপরিচিত দরিদ্র সমাজসংসারের বিশেষতঃ পল্লীজীবনের সুখ-দুঃখ, আশা আকাঙ্খা গতিবিধি, রীতিনীতি, ও গূঢ়তম মর্মবাণী ইঁহাদের অনেকের রচনাউপজীব্য হইয়াছে।

কবিগুরুর 'জীবন যাত্রার বেড়াগুলি' যাহাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের বাধা হইয়াছে—'সেইসব অখ্যাত জনের নির্বাক মনের' বার্তাকে যাঁহারা 'মাটির কাছাকাছি থাকিয়া' সাধ্যমত বাণীরূপ দিতেছেন—তাঁহারা কবিগুরুর কাব্য-সম্ভারের পরিশিষ্ট রচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন—একথা বলিতে কি পারা যায় না ? বর্ণে বর্ণে কবিগুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে পারেন নাই বলিয়া হয়ত ইঁহারা একেবারে স্বাতন্ত্র্য হারান নাই—'একতারাতে একটি যে তার আপন মনে সেইটি বাজাইতেন বা বাজাইতেছেন।' সপ্তস্বরায় তান তুলিবার দাবি বা স্পর্ধা ইঁহাদের ছিল না বা নাই।

ইঁহাদের দাবি মৃৎপ্রদীপের দাবি। রবি অস্তমিত হইলে মৃৎপ্রদীপ অন্ততঃ মৃৎকুটিরের অন্ধকার দূর করে, রাজ-পথ বা সৌধাবলী আলোকিত করিতে পারে না। ঘটের সঙ্গেও ইঁহারা উপনিত হইতে পারেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যরসের ইন্দ্রাগারে ইঁহারা ঘটের মতোই মগ্ন হইয়া যতটুকু পাইয়াছেন ততটুকু দিয়াই তৃষিত কণ্ঠের তৃষ্ণা দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কবিতা লিখিয়াছেন যেমন—গীতিকাব্য, নীতিকাব্য, স্মৃতিচিত্র, নাট্যকাব্য, গাথা কবিতা, গদ্য কবিতা, নাটিকা কাব্য, দেশপ্রেমমূলক কবিতা, আখ্যানমূলক কবিতা, ছড়া, শিশুরঞ্জন কবিতা, তত্ত্বঘন কবিতা, রঙ্গকবিতা, ব্যঙ্গকবিতা, শ্লোকসংহত কবিতা, রূপক কবিতা ইত্যাদি। এই বিবিধ প্রকরণের কতকগুলির উপধারা, রসবত্তায় যাহাই হউক, আজিও বিলুপ্ত হয় নাই। কবিতাবিমুখ উৎকৃষ্ট কবিতা বেশি জন্মে না। তৃষ্ণার আকৃষ্টি ছাড়া কি বৃষ্টি নামে ?

কবিগুরুর জীবদ্দশাতেই কয়েকজন শক্তিশালী কবি রবীন্দ্রজালের কুহক এড়াইয়া নবেন্দ্রজালের বিস্তার করিয়াছেন। এই নূতন ধারাকে আমি অভিনন্দিত করিতেছি। শতাধিক কবি এই নূতন ধারায় কবিতা লিখিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের পর এত অল্প দিনের মধ্যে কবিতায় অভিনব ধারার প্রবর্তন ও প্রতিপত্তি হইবে ইহা আমরা কল্পনা করি নাই। এই নবতর ধারা প্রাক্তন-ধারার পাশাপাশি বেশ খরস্রোতা হইয়াই চলিতেছে। হয়ত অপ্রত্যাশিতের চমক কাটিয়া গেলে দূর ভবিষ্যতে দুই ধারার একটা সংশ্লেষণ (Synthesis) ঘটিবে। অনেকে যে মনে করেন, রবীন্দ্র-প্রবর্তিত ধারার বিলুপ্তি ঘটিল, তাহা অমূলক আশঙ্কা। কারণ, এই ধারা অতীত ঐতিহ্যের গৈরিক উৎস ও ভারতীয় সংস্কৃতির অববাহিকা ইহাতে জীবন রসের এবং সামসময়িক জনসাধারণের জীবনের সমতলভূমি হইতে হৃদয় দ্রবের যোগান পাইতেছে এবং পাইতে থাকিবে। আমার বক্তব্য রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ও তাঁহার প্রবর্তিত

ধারাগুলির সম্বন্ধে। অতএব তাঁহার প্রভাব হইতে মুক্ত কোন ধারার কথা আমার আলোচ্য নয়।

রাবীন্দ্রিক ধারাতেও অজস্র কবিতা রচিত হইতেছে—বলা বাহুল্য, সেগুলির অধিকাংশই কবিতা-পদবাচ্য নয়—কাজেই আমার আলোচ্য নয়। শুধু কবি গুরুর কথায় বলিতে পারি—

বসন্ত কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের খেলা রে।
দেখিস্ নাকি শুকনো পাতা ঝরা ফুলের মেলা রে।

রবীন্দ্রনাথ গানের গন্ধর্বপুরী রচনা করিয়া গিয়াছেন। গানের ধারা কাজী নজরুল ও দিলীপকুমার পর্যন্ত বহমান। রবীন্দ্রানুবর্তী কবিদের মধ্যে আর কোন সুরকারের আবির্ভাব হয় নাই। কোন কবি নিজে গাহিতেও পারেন না। ফলে তাঁহারা গান লিখেন না। সাহিত্যের পদবীতে উন্নত গানের ধারা সাময়িক ভাবে মরুপথে হারা। রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রতিভার রাজসূয় যজ্ঞের পর যাহাদের নির্বাসনে যাইতে হইয়াছে, তন্মধ্যে 'গীত রচনা' সম্ভবতঃ দুঃশাসন লাঞ্ছিতা যাজ্ঞসেণী।

এইবার রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত অন্যান্য ধারার কথা বলি—

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সমালোচনা—তত্ত্বতথ্যের আলোচনা নয়, রসালোচনা—অভিনব রস-সাহিত্যসৃষ্টি—আলোচ্য বস্তুকে বৃন্তস্বরূপ আশ্রয় করিয়া কবিমনের মাধুরী ও আপনার রসসৌন্দর্যে বিকাশ। হংসের মতো কবি অম্বুমিশ্র ক্ষীর হইতে ক্ষীরটুকুই গ্রহণ করিতেন—তাহাতেই সার ও অসারের পরীক্ষাও হইয়া যাইত। এইরূপ সমালোচনার ধারা প্রবাহিত হয় নাই। এখনকার সমালোচনা প্রধানতঃ কি পুস্তকে কি প্রবন্ধে কি থিসিসে তথ্য ও উদ্ধৃতিতে ভারাক্রান্ত বিষয়বস্তুর নীরস আলোচনা।

রবীন্দ্রনাথের পত্র-সাহিত্যে পত্রের পাত্র নিমিত্ত মাত্র—আধেয়ের পাত্রের মতো। এই পাত্র উপলক্ষ লক্ষ্য দেশকালপাত্রাতীত রসজ্ঞসমাজ। পত্র তাঁহার সাময়িক চিন্তার বাহন। মিত্র-সম্মিত পদ্ধতিতে সাহিত্যরচনার জন্য পত্রের আকৃতি প্রকৃতিকে তিনি আশ্রয় করিয়াছেন। এই পত্র সাহিত্যের ধারা প্রবাহিত হয় নাই।

ভ্রমণবৃত্তান্তকে কবি ভ্রমণসাহিত্যে পরিণত করিতেন—এই ভ্রমণ সাহিত্যকে ভ্রমর-সাহিত্য বলা যাইতে পারে। ভ্রমরের মতো কবি স্থান হইতে স্থানান্তরে ভ্রমণ করিয়া যে মধু আহরণ করিয়াছেন—তাহারই মধুচক্র তাঁহার ভ্রমণকাহিনী।

পরবর্তী লেখকদের ভ্রমণ কাহিনীতে ইহার প্রভাবসম্পাত হইয়াছে—সরস করিয়া বর্ণনা করিতে গিয়া কোন কোন লেখক ভ্রমণ কাহিনীকে উপন্যাসেও পরিণত করিয়াছেন।

বর্তমান যুগের স্মৃতিকথাগুলিতে রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি প্রভাব সঞ্চার করিয়াছে—কিন্তু ঐগুলির সামাজিক মূল্য যতটা সাহিত্যিক মূল্য ততটা নয়। বৈচিত্র্যহীন জীবনের স্মৃতিকথাকে সাহিত্যে পরিণত করা সহজ নয়।

নাট্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ নব নব ধাবার প্রবর্তন করিয়াছেন—যেমন গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, কাব্যনাট্য, রঙ্গনাট্য—সর্বোপরি রূপক নাট্য বা ভাব-বিগ্রহাত্মক নাট্য। এ সকল প্রকরণেব নাট্যধারা প্রবাহিত নাই বলিলেই হয়। চির প্রচলিত ধারার উল্লেখযোগ্য নাটকও বেশী রচিত হয় নাই। অনেকগুলি অব্যবসায়িক নাট্যপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে—সেগুলিতে যুগধর্মের অনুগত ধারায় রচিত নাট্যবালীব অভিনয় হয়। সাহিত্যের দরবাবে এইগুলির অধিকাংশই প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। রবীন্দ্রনাট্যের প্রভাব এইগুলির উপরে যৎসামান্য। অভিনয় কলার অসামান্য শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু তদুপযোগী নাটক দুর্লভ। সিনেমাই পেশাদার রঙ্গমঞ্চকে প্রায় কবলিত করিয়াছে। একাঙ্কিকা নাটিকা ও প্রহসনও কিছু কিছু এখনো রচিত হয়—চিরকুমার সভার মতো মার্জিত বিদগ্ধ রুচির উপভোগ্য রঙ্গ নাটক আর রচিত হয নাই। ভাব-বিগ্রহাত্মক নাটকের ধারা রক্ষা করিতে পাবে এমন কোন নাট্যকাবের আবির্ভাব হয় নাই। সিনেমার বহুল প্রসারের জন্য নাটকের চাহিদা নাই পাঠকদের পক্ষ হইতে। স্বাধীন স্বচ্ছন্দ ভাবে অপর মুখাপেক্ষী হইয়া সাহিত্য রচনা না করিলে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের স্বষ্টি হয় না। শক্তি থাকিলেও সাহিত্যিকরা জনসাধারণের চাহিদা না থাকিলে শুধু বিদগ্ধসমাজের ভরসায় কোন প্রকরণের সাহিত্য স্বষ্টির চেষ্টাই করেন না। সেজন্য বহু প্রকরণেব ধারা বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। নাটক ক্রমে উপন্যাসের মধ্যে আত্মবিলোপ করিতেছে। উপন্যাসই নাট্যাকারে পরিণত হয় ব্যবসায়ীদের চাহিদায়। সেগুলির দুই চারখানা মাত্র গ্রন্থকার লাভ করে—গ্রন্থাগার সেগুলিকে চায় না।

প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ বিরাট স্বষ্টি। প্রবন্ধকে তিনি প্রবন্ধ সাহিত্যে পরিণত করেন। সত্য শিব সুন্দরের পূজারী রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-মালাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

১। সত্যাশ্রিত—কোন সত্যকে প্রতিষ্ঠার জন্য কিংবা কবিগুরুর ভাষায় সত্যের ভূমির উপর দিয়া লঘু পদে বিচরণের জন্য রচিত। যুক্তির বদলে

ঘন ঘন ঔপম্য (Analogy) প্রয়োগে সরস করিয়া অথবা পঞ্চভূতের মতো মিত্র সম্মিত আলোচনার আকারে রচিত বলিয়া তাহা সাহিত্য।

২। শিবাশ্রিত—জাতীয় কল্যাণ ও মানবাত্মার কল্যাণের জন্য রচিত। কবিত্বময় ভাষায় হৃদয়াবেগে অনুপ্রাণিত বলিয়া সাহিত্য।

৩। সুন্দরাশ্রিত—অবিমিশ্র রস সৃষ্টির জন্য রচিত।

কবি মানসের সহিত গভীর চিন্তাশীলতার শুভ সম্মিলনের অভাবে প্রবন্ধ সাহিত্য দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে।

প্রবন্ধ পূর্ববৎ রচিত হইতেছে কিন্তু ভাষার জন্য তাহা সাহিত্যপদবাচ্য হইতেছে না।

এযুগের অধিকাংশ প্রবন্ধ তথ্য, উদ্ধৃতি ও যুক্তির সাহায্যে অপরিচ্ছন্ন অস্বচ্ছ ও ইঙ্গবঙ্গীয় ভাষায় রচিত।

রবীন্দ্রনাথ বাংলার লেখক ও পাঠকদের সর্বশাখার সাহিত্যের আদর্শ নিদর্শন যেমন দিয়াছেন, সাহিত্যবিচারমূলক প্রবন্ধ তেমনি দিয়াছেন রসবোধে দীক্ষা, স্বদেশসেবামূলক প্রবন্ধে স্বদেশ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে দিয়াছেন শিক্ষা, ধর্মমূলক প্রবন্ধে দিয়াছেন সর্ব-সংস্কারমুক্ত মানবধর্মের ব্যাখ্যা, আর শিক্ষামূলক প্রবন্ধে করিয়াছেন শিক্ষার পথ-নির্দেশে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। জাতীয় জীবনে তাঁহার প্রভাবের ইহাই চরম কথা।

সাহিত্যের যতগুলি শাখা আছে—সবগুলিই রবীন্দ্র-প্রতিভা সুফলাঢ্য করিয়াছে। এই প্রতিভা—"উড়ুম্বর-বৃক্ষ যৈছে ফলে সর্ব অঙ্গে।"

মাত্র দুই তিন জন অনুবর্তী বিবিধ শাখায় কিছু কিছু ফল ফলাইতে পারিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের ভাষা আজিও অননুকরণীয়। এ ভাষা তাঁহার নিজেরই সৃষ্টি—যেন জঙ্গলকে উদ্যানে, গুদামঘরকে ভাণ্ডারে, ধ্বংসাবশেষকে মিউ-জিয়ামে পরিণতি দান। সাহিত্যিকদের ভাষা যদি হয় অন্ন—তবে আমাদের কেহ কেহ সে অন্নকে পলান্নে বা খেচরান্নে—কেহ কেহ বা কদন্নে পরিণত করিতেছেন কিন্তু কেহই রবীন্দ্রনাথের ভাষার মত কর্পূরবাসিত পরমান্নে পরিণত করিতে পারেন না। কবিগুরুর কবিতার যত্নরচিত ভাষা রত্নখচিত কঙ্কণের নিক্কণের মত মধুর। আমি গদ্য ভাষার কথাই বলিতেছি। এই ভাষা বক্রোক্তি-ঘন, গাঢ়বন্ধ ও কৌতুকোজ্জ্বল। শাণিত বুদ্ধির চাতুর্যচমকে চমৎকার। এই ভাষার ঐশ্বর্য, চাতুর্য আমরা উপলব্ধি করিয়াছি—কিন্তু কেবল অনুশীলনের দ্বারা তাহা তো অধিগত করা যায় না। আমাদের বক্রোক্তিসৃষ্টির' স্বাভাবিক শক্তির অভাবের পূরণ করিবার জন্য আমরা ইংরাজি বাক্যাঙ্গের অনুবাদ করি

এবং ইংরাজী. বক্রোক্তিগুলিকে বাংলায় রূপান্তরিত করি। তাহাতে ভাষার অন্ন পলান্নে বা খেচরান্নে পরিণত হয়—কিন্তু তাহা সরস্বতীর ভোগে লাগে না। কদন্ন কেহই চাহেনা—পলান্ন পরিপাক করিতে পারে না, পরমান্ন যদি নাই পাওয়া যায় তবে পাঠক সাধারণ অবিকৃত অবিমিশ্র অন্ন পাইলেই যথেষ্ট মনে করি।

উপসংহারে সাহিত্যিক গোষ্ঠির উদ্দেশে বিনীত নিবেদন—রবীন্দ্রনাথ রসসুন্দরের পূজারী হইলেও শিবসুন্দরকে তিনি রসসুন্দরের সহিত হরিহরাত্মক মনে করিতেন। তিনি শুধু রসসৃষ্টিই করেন নাই জনগণের ইষ্টানিষ্ট বিষয়ে তাঁহার খরদৃষ্টি ছিল। তাঁহার আদর্শ আপনারা ত্যাগ করিবেন না।

এই সদ্যোমুক্ত জাতিকে সর্বাঙ্গসুন্দর ও দেহেমনে প্রকৃতিস্থ করিয়া আপনাদেরই গড়িয়া তুলিতে হইবে। কেবল নরনারীর বিশেষ করিয়া যুবক যুবতীর অবসর বিনোদনের উপচার যোগানো সাহিত্যের যদি ব্রত হয়—তাহা হইলে সাহিত্যের যে কোন অনুকল্পের দ্বারাই তাহা সাধিত হইতে পারে। তাহাতে সাহিত্যিকদের মর্যাদা হারাইয়া বাজিগরের পর্যায়ে নামিয়া যাইতে হইবে। পাঠকপাঠিকাদের রুচিপ্রকৃতির আনুগত্য না করিয়া তাহাদের রুচি প্রবৃত্তির সংস্কার সাধন আপনারাই করিতে পারেন।

জনসাধারণের কাছে ধর্মগুরু বা জ্ঞানগুরুদের বাণী পৌঁছায় না—আপনারাই তাঁহাদের বাণী-সম্ভার ও জ্ঞানসম্পদ অধিগত করিয়া তাহা ঘরে ঘরে প্রেরণ করিতে পারেন, যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী আপনাদেরই একজনের রচিত সাহিত্যের বাহনতায় ঘরে ঘরে পৌঁছিয়াছে।

আপনারা মনে প্রাণে জানেন মানবকল্যাণের সঙ্গে রসসাহিত্য সাধনার বিরোধ নাই। জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনাগুলিতে তাহার প্রমাণ আছে।

আমাদের জাতি দুর্বল, দরিদ্র, অসংযত, অসংহত, শিক্ষাবিমুখ ও সদ্য-শৃঙ্খলমুক্ত, কিন্তু শৃঙ্খলাযুক্ত নয়। কাজেই ইউরোপীয় সাহিত্য ও সমাজের দোহাই দিয়া লাভ নাই। শুচিসুন্দর উদাত্ত মহান ভাবগুলিকে কি করিয়া আর্টের অঙ্গহানি না করিয়া কৌশলে সন্তর্পণে দেশময় বিকীর্ণ করা যায় তাহা আপনারাই জানেন। জ্ঞানগুরুরা বা লোকশিক্ষকরা তাহা জানেন না। কোথাও একটু বাকসংযম, কোথাও কল্পনার একটু বল্গাসংহরণ, কোথাও সুনীতি-দীপের সামান্য সামান্য আলোকপাত, কোথাও পাপের প্রতি জুগুপ্সা, কোথাও ইঙ্গনা ব্যঞ্জনার সাহায্য গ্রহণ, কোথাও রিরংসামূলক অংশ বর্জন—হয়তো এইরূপ সতর্কতার প্রয়োজন হইতে পারে। তাহাতে সাহিত্যের ক্ষতি কীই বা হইতে পারে? কামধেনু যার ঘরে ছাগীশোকে সে কি মরে?

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

সাহিত্য শাখার উদ্বোধকের ভাষণ

পরিচিতি :

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

১২৮৮ সালের ১৯শে ফাল্গুণ বর্ধমান জেলার কুনুর ও অজয়নদীর সঙ্গমস্থলে কোগ্রাম বা উজানী গ্রামে বৈদ্যবংশে এঁর জন্ম। ইনি দীর্ঘকাল মাথরুন (বর্ধমান জেলায়) উচ্চ ইংরাজি স্কুলে প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ইনি বাংলার অন্যতম প্রবীণ কবি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'জগত্তারিনী স্বর্ণ পদক' দানে এঁকে সম্মানিত করেন। 'আকাশ-বাণী' দিল্লীর সর্বভারতীয় কবি সম্মেলনে বাংলার প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস আয়োজিত স্বাধীনতা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে গুণীজন সম্বর্দ্ধনা অনুষ্ঠানে এঁকে বিশেষ সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। কলকাতার অন্যতম সাহিত্য প্রতিষ্ঠান 'সাহিত্য-তীর্থ'-এর সভাপতিরূপে গত আটবছর যুক্ত আছেন।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

সাহিত্য শাখার উদ্বোধকের ভাষণ

অভ্যুদয়িক

"জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতী পবমেশ্বরৌ।"

সমবেত ও সমাগত বান্ধব ও বান্ধবীবৃন্দ,

আপনাদের প্রদত্ত গুরু গৌরবে আমি এতই উল্লসিত হইয়াছি যে নিজের অযোগ্যতা এবং গৌরবের পিছে যে ভাব আছে তাহাও ভুলিয়া গিয়াছি। আমি নমস্কার করি আপনারা প্রসন্ন হোন।

যাঁহারা বৃহত্তর ও মহত্তর বঙ্গের স্রষ্টা আপনারা তাঁহাদের যোগ্য বংশধব। আপনারা বাঙলার সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক, যে প্রদেশে গিয়াছেন মর্যাদাব আসন লাভ করিয়াছেন এবং সে স্থানকে নব নব গৌবব দান করিয়াছেন। আপনারা দণ্ডকারণ্যে নব ইন্দ্রপ্রস্থের ভিত পাতিতেছেন—গভীর আনন্দে ও আগ্রহে আপনাদিগকে বরণ করিয়া লইতেছি।

বাঙালী হায় যেথায় যাবে, বাঙলা তাহার সঙ্গে যায়,
বৃন্দাবনের কাছেই তাহার নদীয়া যে দিন দাঁড়ায়।
যেথায় থাকুক নাইকো ক্ষতি,
সঙ্গে থাকেন হৈমবতী,
'কালিদহের' কাহিনী কয়—সিংহলের সে রাজসভায়।
থাক যে দেশে, থাক যে বেশে সপ্তসাগর লঙ্ঘি সে
কাশীদাস আর কৃত্তিবাসে পায় যে চিরসঙ্গী সে।
বাউল নাচে তাহার মনে,
হৃদয় গলে সংকীর্তনে।
চিন্তা তাহার নয়ন জলে গ্রামের পথে পথ হারায়।

বাঙালী কল্যাণকৃৎ হইয়াও অনেক দুর্ভোগ সহ্য করিয়াছে ও করিতেছে। অনেকে বলেন বাঙালী কি মহাসমরে না মরিয়া সাতনলার ঘায়ে মরিবে?

সব্যসাচী কি বৃহন্নলা হইয়াই থাকিবে? না, থাকিবে না—মহাভারতের কপি-ধ্বজ রথের সারথি তাঁহাদিগকে ভুলিবেন না।

কবিগুরু আপনাদের ভাষাকে ঐশ্বর্যশালিনী করিয়া জগৎবরেণ্যা করিয়াছেন, আপনারা নিজ অব্যভিচারী প্রতিভায় ও মনীষায় সেই সুধাসত্রের অধিকারী হইবেন। আপনাদের সর্বাঙ্গীন অভ্যুদয় আমি কামনা ও প্রার্থনা করি।

সর্বশুক্লা সরস্বতী প্রসীদতু।

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতীয় সাহিত্য শাখার উদ্বোধকের ভাষণ

পরিচিতি :

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯০১ সালে হাওড়া জেলার বালীগ্রামে এঁর জন্ম।

ইনি প্রথম শ্রেণীতে এম, এ এবং এল, এল, বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে ভারতীয় অডিট এবং এ্যাকাউণ্টস বিভাগীয় কাজে যোগ দিয়ে কর্মজীবন আরম্ভ করেন। ১৯৫৮ সালে ইনি বিশ্বব্যাঙ্কের সঙ্গে আর্থিক ব্যাপারে আলোচনার জন্য ভারতীয় দলের প্রতিনিধি হিসাবে আমেরিকায় প্রেরিত হন। গৌহাটি, দিল্লী এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ইনি বিশেষ বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছেন। ১৯৩৮ সালে রেঙ্গুণে অনুষ্ঠিত 'নিখিল বর্মা বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে' ইতিহাস শাখার সভাপতিত্ব করেন। ১৯৬০ সালে বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে একটি শাখার উদ্বোধন করেন। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার আর্থিক উপদেষ্টা'রূপে কাজ করে অবসর গ্রহণের পর ইনি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে রাজস্ব বিষয়ক উপদেষ্টারূপে কাজ করছেন। এঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—'দুই কবি', 'অসমীয়া সাহিত্য', 'বিনা টিকিটে', 'রাগে আর অনুরাগে' প্রভৃতি।

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতীয় সাহিত্য শাখার উদ্বোধকের ভাষণ

হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে
জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে ।
হেথায় দাঁড়ায়ে দুবাহু বাড়ায়ে
নমি নরদেবতারে
উদার ছন্দে পরমানন্দে
বন্দনা করি তারে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে ভারতের সেই শাশ্বত আত্মার জয়গানই উদ্বোধনের বাণীরূপে উচ্চারণ করি, বলি—এহি, আয়াহি, আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা—এসো সবাই, আর্য, অনার্য, দ্রাবিড় শকহুণদল, পাঠান মুঘল—ভারতের আনন্দ-যজ্ঞে সবার নিমন্ত্রণ—ঋষি সনৎকুমার শোকার্ত নারদকে বলেছিলেন—যো বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি।

আজ ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে নানা ঘাত প্রতিঘাত সংঘর্ষের মধ্যে, ভারতভাগ্যবিধাতাকে জোড়করে বলি—হে আমার পরম দেবতা, তোমাকে কী শুধু কবিকল্পনার বাগ্‌বৈখরী শব্দঝরী রোমাণ্টিক ভাবালুতার মধ্যেই দেখবো—দেখা দাও তোমার জনগণের মঙ্গলদায়ক ঐক্যবিধায়ক রূপে, ভাস্বর হোক পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থার মাঝখানে তোমার পথ-পরিচায়ক মূর্তি, কর্মবহুল জীবনের প্রতিটি আভাসে, ব্যষ্টি ও সমষ্টির আকুতিতে, জ্ঞানের দীপ্তিতে, ধ্যানের স্মৃতিতে, মননের শ্রুতিতে, তেজোময়ী বাক্‌রূপে। আজকের সাহিত্যে পথের দাবীই যেন বড়ো না হয়, যাত্রাপথের শেষ লক্ষ্যও যেন নজরে পড়ে। সেই জীবনযজ্ঞে আহুতি দেওয়া জীবনজিজ্ঞাসার ছোট্ট মশালটি জ্বেলে নিতে চাই আজকের এই সম্মেলনের সাহিত্যশেখরদের কাছে। কবি মনীষীরাই অনাগতদিনের শুধু দ্রষ্টা নন্ স্রষ্টা, তাঁরা, শুধু Craftsman বা কারুশিল্পী নন্, রসিক্ মহাজনও। বাক্য প্রতিষ্ঠিত হোক মনে, মন প্রতিষ্ঠিত হোক্ বাক্যে—অবতুবক্তারম্ বক্তারমবতু।

মনে পড়ছে কয়েকবছর আগে এমনি এক হেমন্তের দিনান্ত বেলায়, কুহেলি-গুণ্ঠনতলে যখন প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন 'নিখিল ভারত' নাম নিয়ে নব-কলেবর ধারণ করলে, সেদিন মনে মনে উৎসাহিতই হয়েছিলাম, সাধুবাদ দিয়েছিলাম উদ্যোক্তাদের, বলেছিলাম যে তাঁরা যেন গণ্ডীর মোহ কাটিয়ে, নামের বেড়াজাল ঘুচিয়ে, নিজেদের সমস্যার ছোট ছোট কথার মধ্যেও বাংলা সাহিত্যের সেই চিরন্তন বিশ্বরূপটিকে ধরতে পারেন, দলবেদলের মাদল ছাপিয়ে যদি একটা বৃহৎ মহৎ আদর্শের প্রতিষ্ঠা করতে পারেন তবেই সম্মেলন গতানুগতিকতার আবিলতা কাটিয়ে সম্যক্ মিলনের প্রাণভূমিতে অধিষ্ঠিত হতে পারবে। চিরকালের বাঙালী ভারতপথপথিক। দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে শুধু কবির কল্পনা নয়, কাব্যের মোহ নয়, ভাবের ঘরে চুরি নয়, এ হচ্ছে ইতিহাস-সম্মত নির্ভরযোগ্য অনুমান। প্রায়ই শুনি বাঙালী ভাবুক্, বাঙালী তার্কিক, তার চরিত্রে স্থৈর্য নেই, দাঢ্য নেই, প্রতিভার স্ফূরণ আছে ভাবোদ্বেল উচ্ছ্বাস আছে কিন্তু আঁকড়ে ধরে থাকবার শক্তি নেই। দ্রাবিড় আর্য মোঙ্গল প্রটো-অষ্ট্রলয়েড, ভেড্ডিড, ইনডিড্ মেলানিড্ বাঙালীর রক্তে, ভাবে মননে আছে নানা ধারার স্রোতধ্বনি, সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীর। হয়তো আমাদের আছে "কর্মনাশা ভেদবুদ্ধির সর্বনাশা বিস্তার" হয়তো "আমাদের আসন আজ সঙ্কীর্ণ ও অসম্মানিত," হয়তো নানা ভুল আমরা করেছি, অহমিকায় চঞ্চল হয়েছি, কিন্তু সাহিত্যের সাধনায়, সংস্কৃতির প্রসারে আমরা শুধু ভারতপথপথিক নই বিশ্বপথপথিকও। এই একটি কথা আমি বারে বারে সভয়ে নিবেদন করতে চেয়েছি, পুনরুক্তির দোষ স্বীকার করে নিয়েও, যে স্থির অবিচলিত চিত্তে অখণ্ড ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে দেখলে এই প্রশ্নই জাগবে—বাংলা দেশ শুধু কি একটা ভৌগোলিক সীমায় নিবদ্ধ, না তার একটা আদর্শের ঐতিহ্যের সংস্কৃতি রূপরেখাও আছে। ইতিহাসের গভীরে তার সত্যকার সত্তাটিকে বেত্তার দৃষ্টি দিয়ে বাংলার মনের কথা যিনি পড়েছেন তিনিই জানেন বাঙালীর পদযাত্রা সেইদিনই সফল হয়েছে যেদিন সে কৌপীনবস্ত হয়ে বেরিয়ে পড়েছে, ভল্লশূলশল্য নিয়ে নয়, গৈরিক কাষায় পরে, আদর্শ নিয়ে, আইডিয়া নিয়ে, সেবার মন্ত্র নিয়ে, দরিদ্রকে নারায়ণ জ্ঞান করে—

কেয়া জানে কীধার সে নারায়ণ মিল যায়

বাঙালীর অন্তর্জগতের এই বিচিত্র রূপটি ধরা পড়েছে তিনটি প্রধান যুগে—পাল-সেনযুগ—বৈষ্ণবীয় মধ্যযুগ—উনবিংশ বিংশ শতাব্দীর যুগ। নবাংকুর

ইক্ষুবনে তার শ্যামল শ্রীবৃদ্ধির চিত্রই দেখিনি, প্রাকৃত পৈঙ্গলে তার ভোজন-বিলাসের কথাই পড়িনি—তাকে দেখেছি সে চলেছে হরজটাভ্রষ্ট ভাগীরথীর উপকূল ছাড়িয়ে, তুষারতীর্থ তিব্বতে, নেপালে, পামিরে, খোটানে, সমুদ্রধৌত সিংহলে, চম্পায়, শ্যামে, চীনে, স্বুবর্ণভূমিতে, প্রাম্বানানে, ইরউজীর মন্দিরে, দ্বীপময় ভারতে। দেখেছি তাকে বোধিদ্রুমের মূলে ধ্যান-নিমগ্ন আপনি মগ্ন, সংঘারামেব পঠনপাঠনশিক্ষকতায, সেবাব ব্রতে, ত্যাগের তপস্যায়, যোগিনী চক্রেব মূলাধাবে, ববোবদূরে আংকরে। সে বলেছে—

যে মানব আমি সেই মানব তুমি কন্যা
সেই বাবি তীর্থবারি যাহা তৃপ্ত করে তৃষিতেবে
.... জল দাও, আমায় জল দাও।

সেদিন চণ্ডালিনীকে গৃহিনী কবতে বাধেনি, মন্দিরে মসজিদে পথ ঢাকলেও একগুরুর ডাক শুনতে ভুল হয়নি। সহজানন্দে আদরিণী 'নৈরামণির সঙ্গে মহাসুখচক্রে বিহাব করতেও বাধা ঘটেনি। সাহিত্যসাধকও যে বজ্রধর—সেখানেও আছে দিব্যানন্দের অনুভূতি। সাহিত্যলক্ষীর শক্তি যখন নির্মাণচক্রে প্রথম জাগে তখন প্রচণ্ড দাহন হওয়া স্বাভাবিক কারণ তখন তিনি চণ্ডালী। এই দেবীকে স্থূল ভাবে ধরতে গেলেই যত বিপদ। একদিন কাশ্মীরে পরিহাসকেশবের মন্দিরে বাঙালী নতুন ইতিহাস রচনা করেছিলো। সেদিন তার শুধু বল্লালী কৌলীন্যই ছিলনা, মঙ্গলকাব্যের রসপানই ছিল না, সহজ জীবনও ছিল। কতো গর্গ, দর্ভপাণি, হলায়ূধ, জয়দেব, শরণ, ধোয়ী, রামচন্দ্র ভারতী সন্ধ্যাকর নন্দী, দীপংকর অতীশ, তারানাথ, চন্দ্র গোমী, বসুবন্ধু তার সমন্বয় সন্ধানী ঐতিহ্যকে গড়ে তুলেছিল তার ইয়ত্তা নেই। বৈষ্ণবীয় যুগেও দেখি বাঙালী চলেছে দাক্ষিণাত্যে, নীলাচলে, বৃন্দাবনে, প্রেমের মন্ত্র নিয়ে, নামের শরণ নিয়ে, জ্ঞানের বর্তিকা জ্বেলে। রায় রামানন্দের অনুরাগই বাড়েনি, শিখী মহান্তী স্বরূপদামোদরের শিষ্যত্বেই তার অভিযানের অবসান হয়নি। সেদিন সে গেছে গুর্জরে, মহারাষ্ট্রে, দক্ষিণে, আসামে, উৎকলে, মিথিলায়, প্রভুর বেশে নয়, সেবকের রূপে। বাইরে তখন ধাক্কা দিচ্ছে ইসলামের চণ্ডবেগ—প্রচণ্ড আঘাতে কাঁপছে দেশ ও দশ, তারই মধ্যে বাঙালী বসেছে মহাভারতীর সাধনায়। তৃতীয় যুগেও সেই কথা। সারা ভারত উথল হো গিয়া। সেই রসসঞ্জীবনী প্রাণবন্যার উদ্ভব এই বাংলা দেশেই। শত দুঃখের শতবেদনার তিক্ততার গৃধ্নু তার মধ্যেও বাঙালীর ভারতপথ পথিকত্বের কথা যেন না ভুলি। একে

প্রাদেশিকতার অভিমান বললে ভুল হবে—এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথাই স্মরণ করবো—সমগ্র ভারতবর্ষের কাছে বাংলার সম্মেলন যাতে সম্পূর্ণ হয়, মূল্যবান হয়, পরিপূর্ণ ফলপ্রসূ হয় যাতে সে রিক্তশক্তি হয়ে পশ্চাতের আসন গ্রহণ না করে, তারই জন্য আমার এই আবেদন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই যে নবচেতনার আবির্ভাব ঘটলো তার নামকরণ করেছি আমরা রেনাসাঁস। এই জাগরণের রূপ কী, এর ঐতিহ্য কতোটুকু, পশ্চিমের বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস রাষ্ট্রচেতনা একে কতটা প্রভাবিত করেছে, এটা উপরতলার লোকেদের মানসিক বিলাস না নীচের তলার সঙ্গেও আত্মিক সংযোগ ছিল, এর মধ্যে প্রগতি বিরুদ্ধ-শক্তি (Counter reformation) কতটা নিজেকে বদলে নিয়েছে এটা জাগরণ বা পুনরুত্থান (nascence বা renascence), বা শ্রেণীবর্জিত সমাজ-গঠন চিন্তা কতটুকু প্রশ্রয় পেয়েছে, এই সব দামী গবেষণা নিয়ে সমালোচকেরা পাততাড়ি গুটান্, বিজ্ঞ-প্রাজ্ঞরা বড় বড় প্রবন্ধ লিখুন কিন্তু আমরা শ্রীঅরবিন্দের কথাই মেনে নেবো যে সেদিন সমাজ ছিল—'electric with thought and loaded to the brim with passion.' সে দিন দিকে দিকে চিন্তার ধারা তাড়িতচৌম্বক শক্তির আকর্ষণ নিয়ে টানতো এবং সমাজে ছিল একটা অদ্ভুত বেগ ও আবেগ। অবশ্য এর পরিধি ছিল স্বল্প, বিকাশের রঙ্গভূমি ছিল সীমানিবদ্ধ, তবু এটা অনুকরণ নয়—Originality does not lie in rejecting outside influences but accepting them, as new mould into which our own individuality may run'—বাংলায় এই রসায়নই ঘটেছিল।

কিন্তু এরও পিছনে ছিল একটি বিরাট্ পটভূমিকা—তাকে বলা যেতে পারে—ভারত-চেতনা। ইতিহাসের বৃহত্তর পরিধিতে দেখা যায় যে দশম শতাব্দীর মধ্যেই ভারতে বৌদ্ধধর্ম ক্ষীণ হয়ে এসেছে, জৈনধর্ম লুপ্ত বা হিন্দু-ধর্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেছে এবং সারা ভারতবর্ষ জুড়ে শিব, বিষ্ণু আর দেবী এই ত্রিদেবতার আরতির শঙ্খঘণ্টা বাজছে মন্দিরে মন্দিরে। বুদ্ধ দশাবতারের একজন, ঋষভ ঋষিও বিষ্ণুর অংশ। শংকরাচার্য, চারিধামে চারিটি মঠ স্থাপন্ করে শিব ভক্তদের বান্ধব করলেন, ত্রিভুবনকে স্বদেশ করলেন। পশ্চিমে দ্বারকায় সারদা মঠে যাঁকে প্রণাম জানালাম, যে 'তত্ত্বমসি'কে প্রতিষ্ঠা করলাম তাঁকেই দক্ষিণে অন্যরূপে দেখলাম শৃঙ্গেরী মঠে, 'প্রজ্ঞানাং ব্রহ্ম' এই মহৎবাক্যের মধ্যে। আবার যিনি পুরীর গোবর্দ্ধন মঠে 'অহংব্রহ্মাস্মি', তিনিই হিমমন্ডিত জ্যোতির্মঠে পরমজ্যোতির আকর 'অয়মাত্মাব্রহ্ম'। এই স্থিতধী নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ কেরলের কালাদি থেকে হিমালয়ের তুষার তীর্থে যে অপূর্ব ভারতের কথা গাইলেন, তাতে তাঁকে প্রণাম জানাতে হয় ভারত-ঐক্য বিধায়ক্

হোতাদের সব চেয়ে প্রধান বলে। কাশ্মীরে সারদা মন্দিরে তাঁকে নাকি প্রথমে ঢুকতে দেওয়া হয়নি কারণ তাঁর কামকলার শিক্ষা হয়েছিল বিদেহী আত্মার অন্য দেহধারণে। রাজতরঙ্গিনীতে কবি কলহন্ বললেন—

আলোক্য সারদাং দেবীং যত্র সংপ্রাপ্যতে ক্ষণাৎ
তরঙ্গিনী মধুমতী বানী চ কবিসেবিতা

কলহন্, ক্ষেমেন্দ্র, ভামহ, অভিনবগুপ্ত, মম্মট, সকলেই কাশ্মীরের, কিন্তু সকলের মনেই ভারত চেতনার একটা স্বর বয়ে গেছে। নৈয়ায়িক শ্রেষ্ঠ বাঙালী জয়ন্ত ভট্ট কাশ্মীরের কারাগারেই তাঁব ন্যায়শাস্ত্রের টীকা লেখেন। অবশ্য এরও পূর্বে কালিদাসের রঘুর দিগ্বিজয়ে ভারত পরিক্রমার একটি অপূর্ব চিত্র আমরা পাই। রঘু বলেছেন তালীবন শ্যামোপকণ্ঠ মহোদধির তীর থেকে—

বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্
নিচখান্ জয়স্তম্ভান গঙ্গাস্রোতোহন্তবেষু সঃ

তারপর উৎকলদর্শিত পথ বেয়ে কলিঙ্গ পার হয়ে কাবেরী সরিতে স্নান করে তাম্রপর্ণী সমেতস্য মুক্তাসারং মহাসমুদ্রের তীরে রঘু পৌঁছলেন—কেরলষোষিতরা ভয়ে কম্পমান হলো। আবার গৌরীগুরু শৈল জয় করে

চকম্পে তীর্থলোহিত্যে তস্মিন প্রাগজ্যোতিষেশ্বর
কামরূপেশ্বরস্তস্য হেমপীঠাদিদেবতাম

ভারতচেতনায় আর একটি রহস্য ছিল—কালিদাস বারে বারে এই কথাটির উপর জোর দিয়েছেন—ভোগের সঙ্গেই ত্যাগ। এখানেও দেখি বিশ্বজিৎ যজ্ঞ।

ত্বমধ্বরে বিশ্বজিতি ক্ষিতীশং
উপাত্তবিদ্যোগুরু দক্ষিণার্থী
কৌৎস প্রপেদে বরতন্তু শিষ্য

সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর রঘুর কাছে যখন ঋষির শিষ্য এসে কিছু দক্ষিণার আবেদন জানালে তখন তিনি নিজেই রিক্তবিত্ত, মৃণ্ময় পাত্র ব্যবহার করছেন।

ইতিহাসের দিক থেকে বলা যেতে পারে যে সপ্তম অষ্টম শতাব্দী থেকেই অস্ফুট ভারত চেতনা একটা অখণ্ডরূপের ইঙ্গিত দিচ্ছে। আমরা তিন দেবতার পূজা করছি, আমরা জীবাত্মা পরমাত্মা মায়াবাদ পুনর্জন্ম চাতুর্বণ্য মানছি, বেদকে অপৌরুষেয় বলছি, ধর্মশাস্ত্র সূত্রস্মৃতির অনুশাসন গ্রহণ করছি। নানা বিভেদের মধ্যেও এই মৌলিক ঐক্যটির কথা ভুললে চলবে না। উর্দ্ধে নীলিম আকাশ নিম্নে নিমীল পৃথিবী, তিনদিকে তিন সমুদ্রের উদার বিস্তৃতির দিক চেয়ে কন্যাকুমারিকায় বসে জবাকুসুমসংকাশ দেবতাকে যে 'চিত্রং দেবানামুদগাদনীকম' 'চক্ষুর্মিত্রস্যবরুণস্যাগ্নে' বলে প্রণাম জানিয়েছি তাঁকেই প্রাগজ্যোতিষের পথে ব্রহ্মপুত্রের তীরে একই বরদবেদ মন্ত্রে অভ্যর্থনা করেছি। দক্ষিণের কবি ও স্রষ্টা শ্রীসুব্রহ্মণ্য ভারতী বলেছিলেন —ভারত মাতার ত্রিশকোটিমুখ, তিনি আঠারোটি ভাষায় কথা কন, কিন্তু তাঁর মন একটি। যুগযুগ ধরে এই শাশ্বত মনকে খুঁজতেই ছুটেছেন ভারতের সাধক শিল্পী যোগী ভোগী জ্ঞানীগুণীর দল। সেই ঐক্যকে তাঁরা পেয়েছেন শুধু বাইরের ইতিহাসের বর্ণাঢ্য সমারোহের মধ্যে নয়, ঘটনার সমাবেশের মধ্যে নয়, চঞ্চল জনতার উচ্ছ্বাসের মধ্যে নয়, একান্তে নিভৃতে নিজের অন্তরের অমৃতলোকেও। তাই শত বৈচিত্র্য, শত বিভেদ শত বিবাদের মধ্যেও ফুটে উঠেছিল একটি ঐক্যের সুর। একে শুধু Unity in diversity বলবো না। নানা বিচ্ছেদ বিভেদ বিতর্কের মধ্যে আমরা দেখি—The whole of India bears the impress of certain common movements of thought and life resulting in the development of certain common ideals and institutions.

আজকের সমাজ-জীবনে সাহিত্যসৃষ্টিতে ভারতীয় মনের এই যে ঐক্য এই যে জীবনবীক্ষা (Wellenschung) এর traditional valueর কথাই শুনি। কিন্তু নূতন নূতন চিন্তার ধারা এসে চেতনার রাজ্যে নূতন করে world of facts আর world of values এর মধ্যে যে সমন্বয়ের সূত্র ধরিয়ে দেয় তাব কথা আমরা ভুলে যাই। প্রাচীনের ধারা কিরকমভাবে আজকের যুগেও মানুষের চিন্তাকে রূপায়িত করে তার অজস্র প্রকৃষ্ট প্রমাণ পৃথিবীর সব সাহিত্যেই আছে। আর্থারের কাহিনী, ইউলিসিসের কাহিনী, মধ্যযুগে খৃষ্টের কাহিনী, আমাদের দেশে রামায়ণ মহাভারত পুরাণ অবলম্বনে কাহিনী-গুলি স্মরণ করলেই এর সত্যতা প্রমাণ হয়। গ্রীক কবি কাজাণ্টাজাকিস্ই হোন্, শ্রীঅরবিন্দই হোন, জেমসজয়সই হোন; রবীন্দ্রনাথই হোন, প্রাচীন উপাখ্যান-গুলিকে নূতন করে legend ও symbol এর মাধ্যমে যখন প্রকাশ করেন

তখন শুধু আনন্দই পরিবেশিত হয় না, একটা ঐক্যের সূত্রও গড়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলে রাখা উচিত যে ভারতীয় ঐতিহ্যে সংস্কৃতির রূপরেখা ধরে একটি ঐক্যের সূত্রের কথা নিবেদন করলেই একদল সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক সমালোচক তখনি বলবেন ভারতবর্ষ আবাব এক ছিল কবে, তার অন্তর্নিহিত ঐক্যের সুর সন্ধানে মনের কল্পনাপ্রবণ কণ্ডুয়নবৃত্তি প্রশ্রয় পায় বটে কিন্তু হার্ডফ্যাক্টের নিগড় পাশে বন্দী ইতিহাস গড়ে ওঠে না। ইতিহাসকে ভাবালু করে ঘোরালো করায় সার্থকতা থাকলেও সত্য নেই। আর যেখানে এতগুলি ভাষা, এতো বিভেদ, এতো দূরত্ব সেখানে ঐক্যের কথা তোলা বাতুলতা। ভারতবর্ষের ঐক্যচেতনা গ্রীকোলাতিন প্যাগান সভ্যতাপুষ্ট ইউরোপীয় মধ্যযুগের Christian Unityর চেয়েও শ্লথ। এ প্রশ্ন জটিল—এর উত্তর আলোচনা সাপেক্ষ, কিন্তু সত্যিই কি বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্যের মধ্যে একটা Unity of thought and theme নেই। বৈষ্ণব গাথায়, শৈব সাহিত্যে, রামায়ণী কথায়, গল্প বলবার ভঙ্গীতে, নাটকের পদ্ধতিতে, জীবনচর্চার রীতিতে নীতিতে সত্যিই কি ঐক্যের পরিচয় আমরা পাই না। আধুনিক কালে দেশভক্তি, স্বাজাত্যবোধ, স্বদেশপ্রেম, পশ্চিমের মানবতাবোধ, যুক্তিবাদী সুনিষ্ঠ চিন্তা সমগ্র ভারতকে কী এক অখণ্ড ভাবসমুদ্রের মধ্যে ফেলে দেয়নি। আজ কি দক্ষিণের নটরাজ উত্তরের অবলোকিতেশ্বরের সঙ্গে, গুর্জরের গান্ধিজী বাংলার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে, তামিলনাদের রমণ মহর্ষি পবমপুরুষ বামকৃষ্ণের সঙ্গে ভারতমনে একই সিংহাসনে সমাসীন নন্?

বৈষ্ণবসাহিত্যের কথাই ধরা যাক্। প্রাচীনকাল হতেই বিষ্ণু, কৃষ্ণ ও রামকে আশ্রয় করে যুগে যুগে দেশে দেশে এক বিরাট দর্শন ও সাহিত্য গড়ে উঠেছে। তার প্রমাণ মিলবে পূবে, পশ্চিমে, উত্তরে, মিথিলায়, তামিলনাদে, বাংলায়, আসামে, গুর্জরে, মহারাষ্ট্রে, রাজস্থানে, উত্তর প্রদেশে, এমনকি ভারতের বাইরেও। জানি পণ্ডিতরা বলবেন যে গৌড়ীয় বৈষ্ণববাদ ও দক্ষিণের বৈষ্ণববাদ এক নয়। একনাথ বা জ্ঞানেশ্বর যা বলেছেন মহাপুরুষীয়া শঙ্করদেব মাধবদেব বা পুষ্টিমার্গী বল্লভাচার্য তা বলেন নি। অণ্ডাল ব্য গোদা দেবীকে দক্ষিণের মীরাবাঈ বলা ভুল, মাধবকন্দলীর রামায়ণী কথা তুলসীদাসের রামচরিত মানসের সঙ্গে মেলেনা, কাম্বানের রামায়ণ মূল বাল্মিকীকেও হার মানায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন লিখলেন—

সেই মত বনানীর ছায়ে
স্বচ্ছশীর্ণ ক্ষিপ্রগতি স্রোতস্বতী তমসার তীরে
....

মহর্ষি বাল্মীকি কবি
রক্তবেগ তরঙ্গিত বুকে
গম্ভীর জলদমন্ত্রে বারম্বার
আবর্তিয়া মুখে নব ছন্দ

তখন কি মনে পড়েনা সন্ত তুলসীদাসের অপূর্ব পদ—

চহৈ ন সুগতি সুমতি সংপতি কছু বিধি সুতি বিপুল বড়াই!
হেতুরহিত অনুরাগ রামপদে বড়ে অনুদিন অধিকাই।।

আজকের কবিও যে আমাদের মনের অতি নিভৃত শ্রীরামকে প্রতীকরূপে গ্রহণ করে লিখেছেন—

ছায়া কাঁপে সেই জলে নবারুণ রাগে
সহস্র হিরণ্যশীর্ষ মহানগরের

তবু–

তবু আপন গহন সত্য
খুঁজিবার রহে যেন কিছু অবসর।   (প্রেমেন্দ্র মিত্র)

যখন দক্ষিণের সাহিত্যে পড়ি—হে পরং সোদি নী পরমায়—হে পরমপুরুষ জ্যোতি মনোরম—পড়িয়োবি নিকড কিনব—কী দিব উপমা তোমার

এ কী উজ্জ্বল রূপ ছটা হেরি
আ-কীরিট তব শ্রীচরণ বেড়ি
তব শ্রীঅঙ্গে বসনে ভূষণে
কমলা হৃদয়াচারী গো।
(যতীন্দ্র রামানুজদাসের অনুবাদ)

তখন অসমীয়া

পদ্মপত্রসম আয়ত লোচন
ভ্রূবযুগ করে কান্তি—

নাসা তিলফুল অধর রাতুল
দশন মুকুতা পান্তি—
শিরত কিরীট...........

এই ধরণেব পদ কি মনে পড়ে না।

আবার যখন দেখি নালিয়ার দিব্য প্রবন্ধে বা সম্ভ্রম সাহিত্যে এমন কি ভাবতীতেও কন্নন পাট্টব কথা অর্থাৎ কৃষ্ণকথা, তখন মনে হয় বাংলাব পদাবলীর সঙ্গে এব যেন মূর্ত সংযোগ রযেছে। তাঁদেব স্বাদ, আস্বাদ, ভাব, সবই কন্নই এন তায়, কন্নন-এন্ তন্দে। কেরলের কবি পূন্তানম নম্পূতির 'সন্তান-গোপালম'-এর সঙ্গে আসামেব মাধবদেবের বালগোপালেব ছবির সাদৃশ্য দেখি। একই সংস্কৃতির বেড়াজালে আমরা ঘেরা। যখন কেরলে ভল্লথোল লেখেন তাঁর 'অরুচিত্রম,' বা 'সাহিত্যমঞ্জবী', উড়িয়া ফকিরমোহন, রাধানাথ বা মধুসূদন লেখেন তাঁদের গল্প বা উপন্যাস, গুণাঢ্যের বৃহৎ কথার অন্ধ্রদেশে নান্নিয়া থেকে বীবেশলিঙ্গ পান্তলু, আপ্পারাও সাহিত্যধারাকে অব্যাহত রাখেন, বা পাঞ্জাবে ভাই বীরসিংহ, সুফী ও সিংসভা লেখকদেব ঐতিহ্য বহন করে লেখেন—

একদিন চললাম গুরুর গৃহে—
বললাম—প্রভু গ্রহণ কবো আমার জ্ঞানের পাত্র
ভিক্ষার ঝুলি
তিনি বললেন—মূর্খ, তোর পাত্র ধূলায় ভর্তি
ফেলে দিলেন আমার নিষ্ফলতার সঞ্চয়গুলি,
পাত্রটিকে ঘষে-মেজে তুললেন নূতন করে,
ধৌত করে পূতদীপ্ত করে
মিথ্যাশিক্ষার ধূলি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে

তখন হাজার মাইল দূর থেকেও এদের নিজের দেশের কবি বলে চিনে নিতে দেরী হয় না।

ভারতীয় সাহিত্যের এই মূলগত ঐক্য থাকলেও ভাষা ভিন্ন, ও দূরত্বের দরুণ প্রকাশভঙ্গী ও বিকাশের ধারা বিভিন্ন হয়ে উঠেছে। তাছাড়া আজ বিংশ শতাব্দীতে আমরা বিশ্বসাহিত্যের বিরাট আবর্তে পড়েছি। দেশ আজ স্বাধীন, আমরা স্বাধিকার প্রমত্ত। আজ ঘর ভাঙচে, মন ভাঙচে, সমাজ বিন্যাস বদলাচ্চে নূতন নূতন সমস্যা জাগচে—অন্নচিন্তা চমৎকারা, দেশে আসছে

শিল্পীকরণ। সে গ্রাম, সে অরণ্য, সে মন, সে মানুষ, সে বহতা নদী, সেই উত্তুঙ্গ গিরিশিখর নিয়ে রোমাণ্টিক ভাববিলাসিতার যুগ নেই। আজকের ক্রুদ্ধ নবীন জনতার দল (angry youngmen) চাইছেন যে জীবনের অলিগলির ভিতরে যে দুঃখ-দারিদ্র্য-কষ্ট-বিরহ-কামনা-বেদনা, লোভ লাস্য মূক হয়ে আছে তাকে প্রকাশ করতে, তার বাখ্যান বিচার বিশ্লেষণ করতে। আজ আর মোহময় অনুভূতিতে সাহিত্যের সৃষ্টি নয়, সে সাহিত্য হবে কঠিন, নিষ্ঠুর, জীবনরসে জারিত। সেখানে থাকবেনা শিবসুন্দরের কল্পনা, আবেগময় বাগবিস্তার। এ কথা শুধু ভারতবর্ষের নয়, সারা পৃথিবীর। ইংলণ্ডে এক যুগে ইয়েট্স, এলিএট্, অয়ডেন, স্পেণ্ডার, ডেলুইস্ একটা Cause খুঁজে বেড়িয়েছিলেন, সাহিত্যে তার স্পর্শ দিয়ে গিয়েছিলেন। আজকের তরুণ সাহিত্যিকরা কারণহীন্ কারণবারিতে হাবুডুবু খাচ্চেন। অসবোর্ণ, ওয়েন প্রভৃতির লেখা পড়লে মনে হয় যে তাঁরা হচ্চেন "far more interested in producing something, hardhitting, something that will make an immediate impact". একে কী রবীন্দ্রনাথের কথায় বিশ্লেষণ করবো—

মন উড়ু উড়ু চোখ ঢুলু ঢুলু মান মুখখানি কাঁদুনিক
আলুথালু ভাষা, ভাব এলোমেলো, ছন্দটা নির্বাধুনিক্
পাঠকেরা বলে এতো নয় সোজা
একটি বর্ণ যায়না সে বোঝা
কবি হেসে কন্ তাহার কারণ আমার কবিতা আধুনিক।

তবে কোন বক্রোক্তি না করেও বলা যেতে পারে আজকের বেশীরভাগ লেখকই "Skilled craftsmen." inspired artists হয়তো নন—কারণ এ যুগ হচ্চে গতির যুগ, দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী দীর্ঘ বরষ বাস নিয়ে মত্ত হবার সময় নেই।

ভারতসাহিত্যের ইতিহাসের পরিক্রমায় হিন্দীর দানের কথা অপরিহার্য। তার প্রধান কারণ যে হিন্দী রাষ্ট্রভাষা তা নয়, হিন্দী যে স্থানের ভাষা সেই মহাস্থান দশম শতাব্দী থেকেই ইসলামের ধাক্কা খেয়ে এসেছে, তারও পূর্বে এসেছে শক-হুণ-কুষাণ-ইয়েচীর দল—সেইজন্য কেউ কেউ বলেন—Hindi has been the language of the region which has borne the brunt of history. আর একটি অত্যন্ত খাঁটি কথা যে হিন্দী হচ্চে প্রতিবাদের ভাষা (language of protest)। কালিদাসের যুগে প্রাকৃতের অপভ্রংশে যারা 'হলা পিয়সহী' বলে গলা জড়িয়ে ধরতো তারাই খড়িবোলি

আবধি, মৈথিলী, ব্রজবুলি প্রভৃতির নায়কনায়িকা। এই ভাষাগুলি জনগণের মনের ও প্রাণের ভাষা, সাহিত্যিক অলংকরণ নাই বা থাকলো। দোঁহা, চৌপাই, ছপ্পয় সবই অপভ্রংশ থেকে জন্ম। প্রাচীন ও মধ্যযুগে হিন্দী সাহিত্যের ধারা বীবগাথা বা রাসো, কৃষ্ণ বা রাম আখ্যান, শৃঙ্গার-রসাত্মক প্রণয়গীতি এই সব অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে। সন্ত কবি কবীর ও তুলসীদাস এই মনেরই শ্রেষ্ঠ প্রতীক। উলটভাসীর উদ্ভব এইখানে।

পঢ় পঢ়কে সব জগ মুআ পণ্ডিত ভয়ান কোয়
একৌ আখর প্রেমকা পঢ় সো পণ্ডিত হোয়

আজকের যুগে ভাবতেন্দু হরিশ্চন্দ্র, মহাবীর প্রসাদ দ্বিবেদী, প্রেমচন্দ থেকে সুভদ্রাকুমারী চৌহান, দিনকর, নিরালা, পন্থ, জৈনেন্দ্রকুমার, নাগার্জুন প্রভৃতি সাহিত্যিকরা এই মণিদীপ জ্বালিয়ে বেখেছেন। বাংলা সাহিত্যের প্রভাবও অনেকটা আছে। "Hindi assimilated the influences of rennaisance in Bengal directly and through translations. But the regional limitations of Bengali and the numerical strength of Hindi were vital factors."

ধ্যানেশ্বর, নামদেব, একনাথ, তুকারাম, মুক্তেশ্বর, রামদাস, মুকুন্দরাজ বা মহানুভব দলের কথা ছেড়েই দিলাম। গত শতাব্দীতেও হরিনারায়ণ আপ্তে মারাঠি সাহিত্যে এক নূতন যুগের সূচনা করেন। কবি কেশবসুত, আগরকর, গোবিন্দাগ্রজ প্রভৃতি তার মধ্যে আন্দোলনের বীজ বপন করেন। রবিকিরণ মণ্ডলের লেখকগণ তাম্বে, বোরকর প্রভৃতি সাহিত্যিকরা নূতন দিক খুলে দিলেন। নাটকেও কিরোলাসকার দেবল, কোহলটকর, গাডকিরি নব নাটকের প্রবর্তন করেন। মামা ওয়ারেরকরের সঙ্গে আমাদের পরিচয় তিনি শুধু প্রখ্যাত সাহিত্যিক বলে নন, তিনি জনগণের দুঃখের বেদনার ক্লেশের লিপিকারক বলে নন, বাংলার সঙ্গে তাঁর প্রাণের আত্মীয়তা। 'অপূর্ব বাঙ্গাল' তাঁর অপরূপ দান। এর পূর্বেও বিভলকর পূর্ববাংলার দুঃখ দুর্দশার কাহিনী নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন। তাছাড়া মামা শরৎচন্দ্রের উপযুক্ত শিষ্য, নিষ্ঠাবান, সমমর্মী সমধর্মী। এই অপরাজেয় কথাশিল্পীর প্রায় সব লেখাই রূপান্তরিত হয়েছে মারাঠিতে মামার সাহায্যে। বোধ হয় আর কোন দেশে আর কোন লেখক বাংলা সাহিত্যকে নিজের মায়ের ঘরে এমন নিজস্ব করে মর্যাদা দেননি। নাট্যমন্বন্তরের গুরু মামা, দলিতপিষ্ট জনগণের দরদী

মামা, বাংলা সাহিত্যের সচিব সখা মিত্র মামাকে আমাদের প্রীতি নমস্কার অভিবাদনই জানাবো না, কবির ভাষায় বলবো—আমার এঘরে আপনার করে গৃহদীপখানি জ্বালো—

আজকের এই উদ্বোধনী ভাষণে ভারতের নব সাহিত্যের সামান্যতম পরিচয় দেওয়াও অসম্ভব, শুধু বলবো সাহিত্যের লক্ষণ হচ্ছে ধ্বন্যালোকের কথায়—অপূর্ববস্তু নির্মাণ ক্ষমা প্রজ্ঞা। সাহিত্যের জগৎ সৎও নয়, অসৎও নয় ইহা অনির্বচনীয়। সাহিত্য হচ্ছে দৈববাণী। আজ যদিও আমরা বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদে বিশ্বাসী তবু অন্তরের অনির্বাণ ক্ষুধা প্রশ্ন করবেই—ততঃ কিম। তার শুধু Pragmatic value নেই কারণ আজ জীবন হচ্ছে—Adventure of being human.

> অনেক তৃষা অনেক ক্ষুধা
> তাহারি মাঝে পেয়েছি সুধা
> উদয় গিরি প্রণাম লহ মম

আজ প্রতিটি দিনের ঘটনাপঞ্জীতে, জীবনযাত্রার নানা সমস্যায় প্রতিটি পলে চেতনার Katharsis চলেছে। মন উন্মুখ হয়ে খুঁজছে একটি পরম ঐক্যের সূত্রকে—synthesis-কে। তার শেষ মন্ত্র তাই সোহং—সেই সত্যকার নিত্যকার মানুষের নিত্যলীলাই যে চমৎকার। আজ যদি দ্বারকায় যাই শুধুই বারমাস্যা বা রাগগুর্জরী, বা ভোজপরাশরের শ্রীরঙ্গমঞ্জরীই পড়বোনা, পদলিপ্তাচার্যে তরঙ্গলোলা, প্রেমানন্দের রামায়ণই আমার মনকে দোলাবেনা, পিতাপুত্র দলৎরাম নানা লালের নানা গল্প, নারমাদ, গোবর্দ্ধন রাম ত্রিপাঠির, কানাইয়ালাল মুন্সীর, আনন্দলাল ধ্রুবের কথাও স্মরণ করবো। স্মরণ করবো উমাশংকর যোশীর বসন্তবর্ষ, সুন্দরমের যাত্রা, তেবাইয়ের বিশেষাঞ্জলি। সঙ্গে সঙ্গে শুনবো কবি ভালনের গান, নরসিংহদাস মেহতার বৈষ্ণব জনতো—সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসবে, আকাশে দুটি একটি তারা ফুটবে—দ্বারকাধীশকে প্রণাম জানিয়ে বলে আসবো—জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো। সাহিত্য literature of escape নয়। সেখানে Vital savage side of man ও যেমন দরকার তেমনি প্রয়োজন 'ভিদুথলাই, ভিদুথলাই, ভিদুথলাই'-এর সঙ্গে প্রভু 'মৈঁ গুলাম মৈঁ গুলাম মৈঁ গুলাম তেরা'। উপনিষদে দেখি দালভ্য বলেছিলেন—এই পৃথিবীতে স্থূল প্রত্যক্ষই সমস্ত রহস্যের আশ্রয়। তার উত্তরে প্রবাহন জবাব দিয়েছিলেন—তাহলে সত্য 'ত অন্তবান হলো, সীমায় এসে ঠেকে গেলো যে।

মানুষ আর তার সাহিত্যকে আজ নিতে হবে মাথা পেতে অগাধে দীক্ষা। সব কিছু ভাবনা বেদনা নিবিড় চেতনার নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে নিবদ্ধ হয়ে জেগে উঠে বলবে—ভালো লাগে, ভালবাসি। এই হলো প্রথমজা অমৃত।

এই চেতনাই আমরা হারাচ্ছি—

হঠাৎ মেয়ের কান্না শুনে উঠে
দেখতে গেলেম ছুটে
সিঁড়ির মধ্যে যেতে যেতে
প্রদীপটা তার নিভে গেছে বাতাসেতে
শুধাই তারে কি হয়েছে রাণী
সে কেঁদে কয় নীচে থেকে
হারিয়ে গেছি আমি।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

সাহিত্য শাখার সভাপতির ভাষণ

পরিচিতি :

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

১৯০০ সালে বর্ধমানের অণ্ডাল গ্রামে এঁর জন্ম। স্কুলজীবনেই ইনি প্রথম মহাযুদ্ধের চাকরী গ্রহণ করেন। যুদ্ধের পরই আবার শিক্ষা সুরু করে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এঁর প্রথম উপন্যাস 'ঝোড়ো হাওয়া'। ইনি 'কালি-কলম' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা এবং 'কল্লোলে'র সঙ্গেও এঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। এঁর পরিচালিত কয়েকটি বাংলা চলচ্চিত্র সাফল্য ও জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এঁর লেখা গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—কয়লা কুঠি, জোয়ার ভাঁটা, ছায়াছবি, পূর্ণচ্ছেদ, খরস্রোতা, মারণ যন্ত্র, মাটির ঘর, জীবন নদীর তীরে, লহ প্রণাম, শহর থেকে দূরে, অভিশাপ, হোমানল, নারীমেধ প্রভৃতি। বর্তমান যুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী। ১৯৫৯ সালে ইনি 'আনন্দ পুরস্কার' লাভ করেন।.

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

কথাসাহিত্য শাখার সভাপতির ভাষণ

আমি অসুস্থ। হাসপাতালের কেবিনে লোহার খাটে শুয়ে শুয়ে আমি এই অভিভাষণ লিখছি। আগামী ১৮ই ডিসেম্বর অস্ত্রোপচার হবে। কাজেই জানি না এখান থেকে সুস্থ হয়ে গিয়ে আপনাদের সঙ্গে বসে আমি নিজের মুখে এই লেখাটি পড়ে শোনাতে পারব কি না।

একবার ভেবেছিলাম, আপনাদের এই আমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করব না। আমার চেয়ে কোনও যোগ্যতর সাহিত্যসেবী আপনাদের কাছে তাঁর সাহিত্য সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণাব কথা শোনাবেন। কিন্তু আমার এই পরিণত বয়সে সাহিত্য-তীর্থ থেকে অযাচিতভাবে যে-আহ্বান আমার কাছে এলো, তাকে আমি আমার আরাধ্যা দেবী বীণাপাণির প্রসাদী নির্মাল্যের মত কৃতাঞ্জলিপুটে গ্রহণ করে মাথায় তুলে নিলাম। আজকাল আমাদের সারস্বতমন্দিরে পাণ্ডাপূজারীর সংখ্যা অগণিত। মন্দিরের দরজায় ঠেলাঠেলি গুঁতোগুতি বড় বেশি। আমি স্বভাব-দুর্বল মানুষ। দূরে একপাশে সরে দাঁড়িয়েছিলাম। নেপথ্য পথযাত্রী বলে উপেক্ষা না করে আমার সতীর্থ বান্ধবেরা কাছে টেনে নিলে—এই আমাব পরম সৌভাগ্য।

সাহিত্য সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলতে হবে। সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক কথা অনেকে বলেছেন, আপনারা শুনেওছেন অনেক কিছু। কাজেই তার চেয়ে ভিন্নতর কিছু আমি বলতে পারবো—সে ভরসাও আমার নেই। সে-আশাও আপনারা করবেন না।

আমি সাহিত্যিক। সাহিত্য কি বস্তু তা আপনাবা জানেন। সুতরাং যা আপনারা জানেন না—সেই কথা বলি।

জানেন না আমার অন্তরের কথা।

কেন আমি সাহিত্যিক হলাম সেকথা অবশ্য আমি নিজেই জানি না। কেমন করে হলাম সে কথাটাই বলি। সেটাও আমি অনেক বড় হয়ে আবিষ্কার করেছি।

আমি যখন খুব ছোট, তখনও আমার জ্ঞানবুদ্ধি হয়নি, তখন আমার মা গেল মরে। বাবা আবার বিয়ে করে নতুন সংসার পাতালেন। আমি রয়ে গেলাম আমার মামার বাড়ীতে। মস্ত বড়লোক মায়ের বাবা। মস্ত বড় বাড়ী। মস্ত বড় সংসার। তখনকার দিনে একান্নবর্তী বিরাট পরিবার। আত্মীয় অনাত্মীয়

দাসদাসী লোকজনের সীমা-পরিসীমা নেই। লোকে লোকে লোকারণ্য। আর সেই অরণ্যের মাঝখানে মনে হতো যেন আমি একা। সঙ্গী সাথী অনেক, তবু মনে হতো—নিঃসঙ্গ একাকী। ওদের মা আছে, বাবা আছে। আমার কেউ নেই।

সেই নিঃসঙ্গ একাকীত্ব আমার আজও ঘুচলো না। অগণিত হিতৈষী বান্ধবের মাঝখানে আমার চিন্তা নিয়ে আমি একাই রয়ে গেলাম। লেখকেরা বোধ করি সকলেই তাই। সবাই নিঃসঙ্গ, একাকী।

আমার বয়স যখন বারো কি তেরো, ইস্কুলে পড়ি, রীতিমত লিখতে পড়তে শিখেছি, সেই সময় উপরি-উপরি দুটো ঘটনা ঘটলো আমার জীবনে। ভারি মজার ঘটনা।

জনি আর টনি—দুটো কুকুরের নাম। দু'জনেরই বাচ্চা হয়েছিল। জনি ছিল খামার বাড়ীতে। আর টনি ছিল এই বড় বাড়ীতে। খামার বাড়ীতে কেমন করে না-জানি আগুন লেগে জনি একদিন পুড়ে মরে গেল। চারটে বাচ্চার ভেতর একটা বাচ্চা তার মায়ের সঙ্গে পুড়ে মরেছিল, বাকি তিনটে ছিল বেঁচে। তারা তখনও দুধ ছাড়েনি, ভাল করে চোখ ফোটেনি। কেঁদে কেঁদে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। বিকেলে একটুখানি দুধ আর একটা ন্যাকড়ার পল্‌তে নিয়ে গেলাম তাদের দুধ খাওয়াতে। গিয়ে যা দেখলাম তেমনটি দেখবো সে আশা করিনি। এ-বাড়ী থেকে প্রায় দু'গজ দূরে খামার বাড়ী। দেখলাম, এ-বাড়ী থেকে টনি গিয়ে দিব্যি নিশ্চিন্তমনে খড়ের গাদার উপর শুয়ে আছে, আর জনির তিনটে বাচ্চা তার পেটের তলায় গুঁজড়ে পরমানন্দে মাই টানছে।

হাতের বাটি আমার হাতেই ধরা রইলো। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম টনির মুখের দিকে। দু'পাটি দাঁত বের করা তার সেই কুৎসিত মুখটা তুলে টনি একবার দেখলে আমাকে। মুখটা তার আর কুৎসিত বলে মনে হলো না। মনে হলো যেন অনেক মানুষের মুখের চেয়ে ভাল। কুকুরের মায়ের কাণ্ড দেখে চোখে আমার জল এসে গেল।

তার কিছুদিন পরেই আর একটা ঘটনা ঘটলো। সেদিনও চোখে আমার জল এসেছিল। সেই একই জল—সেই একই রকম লবণাক্ত অশ্রুধারা। তবু তার জাত আলাদা।

আমাদের ইস্কুলের একজন পণ্ডিতের ছিল দুটো বৌ। দুটো বৌ এক-সঙ্গেই থাকতো। মিলে মিশে ঘরকন্নার কাজকর্ম করতো। ঝগড়া-ঝাটি হতে কোনোদিন দেখিনি। আমার মামার বাড়ীর পাশেই ছিল তাদের বাড়ী। আমি প্রায়ই যেতাম তাদের বাড়ীতে। যাবার একটা কারণ ছিল। পণ্ডিতের

ছোট বৌএর ছিল একটি ফুটফুটে ছেলে। সবে তখন তার দাঁত উঠছে। মুখে আধো-আধো কথা ফুটেছে। ছেলেটা আমাকে দেখলেই খিল্ খিল্ করে হাসতো, আর আমার কোলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। ছোট-বৌ বলতো, 'যা তো বাবা, বাবুকে বাইরে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে আয়—হাতের কাজগুলো আমি সেরে ফেলি।'

আমি নিয়ে আসতাম বাবুকে। ভারি দুরন্ত ছেলে বাবু। সবে তখন সে হামা দিতে শিখেছে। কোলে কিছুতেই থাকবে না। মাটিতে নামিয়ে দিতে হবে। খব্ খব্ করে হামা দেবে। ফিরে ফিরে তাকাবে। খিল্ খিল্ করে হাসবে। আবাব খানিকটা এগিয়ে যাবে। এই তার খেলা।

বাবু হয়ে উঠলো যে আমার খেলার সাথী!

বাবুকে সেদিন নিয়ে আসছি, সদর দোরের কাছে দেখি, পণ্ডিতের বড় বৌ তার সাত-আট বছরেব মেযে টেবিকে নিয়ে বাড়ী ঢুকছে। আমার দিকে একবার চোখ পাকিয়ে তাকিয়েই জোর করে ছেলেটাকে আমার কোল থেকে কেড়ে নিলে।—এটা পুতুল নয় বাবা, চব্বিশঘণ্টা একে নিয়ে খেলা করে না। যাও তুমি পড়াশোনা কবোগে যাও।"

টেপি কাছেই দাঁড়িযেছিল। ছেলেটাকে তার কোলে তুলে দিয়ে বললে, "যা, নিয়ে যা। কপালে গোবরের একটা ফোঁটা দিয়ে দে। রাস্তায় ডান-ডাকিনী আছে, নজর দিয়ে দেবে।"

বাবু কেঁদেছিল খুব। সেই কান্না শুনতে শুনতে আমি চলে এসেছিলাম। পেছন ফিরে তাকাইনি বাবুর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যাবার ভয়ে।

সন্ধ্যার কিছু আগেই হুলুস্থূল কাণ্ড!

বাবুকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না।

আমার কাছে খোঁজ নিতে এলো বাবুর মা। বললাম, "তোমার বড় সতীন বাবুকে কেড়ে নিয়েছে আমার কোল থেকে। কেড়ে নিয়ে টেপির কোলে দিয়েছে।"

টেপি বলছে, "ছেলেকে আমি তার মা'র কাছে নামিয়ে দিয়ে খেলা করতে গিয়েছিলাম।"

খানিক্ পরেই শোনা গেল, পাওয়া গেছে বাবুকে। ছুটে দেখতে গেলাম।

'বাবু!' বলে ডাকতে গিয়ে মুখের ডাক আমার মুখেই আটকে রইলো। পল্লীগ্রামের সেই আসন্ন সন্ধ্যায় পণ্ডিতমশাইএর ঘরের দরজায় যে দৃশ্য দেখলাম, সে দৃশ্য যেন না দেখাই ভাল ছিল।

কোথায় বাবু, কোথায় কে—কিছুই দেখতে পেলাম না। লোক জড়ো হয়েছে বিস্তর। সেই ভিড়ের একপাশে দেখলাম, বাবুর মা মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়েছে আর তার চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে বড়-বৌ। শুনলাম নাকি সে জ্ঞান হারিয়েছে।

জ্ঞান হারানো কাকে বলে জানতাম না তখন। চোখে দেখলাম।

দেখলাম না শুধু বাবুকে। শুনলাম, পণ্ডিতমশাই নিজে তাকে খুঁজে বের করেছেন। গড়ানে খিড়কি—পুকুরের জলের তলায় ছিল সে চুপটি করে শুয়ে। দু'হাত দিয়ে যখন তাকে তুলে ধরেছেন, তখন তার প্রাণ বেরিয়ে গেছে। সেই মরা ছেলে তুলে এনেছেন তিনি ঘাট থেকে।

কিন্তু দুরন্ত ছেলে হামা দিতে দিতে গিয়ে কখন্ গড়িয়ে পড়েছে ঘাটের জলে, চেঁচিয়েছে, কেঁদেছে, ছটফট করেছে—টেঁপি কিছুই জানতে পারেনি। ছেলেটাকে পাড়ের ওপর বসিয়ে দিয়ে দূরের একটা কুলগাছে ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে কুল পাড়তে গিয়েছিল। ফিরে এসে এই অবস্থা দেখে ভয়ে আঁৎকে উঠে ছুটে পালিয়েছিল। কথাটা সে গোপন করতে চেয়েছিল। কিন্তু গোপন থাকেনি শেষ পর্যন্ত।

জ্ঞান ফিরে পেলে বাবুর মা, বাবুই শুধু ফিরে পেলে না তার প্রাণ।

না পেলে তো কার কি এসে গেল। ছোট্ট এতটুকু শিশু, জন্তুর মত হামাগুড়ি দিয়ে যে ঘুরে বেড়াতো, মানুষের মত তখনও যে হাঁটতে পর্যন্ত শেখেনি, সে যদি এমনি করে অকস্মাৎ একদিন চলেই যায় তো এ পৃথিবীর কি ক্ষতি?

ক্ষতি কারও হলো না, সবাই ভুলে গেল বাবুর কথা। ভুলতে পারলাম না শুধু আমি, আর ভুলতে পারলে না বাবুর মা—ওদের ছোট বৌ।

সে-কথা বড় বেশি করে জানতে পারলাম সেইদিন যেদিন ছোট বৌ কেঁদে ফেললে আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই। তক্ষুনি সে তার মুখটাকে ফিরিয়ে নিলে।

আমার দিকে সে তাকাতে পর্যন্ত পারছে না।

ছোট বৌ তার সতীনকেও জানে না, টেঁপিকেও জানে না, জলজ্যান্ত হাসিখুশী ছেলেটাকে সে তুলে দিয়েছিল আমারই হাতে।

তারপর তাকে আর সে জ্যান্ত ফিরে পায় নি।

কী অস্বস্তি যে ভোগ করতে লাগলাম, তা জানলাম একমাত্র আমি। তার সাক্ষী কেউ রইল না।

পড়ায় মন বসে না, অস্থির হয়ে ছুটে ছুটে বেড়াই। বাবুকে যেখানে পুঁতে ফেলা হয়েছে, সেই ছেলে-পোঁতার গাবা'র ধারে গিয়ে চুপটি করে বসে

বসে একদৃষ্টে সেইদিকে তাকিয়ে থাকি। গাছের তলায় বসে বসে কাঁদি।

সেদিন অমনি একা একা গাছের তলায় বসে আছি, পেছনে পশ্চিম পাড়ার পুরোহিত দেবু ভট্‌চাজ যে এসে দাঁড়িয়েছে বুঝতে পারিনি। হঠাৎ শুনলাম সে বলছে, "এখন আর অমন করে কাঁদলে কি হবে? ছেলেটাকে পুকুরের ঘাটে বসিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেলি তো সেখান থেকে একবার ফিরেও দেখলি না? ছি!"

আমার জবাবের অপেক্ষা করেনি দেবু ভট্‌চাজ। কথাটা বলেই চলে গিয়েছিল সে।

মনে হলো, সবাই যেন এই কথাই বলতে চায়। সবাই বলতে চায় আমিই অপরাধী।

এই কথা যেন বাবুর মা'ও বলতে চেয়েছিল সেদিন। আমিই ছেলেটাকে মেরে ফেলেছি!

ছেলের মা বলতে চায়। গ্রামের প্রতিটি মানুষ বলতে চায়। বলতে পারে না শুধু আমি বড়লোকের নাতি বলে।

কিন্তু আমি তো অপরাধী নাই! আমার মনের কথা আমি বলবো কাকে? কেমন করে জুড়াবো এই মনের জ্বালা?

পরের দিন ইস্কুলে রুটিনে দেখলাম, বাড়ীতে কয়েকটা অঙ্ক কষে নিয়ে যেতে হবে। অঙ্কের খাতার সাদা একটা পাতার ওপর অঙ্কের অক্ষর লিখতে গিয়ে লিখে বসলাম—

মা—

তারপর ইনিয়ে বিনিয়ে লিখে ফেললাম সুদীর্ঘ এক চিঠি।

চিঠি লিখলাম আমার সেই মাকে—যে-মা আমার অনেক দিন আগে মরে গেছে। জানি সে চিঠি আমার মা'র কাছে গিয়ে পৌঁছোবে না, তবু লিখলাম।

লিখলাম অনেক কথা। লিখলাম বাবুর কথা, লিখলাম বাবুর মায়ের কথা। আর লিখলাম জনি-টনি কুকুরের কথা। লিখলাম—জনি-কুকুরটা মরে গেছে, কিন্তু টনি তার বাচ্চাগুলোকে মাই খাওয়াচ্ছে।

লিখে অনেকখানি শান্তি পেলাম। মনের বোঝা কিছুটা যেন হালকা হয়ে গেল।

কেমন যেন নেশার মত পেয়ে বসলো মাকে এই চিঠি লেখার কাজটা। রোজই চিঠি লিখতে লাগলাম। নির্জন ছাতে গিয়ে চুপটি করে বসে বসে পাতার পর পাতা লিখে লিখে খাতাটা প্রায় শেষ করে ফেললাম।

অনেকগুলো চিঠি আমি লিখেছিলাম।

আজকে আমার এই পরিণত বয়সে পেছনের জীবনটাকে জরিপ করতে বসে বুঝতে পারছি—এইখানেই হয়েছিল আমার সাহিত্যের হাতে খড়ি। সাহিত্যের চেহারাটাও ঠিক এমনিই। সাহিত্যও এমনি মানুষের স্থখ-দুঃখ আনন্দ বেদনার কথা 'ও কাহিনীতে ভরা।

কিন্তু এই যে আমার মাকে চিঠি লেখা, একে আমি ঠিক সাহিত্য বলতে পারি না। দুটোর চেহারা—দেখতে প্রায় একই রকম, কার্যপ্রণালীও প্রায় এক, তবু বলবো—দুটোর জাত আলাদা।

চিঠিটা আমার।

চিঠি আমার। মা আমার। দুঃখ-বেদনা আনন্দ অনুভূতি—সবই আমার। আমারই মনকে মুক্তি দিয়েছি—আর একটি মনের কাছে আমার মনের বেদনা প্রকাশ করে। কিন্তু এটা আমার নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার।

এমনি দুঃখ কষ্ট, মনের যাতনা হয়ত আপনারও আছে। হয়ত কেন? নিশ্চয়ই আছে। শুধু আপনার কেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আপামর সাধারণ সকলেরই আছে। আর, সবাই তা' প্রকাশ করতে চায়। প্রকাশ না করে যে উপায় নেই। মনের ভাব প্রকাশ করবার জন্যে সবাই চাইছে তার মনের মানুষ। কেউ প্রকাশ করছে মুখের ভাষায়, কেউ প্রকাশ করছে লেখার হরফে, কেউ বা আভাসে, কেউ-বা ঈঙ্গিতে। মনের ভাবকে চেপে রাখবে কে? হাসিতে কান্নায় ফেটে সে পড়বেই। এই-ই দুনিয়ার নিয়ম। এই জন্যই এ-পৃথিবীতে এত টানাটানি, এত কানাকানি এত হট্টগোল।

এ হলো গিয়ে একটি মানুষের মনের প্রকাশ আর একটি মানুষের কাছে। তাই বলে কি এ-সবই সাহিত্য?

না। ভাবের প্রকাশ মাত্রই সাহিত্য হয় না। এ প্রকাশ ব্যক্তিগত। এ প্রকাশ সাহিত্যের নয়। সাহিত্য ব্যক্তি-নিরপেক্ষ। আপনি আমি যা গড়ে তুলি, তা নিজের জন্য। নিজের জন্য যেমন হোক্ একটা কিছু হলেই হয়।

কিন্তু সাহিত্যে যা গড়ে তুলতে হয় তা সকলের জন্যে। সেখানে যেমন হোক্ একটা কিছু হলেই হয় না। আমি যা দেখলাম, আমি যা জানলাম, আর সকলের কাছে তার সত্যাসত্য প্রমাণ করতে হয়।

এইখানেই প্রয়োজন হয় শিল্পীর। প্রয়োজন হয় ছন্দের, প্রয়োজন হয় রমণীয় রচনার। এইখানেই গ্রহণ বর্জনের লীলা চলতে থাকে। অবান্তর আবর্জনাকে বাদ দিতে হয়, ফাঁক ভরাট করতে হয় কল্পনার সাহায্যে। ফাঁক ভরাট করতে হয়, কিন্তু ফাঁকি চলে না।

এ-সব কথা বুঝেছিলাম অবশ্য অনেকদিন পরে। বুঝেছিলাম, অন্যের হৃদয়কে যদি স্পর্শ করতে হয় তাহ'লে আমার বলবার কথাটিকে সৃষ্টি করতে হবে হৃদয় দিয়ে।

এ যেন—"হৃদি দিয়ে হৃদি অনুভব।

কাজেই হৃদয়ের মূলধনে যে যত বড় ধনী তারই কারবার সাহিত্যজগতে তত ফলাও!

আমাব হৃদয়ের সৃষ্টিকে অপরের হৃদয়ের সামগ্রী যদি করে তুলতে হয় তাহ'লে শুধু তাকে স্থন্দর ভাষায় সাজিয়ে স্বরচিত নৈপুণ্যে প্রকাশ করলেই চলবে না, হৃদয়ের সঙ্গে তার রসের সম্পর্ক পাতিয়ে দিতে হবে ।

কারণ সত্যেব সঙ্গে হৃদয়ের কোনও সম্পর্ক যদি পাকা হয তা সে রসেব সম্পর্ক।

আজ আর স্বীকার করতে বাধা নেই, এই সৃষ্টি-প্রতিভার মাপ আমার মধ্যে যত বড়, সাহিত্যবিচারে আমার রচিত সাহিত্যেব স্থানও ঠিক সেইখানে। তার চেয়ে উঁচুতেও নয়, নীচুতেও নয়।

সাহিত্য—মানবহৃদয়ের আনন্দ সৃষ্টি। বিধাতাব আনন্দের সৃষ্টি যেমন এই বিশ্বসংসার, মানুষের হৃদয় থেকে উৎসাবিত এই সাহিত্যসৃষ্টির আবেগ যেন ঠিক তার প্রতিধ্বনি।

এমনি একটা প্রাণ-পোড়ানী আবেগের জ্বালা নিয়ে সঙ্গীহীন অশান্ত মন আমার ক্রমাগত ছুটে বেড়িয়েছে সারা কৈশোরকাল এবং প্রথম যৌবনের অনেক-খানি সময়। ছুটে বেড়িয়েছে এমন একটি সঙ্কীর্ণ সংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধকার গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে--যেখানকার সমাজজীবনে বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে না ছিল কোনও প্রবহমান সংযোগ, না ছিল কোনও তৃষ্ণা! সাহিত্য ছিল অজ্ঞাত, অপরিচিত। ইস্কুলের বাংলা পাঠ্যপুস্তকই ছিল সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের যোগসূত্র।

চারিদিকে ছোটখাটো মাপের মানুষ, স্বার্থসঙ্কুল গণ্ডীবদ্ধ জীবনের পরিধি। কিছুটা উত্তরাধিকার সূত্রে মা-বাপের কাছ থেকে পাওয়া, আর বাকিটা পারি-পার্শ্বিক অবস্থার চাপে তৈরি। যেন আলাদা আলাদা ছাঁচে গড়া সবাই। মনের মাপ—কারও নিতান্ত ছোট, কারও-বা একটু বড়। সেই মাপেই পৃথিবীর দেনা-পাওনা তারা চুকিয়ে নেয়। সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও হয় তাদের সেই মনের মাপে।

নিতান্ত স্বার্থসর্বস্ব সাধারণ মানুষ—নিজের ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির ক্ষণিক সুখকেই জীবনের চরম আনন্দ ভেবে সুখে-দুঃখে জীবন-যাপন করে। সুখ-

গুলোকে ভাবে নিজে অর্জন করলে, আর দুঃখগুলোকে অদৃষ্ট ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করে নিশ্চিত হয়। চোখ দিয়ে দেখে, কান দিয়ে শোনে, বুদ্ধি দিয়ে বিচার পর্যন্ত করে কিন্তু হৃদয় দিয়ে কোনোকিছুই অনুভব করতে চায় না সহজে। নিজের ক্ষতি হলে অনুভূতির কেন্দ্রে একটুখানি স্পন্দন জাগে। নিজের ছেলে মরে গেলে কেঁদে সারা হয়, কিন্তু পরের ছেলে মরলে চোখে জল আসে না। ছোটখাটো অন্যায় অপরাধ করতে কুণ্ঠিত নয়, অবলীলাক্রমে মিথ্যা কথা বলতে পারে, ধরা পড়বার ভয় না থাকলে চুরি করতেও আটকায় না—এমনি একজন পাষণ্ডকে একদিন দেখলাম বসে বসে যাত্রা শুনছে আর হাপুস্ নয়নে কাঁদছে। যাত্রার বিষয়বস্তু ছিল ভরত উপাখ্যান। ভরতকে অযোধ্যার রাজ-সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে শ্রীরামচন্দ্র বনে চলে গেছেন। ভরতের মা ভরতকে অনুরোধ করছেন সিংহাসনে বসতে। ভরত কিছুতেই বসছেন না। বলছেন—'এ অন্যায় অনুরোধ তুমি আমাকে কোরো না মা, আমি জানি পুত্রস্নেহে অন্ধ তুমি কি প্রকারে কাকে বঞ্চিত করে আমাকে এই রাজ্যের রাজা করেছ। কিন্তু রাজ্যভার যদি আমাকে গ্রহণ করতেই হয় তো সে ভার আমি গ্রহণ করলাম শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিভূরূপে।' এই বলে শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকাদুটি সিংহাসনের ওপর রেখে ভরত ভক্তিভরে একটি প্রণাম করলেন। লোকটির কান্না যেন আরও বেড়ে গেল।

সেদিন অবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম বিষ্টু হালদারের কাণ্ড দেখে। মানুষের ন্যায়নিষ্ঠতার কোনও মূল্য যে সে দিতে পারে সে বিশ্বাস আমার ছিল না। কোনও মহৎ চরিত্রের দীপ্তি যে বিষ্টু হালদারের মত পাষণ্ডের অন্তঃকরণকে স্পর্শ করতে পারে—সেকথাও কোনোদিন ভাবতে পারিনি।

আবার আর-একদিন ঘটলো আর-একটা ঘটনা। গারাং মাঝির নাম ওখানে সবাই জানতো। লোকটা জাতে সাঁওতাল। ও তল্লাটে শুনেছি নাকি বড় বড় চুরি ডাকাতি রাহাজানি—যেখানে যা কিছু হয়েছে সবই ওই গারাংএর কীর্ত্তি। একবার কখন না-জানি সে জেল খেটেছিল মাসখানেকের জন্যে, তারপর পুলিশ নাকি প্রমাণ অভাবে তাকে একটি বারের জন্যও জেলে ঢোকাতে পারেনি। একদিন শুনলাম সেই গারাং নাকি ধরা পড়েছে। ধরা পড়েছে নির্মল-ডাক্তারের বাংলোয়। কয়লাকুঠির ডাক্তার নির্মলবাবু। নদীর ওপরে তার নির্জন বাংলো। ছুটে দেখতে গেলাম গারাং মাঝিকে।

গিয়ে দেখি, সব চুপচাপ। আমারই মত অনেকে গিয়েছিল গারাংকে দেখতে। ডাক্তারবাবুর চাকর আর তাঁর মেয়ে মিলি-দি' দেখলাম বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। সবাইকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। অর্থাৎ—কোত্থেকে কি গুজব

শুনে এসেছ তোমরা। গারাং নেই এখানে। তোমরা চলে যাও এখান থেকে।

সবাই চলে যাবার পর, মিলিদির কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কথাটা সত্যি?'

'কী কথা?'

'তুমি যা বললে! গারাং ধরা পড়েনি!'

মিলিদি বললে, 'না। গারাং এখানে আসেনি। সব মিছে কথা।'

মিছে কথা বলে মিলিদি সেদিন যে-কথাটা চাপা দিয়েছিল, দেখতে দেখতে সেটা অত্যন্ত বিশ্রী রকমের সংবাদ হয়ে লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল।

মিলিদি'র বাবা নির্মল ডাক্তার পূর্ববঙ্গের মানুষ। অনেকদিন ধরে কলিয়ারীতে ডাক্তারী করছেন। মিলিদি নাকি কলকাতায় কোন্ এক কলেজে পড়ে, ছুটিছাটা পেলেই বাপ-মার কাছে চলে আসে। অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে এই মিলিদি। একে সুন্দরী, তার ওপর কলেজে পড়ে। তখনকার দিনে আমার মামার বাড়ীর অঞ্চলে সাবা গাঁ খুঁজলে একটা ব্যাটাছেলে গ্র্যাজুয়েট পাওয়া যেতো কিনা সন্দেহ, আর মিলিদি তো মেয়েছেলে! যে-বয়েসে মেয়েদের বিয়ে হয় সে-বয়সেটা পেরিয়ে গেছে মিলিদির। স্নো-পাউডার মেখে, ঠোঁটদুটো রাঙা করে, জুতো পায়ে দিয়ে, রোজ রোজ নতুন নতুন শাড়ী-গয়না পরে মিলিদি' ঘুরে বেড়ায়। তাই নিয়ে কত লোক কত কথা বলাবলি করে। কথাগুলো অবশ্য ভাল নয়।

গুজবটা ছড়ালো ওই দিক দিয়ে। গারাং-এর নামটা জড়িয়ে দিল তার সঙ্গে। এবং কথাটা অত্যন্ত জঘন্য বলে গারাংকে তারা নাকি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। ছেড়ে দিয়ে নিজেরাই চাপা দিয়েছে ব্যাপারটাকে।

এ-সব কথা লোকে বিশ্বাস করবার জন্যে বসে থাকে। কাজেই বিশ্বাস করে বসলো সবাই। বিশ্বাস করবার আর-একটা কারণ অবশ্য ছিল।

মাসখানেক্ পরেই দেখা গেল, নির্মল ডাক্তার তাঁর এতদিনের চাকরি ছেড়ে দিয়ে চাটি-বাটি তুলে হঠাৎ একদিন কোথায় চলে গেলেন কেউ জানতেও পারলে না।

কথাটা একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম। এর প্রায় বছর দুই এক পরে হঠাৎ একদিন দেখি কিনা আমার মাতামহ সেই গারাং মাঝিকেই বাড়ীর দারোয়ানের চাকরি দিয়ে বসলেন।

সবাই হৈ হৈ করে উঠলো প্রথমে। বাড়ীর মেয়েরা চোঁচামেচি করতে লাগলো। কিন্তু বড়বাবুর কাছে কারও টুঁ শব্দটি করবার জো নেই।

কানাঘুষা শুনতে লাগলাম—কেউ কেউ বলছে—'রতনই রতন চেনে।

বড়বাবুই-বা কম কিসে ? গারাং মাঝি ডাকাতি করে গায়ের জোরে, আর বড়-বাবু ডাকাতি করে বুদ্ধির জোরে। ডাকাতি না করলে এত টাকার মালিক হতে পারে কখনও ?'

সে যাই হোক্, গারাং মাঝি রয়ে গেল বাড়ীতে। এয়া বুকের ছাতি, হাতের কব্জি দুটো লোহার মত শক্ত, টাঙ্গির মত গোঁফ, বড় বড় চোখ, মাথায় বাবরি চুল। হাতে সব সময়েই একটা খাটো লাঠি।

ভাব করে ফেললাম লোকটার সঙ্গে।

যত খারাপ ভেবেছিলাম, তত খারাপ তো নয়!

—"তুমি ডাকাতি করেছ গারাং ?"

—"হাঁ বাবু করেছি।"

—"মানুষ খুন করেছ ?"

—"হ্যাঁ, তা করেছি বই-কি!"

—"কতগুলো ?"

—"বহুৎ।"

বলেই সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একবার হেসেছিল।

—"হাসছো যে ? বল না, কতগুলো মানুষকে মেরেছ তুমি ?"

দুটি আঙুল তুলে দেখালে গারাং। বললে, "দুটি। দুটি মানুষকে জানে মেরে ফেলেছি বাবু।"

দুটি মাত্র-মানুষ মেরেছে গারাং ? বিশ্বাসযোগ্য কথা নয়। বললাম, "ধেৎ, মিছে কথা বলছো তুমি।"

গারাং বলেছিল, "মিছে কথা আমাদের বলতে নেই। আমরা সাঁওতাল।"

—"সাঁওতালদের বুঝি চুরি-ডাকাতি করতে আছে ?"

কথাটার জবাব দিতে পারেনি গারাং। জবাব চাইওনি। যে-কথাটা আমার সবচেয়ে বেশি করে জানবার আগ্রহ, এই সুযোগে সেইটাই জেনে নিয়েছিলাম। বলেছিলাম, "বেশ তবে একটা সত্যি কথাই বল্। নির্মল-ডাক্তারের বাড়ীতে শুনেছিলাম তুই ধরা পড়েছিলি। তাই না শুনে আমরা সব ছুটে গিয়েছিলাম তোকে দেখতে। কিন্তু দেখতে পাইনি। তাড়িয়ে দিয়েছিল মিলিদি।"

বলতে প্রথমে সে চায়নি। তারপর বলেছিল।

মধুপোখরার জমিদারের মেজভাইটা ছিল যেমন মাতাল তেমনি দুশ্চরিত্র। প্রায়ই সে গারাংকে বলতো নির্মল-ডাক্তারের মেয়েটাকে যদি কোনরকমে তুলে আনতে পারিস তো তোকে দু'হাজার টাকা দেবো।

সেই দু'হাজার টাকার মধ্যে নগদ দু'শ টাকা হাতে পেয়ে গারাং গিয়েছিল মিলিকে তুলে আনতে। তার আগেই গাবাং সব ব্যবস্থা ঠিক করে বেখেছিল। নির্মল ডাক্তারেব বাড়ীর চাকরটাকে দিয়েছিল পঞ্চাশটা টাকা। খিড়কির দরজাটা সে খুলে বেখেছিল। মিলি কোন্ ঘরে শোয়, কেমন করে কোন্দিক দিয়ে বাইবে থেকে তাব ঘবের খিল্ খোলা যায়—সবই সে বলে দিয়েছিল গারাংকে। সবই ঠিক। আব এক মিনিট দেরি হলে কী যে হতো বলা যায় না। মিলিকে চেপে ধবে মুখে তার কাপড় গুঁজতে যাবে, এমন সময় মিলিই দিলে সব মাটি করে। সোজা গারাংএর মুখেব দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, "বাবা! আমাকে নিয়ে গিয়ে কি করবে তুমি বাবা? তাব চেয়ে আমার গয়ানাগুলো নাও—"।

শুধু 'বাবা' বলে ডেকেছিল মেয়েটা! আর কিছু তাকে বলতে হযনি। গারাং তাকে ছেড়ে দিয়ে মিলির পায়ের কাছে মেঝের ওপব বসে পড়েছিল এত বড় অসুরের মত জোয়ানটা হযে গিয়েছিল যেন অসহায় একটা শিশু।

মিলি তাব গয়নাগুলো দিতে এসেছিল তাকে একটা ন্যাকড়ার পুঁটুলিতে বেঁধে। গাবাং সেগুলো সরিয়ে দিয়ে শুধু একবার মুখ তুলে তাকিয়েছিল। মনে-মনে ডেকেছিল মা বলে'। আব কিছু সে বলতে পারেনি।

চাকরটা বুঝি ভয়ে-ভয়ে ডেকে দিয়েছিল নির্মল-ডাক্তারকে। 'মিলি' 'মিলি' বলে ডাকতে ডাকতে ছুটে এসেছিল নির্মল-ডাক্তাব। এসেছিল নির্মল-ডাক্তাবেব স্ত্রী—মিলিব মা। মিলিব মা বলেছিল, "পুলিশ ডেকে ওকে ধরিয়ে দাও।"

নির্মল-ডাক্তাব রাগে কাঁপতে কাঁপতে পায়ের জুতো খুলে মেরেছিল গারাংএর মাথায। মিলি ছুটে গিয়ে দুহাত বাড়িয়ে গারাংকে আড়াল করে চেঁচিয়ে উঠেছিল, "ওকে মেরো না বাবা!"

স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই অবাক হয়ে গিয়েছিল মিলির কথা শুনে। তার চেয়েও স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল অত বড় দুর্ধর্ষ ডাকাত গারাংএর কাণ্ড দেখে। যার ভয়ে পুলিশ পর্যন্ত ভয়ে কাঠ, সেই গারাং কিনা জুতো খেয়ে চুপ করে রইলো? কী এমন মহামন্ত্র আছে পৃথিবীতে যার জোরে মিলি তাকে একেবারে কেঁচোটি করে দিয়েছে? মুখ তুলে তাকাতে পর্যন্ত পারছে না!

মা-বাবাকে সরিয়ে দিয়ে গারাংএর মাথায় হাত রেখে মিলি বলেছিল, "এবার তুমি যাও গারাং।"

গারাং গিয়েছিল সেখানে থেকে।

রাত্রির অন্ধকারে মুখ ঢেকে একেবারে দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

তারপর অনেকদিন পরে, দেশে যখন আবার ফিরে এলো, গারাং মাঝি

দাঁড়িয়েছিল গিয়ে নদীর সেই শুক্‌নো বালির ওপর। নির্মল-ডাক্তারের বাংলোর পাশে জোড়া সেই তাল গাছের পাতার ফাঁকে একফালি চাঁদ উঠেছিল আকাশের গায়ে। এক পা এক পা করে এগিয়ে গিয়েছিল বাংলোর দিকে। কাউকে দেখতে পায়নি গারাং। তখন অন্য ডাক্তার এসেছে সে বাংলোয়।

তার পরেও সে এখানে-ওখানে-সেখানে যতটুকু পেরেছে সন্ধান করেছে নির্মল ডাক্তারের। কোথাও তার সন্ধান পায়নি। আবার হয়ত সে চলে গেছে পূর্ব-বাংলায়। মিলির হয়ত বিয়ে হয়ে গেছে এতদিন। হয়ত সে অন্য ছেলের মা হয়েছে।

গারাংএর মুখ দিয়েই গারাংএর কাহিনী শুনেছিলাম।

আমাব কৈশোরকাল তখন আমি অতিক্রম করতে চলেছি। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, তখনও আমি মা-সারদামণির ডাকাত-বাবার গল্প পড়িনি। ভিক্‌টর হিউগোব্‌ জিন্‌-ভল্‌জিন ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত।

চোখের দৃষ্টি তখন আমার একটু একটু করে খুলছে।

এই গারাং মাঝি, যাত্রার আসরের সেই বিষ্টু হালদার,—একটি একটি করে খুঁজে খুঁজে বের করলে এমন অনেক আছে; এরাই যেন আমার চোখে আঙুল দিয়ে চোখ খুলে দিলে। দেখিয়ে দিলে, নিতান্ত স্বার্থসঙ্কুচিত সঙ্কীর্ণ একটি জীবনের মধ্যে ভাল এবং মন্দ দুইই কেমন মিলেমিশে একসঙ্গে বাস করে। মানুষের নীচতাকে দীনতাকে—মানুষের মধ্যে যাকিছু মন্দ—সব-কিছুকে একমুহূর্তে ধূলিসাৎ করে দিয়ে এই যে স্বার্থজয়ী মঙ্গলশক্তির মহা আবির্ভাব, মনে হ'তে লাগলো, মানুষের গৌরব করবার যদি কিছু থাকে তো এই। দীনতমকে শ্রেষ্ঠতমের সঙ্গে একই মর্যাদায় একই বন্ধনে বেঁধে দেবার জন্যই বিধাতা বোধকরি মনুষ্যত্বের ভাণ্ডারে ভাল ও মন্দ—এই দুটি বিরুদ্ধধর্মী বস্তুকে একই মানুষের হৃদয়ে পাশাপাশি রেখে দেবার ব্যবস্থা করেছেন।

সাধারণ মানুষের ভেতর এমন একটি মানুষ তখনও পর্যন্ত আমার নজরে পড়েনি—যে শুধু নিরবচ্ছিন্নভাবে ভাল কাজই করে যাচ্ছে। এমন-কি মন্দ কাজ যখন সে করে, নিজের মনের কাছ থেকে একটা সম্মতি আদায় করে নেয়। প্রতিটি মানুষের কাজের ওপর নিজের মনের মাপ অনুযায়ী নিজের চরিত্রটি যদিও ঠিক্‌রে ঠিক্‌রে পড়ে, তবু সে মুখে কোনদিন ছোট হতে চায় না। ছোট হতে চায় না শুধু এই জন্য যে বড়র প্রতি, ভালর প্রতি, একটা অজানা আকর্ষণ একটা গোপন ভালবাসা তার থাকেই থাকে।

ভালয়-মন্দয় মেশানো এই অসহায় মানুষগুলিকে ভালবেসেছিলাম।

ভালবেসেছিলাম গোটা মানুষকে। তাই আমার যৌবনকালের লেখায়

মানুষের মধ্যে যা বৃহৎ যা মহৎ যা কল্যাণকর, তার ওপর নিজের মনের আলো যেমন ফেলেছিলাম, তেমনি যে-সব হতভাগ্য মানুষের মনের মাপ নিতান্ত ছোট, বৃহত্তর জীবন বা মহত্তর আনন্দের পরিধি যাদের নাগালের বাইরে, তাদের একমাত্র মূলধন স্বার্থসিদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ক্ষণিক আনন্দের ওপর বিভীষিকার কালো পর্দা টেনে দিতে পারিনি।

এখন স্বীকার করতে দোষ নেই—হয়ত' অন্যায় করেছিলাম। কারণ আমিও ছিলাম তখন কাঁচা। সাহিত্যের রাজপথের ঠিকানা তখন আমারও কাছে ছিল অজানা।

সে সন্ধান এখন পেয়েছি বললে বড় বেশি অহঙ্কার করা হবে।

জীবনের সত্যানুসন্ধানের অভিসারযাত্রা আমার এখনও চলেছে। এখনও দেখছি একদিকে যেমন দেশের অধিকাংশ মানুষ দয়ামায়াহীন ধর্মাধর্মবিবর্জিত হয়ে তার দুরাশার চরমতম স্বপ্নকে সফল করবার জন্য অসত্যকে অপমানকে অনায়াসে স্বীকার করে নিচ্ছে, নিজে যা নয় তাই হবার জন্য কোনও অন্যায় করতে কুণ্ঠিত হচ্ছে না, অবলীলাক্রমে অপরের ক্ষতি করে নিজে বড় হবার চেষ্টা করছে, অন্যদিকে তেমনি তার সাহিত্যে চলেছে জীবনের জয়গান; চলেছে মানুষের নিত্যরূপ এবং শ্রেষ্ঠরূপের প্রকাশ। মানুষের আনন্দবোধ এবং সুখবোধের সীমা কেমন করে দুরাশার চরমতম স্বপ্নকে পেছনে ফেলে রেখে, ইন্দ্রিয়সম্ভোগের তৃপ্তিকে অতিক্রম করে' মানুষের সমস্ত মন, ধর্মবুদ্ধি এবং হৃদয়কে অধিকার করে তারই বিচিত্র কাহিনী। মনুষ্যত্বের আনন্দপরিধির বিপুলতায় চলেছে সাহিত্যের বিজয়োৎসব!

সাহিত্যের কল্যাণে মানুষের হৃদযরাজ্যের পরিধি ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করেছে।

সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ তার নিজের সংসারের ক্ষুদ্রতম গণ্ডীর বাইরে আর-কোনও সংসারের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার সঙ্গে যার হৃদয়ের এতটুকু যোগসূত্র কোনদিন ছিল না, সাহিত্য রচিত আর-একটি সংসারকে মনে হচ্ছে যেন তার দ্বিতীয় সংসার। শিল্পীর কল্পনার সৃষ্টি আর বিশ্ববিধাতার সৃষ্টির মধ্যে কোনও প্রভেদ-পার্থক্যই তার নজরে পড়ছে না। অপরের দুঃখে মন যার কোনদিন বিচলিত হয়নি, সাহিত্যের একটি কাল্পনিক চরিত্রের দুঃখে সে অভিভূত হয়ে পড়েছে। আনন্দে উল্লসিত হচ্ছে। প্রাত্যহিক উদ্‌ভ্রান্তি থেকে এমনি করেই হচ্ছে তার মনের মুক্তি।

মানুষের জীবন আর জীবনের রহস্য বড় অদ্ভুত। জীবনের বিচিত্র রসধারার সন্ধান করতে গিয়ে জীবন-সন্ধানী শিল্পী যখন তার গভীরতম রহস্যের

মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ায় তখন তার বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না। জীবন-দর্শনের সীমা ছাড়িয়ে তখনই বোধকরি সে জীবন-সত্যের অতলস্পর্শী গভীরতার মাঝখানে চিরজ্যোতিষ্মান এমন একটি আশ্চর্য বস্তুর সাক্ষাৎ লাভ করে—ভাষা দিয়ে যার কোনও সীমা টানা যায় না।

কী সে অনির্বচনীয় বস্তু? কে তার সন্ধান দিতে পারে?

সন্ধান দিতে পারে আমাদের এই দেশ, এই ভারতবর্ষ। পৃথিবীর অন্য কোথাও কোনও জাতি—কোনও মানুষ যে-কথা কোনোদিন বলেনি, বহু সহস্র বৎসর পূর্বে এই ভারতবর্ষের ধূলিশয্যায় নগ্নদেহে কৌপীনধারী কোন মহাতপস্বী নিজের সমস্ত ক্ষুদ্র প্রয়োজনকে অতিক্রম করে দুর্বলতম মানুষের সবলতম গৌরবের কথা—দৈববাণীর মত উচ্চারণ করে গেছে—বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণম্ তমসঃ পরস্তাৎ!—আমি সেই মহান্ পুরুষকে জেনেছি যিনি জ্যোতির্ময়, যিনি অন্ধকারের পরপারবর্তী।

পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে মানুষকে অনেক কিছু জানতে হয়। জানতে হয় কেমন করে কোত্থেকে সে খাদ্য আহরণ করবে, জানতে হয়—কেমন করে অন্ন, বস্ত্র, ঐশ্বর্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান, আয়ত্ব করে' জগতের এই জীবলোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠজীব বলে নিজের পরিচয় দেবে। কিন্তু এই সমস্ত জানাকে বহুদূর পশ্চাতে ফেলে, চিররহস্যাবৃত অন্ধকারের সে কোন পরপারে তিমিরাতীত জ্যোতির্ময় মহান পুরুষকে জানবার ব্যাকুল আগ্রহে এই ভারতবর্ষের মানুষই একদিন রাজশক্তির সুতীব্র মাদকতাকে বিসর্জন দিয়েছে, রাজসিংহাসন অবহেলায় পরিত্যাগ করে পথে এসে দাঁড়িয়েছে, তৃপ্তিহীন ভোগকে দূরে নিক্ষেপ করেছে। আবরণ-আচ্ছাদন, দম্ভ, অহঙ্কার, সব-কিছু অসার হয়ে গেছে তার কাছে।

এ আমাদের মনের বিলাস নয়। দারিদ্র গোপন করবার কৌশল নয়। জীবনকে একটা প্রগতিবিমুখ জপমালাধারী জড়পিণ্ডে পরিণত করবার ইঙ্গিত নয়। এই আমাদের মনের ধর্ম। ভারতবর্ষের মাটিতে যে-মানুষ জন্মগ্রহণ করেছে, এই তার জীবনের আদর্শ। ঈশ্বরকে অস্বীকার করে স্বর্গের প্রতি-স্পর্দ্ধী ইউরোপের মদগর্বী প্রতাপ, অপরিমিত ঐশ্বর্য, ইউরোপের সমাজ-ব্যবস্থা এবং শিল্প-সাহিত্যের অসঙ্গত অক্ষম অনুকরণ—আমাদের দৃষ্টিকে মুগ্ধ করেছে সত্য, কিন্তু অন্তঃকরণকে স্পর্শ করেনি। কারণ, ভিন্ন ধাতুতে গড়া এ-দেশ, ভিন্ন-সুরে বাঁধা আমাদের মন। প্রতাপ এবং ঐশ্বর্যের প্রতিযোগিতায় ভবিষ্যতে আমরা যদি কোনোদিন ইউরোপের সমকক্ষ হয়ে উঠি, সমাজব্যবস্থা পোষাক-পরিচ্ছদ এবং আচার-আচরণের সার্থক অনুকরণে ভবিষ্যতে যদি

কোনোদিন আমাদের আর ভারতীয় বলে চিনতে নাও পারি, তেমন দিনেও যদি হঠাৎ দেখি, ত্যাগধর্মে দীক্ষিত কোনও সাধক তার সকল চাওয়া সকল পাওয়ার ঊর্ধে কোনও উঁচু স্বরে জীবনের যন্ত্রটি বেঁধে ফেলেছেন, তখন সেই পরধর্মগ্রহণকারী ভারতীয়ের হৃদয়েও তৎক্ষণাৎ সেই সুরটি প্রতিঝঙ্কৃত হয়ে উঠবে। মাথা আপনা থেকেই হেঁট হয়ে যাবে সেখানে।

এমনি একটা বিচিত্র উপাদানে গড়া আমাদের ভারতীয় মানুষের মন।

এই মানুষের মাঝেই অন্তর্নিহিত রয়েছে সেই পরমাশ্চর্য মহাশক্তি—যা তাকে ক্রমাগত টানছে তার আবশ্যক সীমার বাইরে, যেখানে প্রাত্যহিক প্রয়োজনের দেনা-পাওনার কোনও অভাবই তার মিটবে না। সেই সমস্ত অভাব-বোধকে, পাওয়া-না-পাওয়ার হিসাব-নিকাশকে অনায়াসে অতিক্রম করে মনুষ্যত্বের সেই পরিপূর্ণতার, আত্মসমর্পণের সেই অত্যাশ্চর্য আনন্দের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য যে-ভারতবর্ষের অন্তরাত্মা চিরকাল ব্যাকুল, আমি সেই মিষ্টিক ভারতবর্ষের সেই চিররহস্যময় ভারতবর্ষের মানুষের জীবন-ধেয়ানী শিল্পী। যে পরমাশ্চর্য জ্ঞানের গৌরবে ভারতবর্ষ চিরকাল গর্বিত, যে-জ্ঞান মানুষকে তার সমস্ত ভেদ-বুদ্ধি তার সমস্ত সংকীর্ণতার, তার সমস্ত ক্ষয়-ক্ষতির দুর্ভাবনার পরপারে নিয়ে যায় তার মনের মুক্তির সে এক সীমাহীন আনন্দের মধ্যে, মানুষের মাঝে মনুষ্যত্বের সেই তেজস্বী জ্ঞানকে—সেই জ্ঞানের অমিত শক্তিকে স্পর্শ করাই হোক্ আমাদের এই ভারতবর্ষের সাহিত্যের মূলমন্ত্র।

জীবনের শেষ পর্বে এসে পৌঁছেছি—নেপথ্যপথযাত্রী এক অক্লান্ত সাহিত্যসেবী। আমার অক্ষমতা, আমার ব্যর্থতার যেমন সীমা-পরিসীমা নেই, আমার আনন্দেরও তেমনি অন্ত নেই। এ-আনন্দ শুধু এইজন্যে যে সাহিত্য-সেবার মত পুণ্যকর্মের অধিকারী হয়ে এ-জীবন আমি অতিবাহিত করতে পারলাম। ধন্য হলাম আমি আমার সমধর্মী সহকর্মীদের স্নেহ-ভালবাসা পেয়ে। আমার সময়ে যারা এসেছে আমার পরম স্নেহভাজন সাহিত্যব্রতী এবং আমার পরে যারা আসবে এই পুণ্যতীর্থে—সবার জন্য রইলো আমার হৃদয়ের যথাসর্বস্ব—আমার স্নেহ-প্রীতি-প্রেম।

আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করুন—যে আরব্ধ তপস্যা আমার অসমাপ্ত রইলো, জন্ম-জন্মান্তরের সাধনায় তা' যেন আমি সমাপ্ত করতে পারি!

জয় শ্রীরামকৃষ্ণ!

———

প্রমথ নাথ বিশী

রবীন্দ্র সাহিত্য শাখার সভাপতির ভাষণ

পরিচিতি :

প্রমথ নাথ বিশী

১৯০১ সালে রাজসাহী জেলার জোয়াড়িগ্রামে এঁর জন্ম। বাল্যকালে ইনি শান্তিনিকেতনে প্রেরিত হন এবং দীর্ঘকাল সেখানে থেকে—প্রথমে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে এবং পরে বিশ্বভারতীতে বিদ্যাভ্যাস করেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে ১৯৩১ সালে বাংলা ভাষায় এম, এ পাশ করেন। কর্মজীবনের প্রারম্ভে রিপণ কলেজে বাংলাভাষার অধ্যাপনা করেন। পরে চারবছর আনন্দ-বাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেন। ১৯৫০ সাল থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করছেন। ইনি গল্প, উপন্যাস, কবিতা, রসরচনা, সমালোচনা ইত্যাদি নানা বিষয়েই লিখে থাকেন। ১৯৫১ সালে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, 'সরোজিনী বসু পদক' লাভ করেন। 'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসের জন্য ইনি ১৯৬০ সালে রবীন্দ্রপুরস্কার ও ১৯৬১ সালে আনন্দ পুরস্কার লাভ করেন। এঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—মৌচাকে ঢিল, জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার, বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ, রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ প্রভৃতি।

১

প্রমথনাথ বিশী

রবীন্দ্রসাহিত্য শাখার সভাপতির ভাষণ

রবীন্দ্র সাহিত্যানুরাগী সুধীসমাজের এই সভায় কোন বিতর্কের উপস্থাপনা আজ করবার ইচ্ছা আমার নেই। আর তার ক্ষেত্রও এই সভা নয় কিংবা রবীন্দ্র সাহিত্য ও জীবন সম্পর্কে কোন নূতন তথ্য ও গভীর তত্ত্ব উপস্থিত করতেও চেষ্টা করব না, কারণ তেমন শক্তির অধিকারী আমি নই। ইংরেজী চলতি বৎসরের প্রথমে নিখিল-ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের বোম্বাই অধিবেশনে, কবিগুরুর জন্মের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে যে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল, নিখিল-ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের বর্তমান অধিবেশনকে তারি উপসংহার বললে বোধকরি অন্যায় হবে না। এই এক বৎসরকাল শুধু এই সাহিত্য সম্মেলন নয়, সমগ্র দেশ যে সার্বজনীন রীতিতে কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে বোধ করি তার তুলনা নেই। কোন দেশ কোন কবিকে নিয়ে এমন ব্যাপক উৎসবের আয়োজন আগে করেনি। বোধ করি এর পরেও আর এমন দৃষ্টান্ত দেখা যাবে না। এই যে একটা অভূত-পূর্ব ব্যাপার ঘটলো এর অর্থটা ভেবে দেখবার যোগ্য। উৎসব মাত্রের মধ্যেই একটা হুজুগের ভাব আছে, গতানুগতিকতার ভাব আছে, প্রতিবেশীর সঙ্গে আড়াআড়ি করে নিজেকে জাহির করবার চেষ্টা আছে। এই ব্যাপারেও তেমন থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু এটাই বর্তমান উৎসবের সাকুল্যরূপ নয়। কবিগুরুর হাত থেকে সমস্ত দেশ ষাট বৎসরের উপর যে দিব্য ঐশ্বর্য গ্রহণ করেছে সেই ঋণ শোধ করবার চেষ্টা এই উৎসবের একটি প্রেরণা বলা যেতে পারে। কিন্তু আরও কিছু আছে। সমস্ত দেশ আপনার অগোচরে একটি মহৎ ঐক্যবিধায়ক প্রতীককে যেন সন্ধান করছিল। কবিগুরুর উদার ও ঐশ ব্যক্তিত্ব যেন সেই ঐক্য বিধায়ক প্রতীক। ভারতবর্ষের ইতিহাসের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনিই আমাদের শুনিয়েছেন যে বিরোধের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ভারত-ইতিহাসের অন্তর্নিহিত প্রেরণা। তাঁর ব্যাখ্যার পরে থেকে এখন সকলেই কি ঐতিহাসিক, কি সাহিত্যিক, কি রাজনীতিক সকলেই এই প্রসঙ্গে বিরোধের মধ্যে ঐক্য বা "Unity in Diversity" সূত্রটার উল্লেখ করে থাকেন। কথাটা সমূহ সত্য। দেশের দিকে তাকালেই

দেখা যাবে ভাষায়, ধর্মে, সম্পদায়ে, স্বার্থে, আচারে ও আচরণে—আপাত বিরোধ বা অনৈক্যটাই প্রত্যক্ষ হয়ে প্রকাশ। এই পুঞ্জীভূত বিরোধের মধ্যে সমতার সন্ধান পাওয়া অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। অবশ্যই ভিতরে ভিতরে কোথাও একটা ঐক্যের বন্ধন আছে—নতুবা ঐ দেশ সংহত হয়ে বিধৃত হয়ে আছে কোন্ সূত্রে? এখন এই অন্তর্নিহিত ঐক্যটাকে মানুষ চোখে দেখতে চায়। কিন্তু তেমনি একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপ পাই কোথায়? এ দেশে ধর্মগুরু, মহাপুরুষ, বীরপুরুষ প্রভৃতি অনেকে জন্মগ্রহণ করেছেন, কিন্তু একটু ভাবলেই দেখা যাবে বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁরা কেউ সার্বজনীন অভাব মেটাতে সক্ষম নন। বাকি থাকলো এ দেশের মহাকবিগণ। বাল্মীকি, বেদব্যাস, কালিদাস, তুলসীদাস, প্রভৃতি অনেক কবি-সার্বভৌম জন্মগ্রহণ করেছেন এ দেশে। রবীন্দ্রনাথ এই মহতী ধারারই শেষতম দৃষ্টান্ত। কিন্তু এখানেও একটু ভাবলে দেখা যাবে যে, এঁদের মধ্যে সার্বজনীনতার বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা পূর্বসুরীদের ছিল না। তাঁরা চিরকালের মানুষের কথা শুনিয়েছেন, দেশকাল ইতিহাস নির্বিশেষে যে মানুষ দণ্ডায়মান সেই মানুষের জয়ধ্বনি করে গিয়েছেন তাঁরা। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠও যোগ দিয়েছে সেই জয়ধ্বনিতে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে তাছাড়া আরও একটি সুর ধ্বনিত হয়েছে পূর্বসূরী "মহাকবির কল্পনাতে ছিলনা যার ছবি"।

রবীন্দ্রনাথ চিরকালের মানুষের কথা বলবার সঙ্গেই হরিপদ কেরাণীর কথা বলেছেন যে বেচারী নিতান্তই আমাদের কালের মানুষ।

রবীন্দ্রনাথ চিরকালের সুখ দুঃখের কথা বলবার সঙ্গেই বাস্তহারা উপেনের "দুই বিঘা জমির" দুঃখের কাহিনী শুনিয়েছেন—যা নিতান্তই একালের কথা। রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের স্বর্গলোক সৃষ্টি করবার সঙ্গেই "স্বর্গ হইতে বিদায়ের" বার্তা শুনিয়েছেন—যা বিশেষ ভাবে স্বর্গভ্রষ্ট এ যুগের মানুষের মনকে স্পর্শ করে। রবীন্দ্রনাথ মহাকবি হওয়ার সঙ্গেই এ যুগের কবি, মহামানব হওয়ার সঙ্গেই এ যুগের মানব। সেইজন্যে স্বভাবতঃই এ যুগ তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভব করে। আরো কিছু আছে। এ যুগের মহাকবিদের কেবল প্রতিভা থাকাই যথেষ্ট নয়, সেই মহতী প্রতিভাকে স্বর্গ থেকে বিদায় নিয়ে নেমে আসতে হবে মর্ত্যের ধূলোমাটির মধ্যে; তাকে পায়ে পায়ে জরিপ করে চলতে হবে সংসারের সমস্ত তুচ্ছ সুখ দুঃখকে, সংসারের ছোট বড় সমস্ত সমস্যাকে স্পর্শ করতে হবে তার মনীষা দিয়ে। এ এক রকম দেশকে আত্মসাৎ করে নেওয়া। এই কাজটি যিনি করতে পারেন সমস্ত দেশ সংহত হয়ে তাঁর মধ্যে যেন কেন্দ্রীভূত হয়। এ হেন ব্যক্তিকে দেশের প্রতিনিধি বা প্রতীক স্থানীয় বললে

বোধ করি অন্যায় হয় না। এ যুগে নিজ প্রতিভা বলে রবীন্দ্রনাথ সেই প্রতীকে পরিণত হয়েছেন। ইচ্ছা করলে তাঁর মধ্যে দেশের বিশ্বরূপ দর্শন অসম্ভব নয়। শতবর্ষ-পূর্তি উৎসবের ফলে আমাদের মধ্যে যদি সেই দৃষ্টিব সামান্যমাত্র স্ফূবণও হয়ে থাকে তবে বুঝতে হবে উৎসব সার্থক হয়েছে, বুঝতে হবে উৎসবেব প্রয়োজন ছিল। সত্যই প্রয়োজন ছিল, সে প্রয়োজন এখনো ফুরোয়নি, Diversityর আন্তরিক বাহুল্যের মধ্যে Unityর দর্শন লাভ যদি সার্বজনীনভাবে সত্য না হযে ওঠে তবে সঙ্কটের চোরা পাহাড়ে লেগে রাষ্ট্র-তবণীব যে কোন মূহূর্তে বানচাল হওয়ার আশঙ্কা। এ এমন একটা সাধাবণ অভিজ্ঞতা যে বাড়িযে বলা অনাবশ্যক। ভরসার মধ্যে কবিগুরুর প্রতীকী ব্যক্তিত্ব যা ঐক্যের সূত্রে ধর্ম স্বার্থ ভাষা নির্বিশেষে লোকের মনকে গ্রথিত কবে বাখতে পারে। কিন্তু এ ভাবে রক্ষা পেতে হলে সাধনা আবশ্যক। শতবর্ষ-পূর্তি উৎসব সাধনার একটি অঙ্গ। সাধনার বৃহত্তর ও কঠিনতর অঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য চর্চা। অবশ্য তা একদিনে হওযাব নয়, আর সংক্ষেপে হওয়ার তো নয়ই। এই উৎসব তাতেও প্রেরণা জুগিযেছে মনে করলে অন্যায হবেনা।

এতক্ষণ আমরা শতবর্ষ-পূর্তি উৎসবের গুরুত্ব ও প্রয়োজন বোঝাতে চেষ্টা কবেছি, বলতে চেয়েছি যে ব্যাপাবটাকে একটা সাময়িক উত্তেজনামাত্র মনে করা উচিত হবেনা, এর মধ্যে ঐতিহাসিক একটা অভিপ্রায় আছে মনে করতে হবে,—দেশের চিত্ত অন্ধকার হাতড়ে মরছে একটা সার্বজনীন প্রতীকের সন্ধানে, ভারতব্যাপী এই উৎসবে তারই আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা। একথা যদি সত্য হয় তবে এমন গভীর ব্যঞ্জনা-পূর্ণ উৎসব এদেশে কদাচিৎ ঘটেছে। কাজেই উৎসবটিকে নিয়ে যেমন গৌরব করবো তেমনি গুরুভার দায়িত্ব বহন করবার জন্যেও প্রস্তুত হতে হবে। উৎসবটির বিরাট পরিপ্রেক্ষি মনে রাখলে সমালোচকের দায়িত্ব বেড়ে যায়। একবছর ধরে কবিগুরু সম্বন্ধে কথিত ও লিখিত আলোচনার হিমানীস্খলন দেখলে মনে এই ধারণা জন্মায় যে কবিগুরুর প্রতি আমাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা যত বেশি জ্ঞান তত বেশি নয়। অবশ্য বহু লোক যেখানে লিখছে সেখানে ঐ রচনার উচ্চ মান আশা করা ঠিক নয়। কিন্তু সেই সঙ্গে সতর্কবাক্য উচ্চারণ না করাও অন্যায় হবে। এই হিমানী-স্খলন যখন সমতল ভূমিতে নেমে এসে ব্যাপক বন্যার সৃষ্টি করবে সেই প্রলয় পয়োধিজলে রবীন্দ্র চর্চার শীর্ণ তরী যদি বানচাল হয় তবে অদৃষ্টকে দোষ দিলে চলবে না। সাহিত্য বিষয়ে সকলে এক সুরে এক ছাঁদে কথা বলায় এ সম্ভবও নয়, উচিতও নয়, কিন্তু কথা বলবার অধিকার থাকা আবশ্যক। সার্বজনীন পূজায় সর্বজনের

প্রবেশ স্বীকার করতে হয়, কিন্তু সার্বজনের অধিকার অঞ্জলি দানে, নূতন নূতন মন্ত্র প্রণয়ণে নয়। এখানে সেই রকম ব্যাপার ঘটেছে। এর আবার বিচিত্র প্রকৃতি। কোথাও বা অজ্ঞান কোথাও বা অতিজ্ঞান। কোথাও স্বদেশবাসীদের খুশী করবার উদ্দেশ্য বিশেষনের পুষ্পপুঞ্জ স্তপীকৃত হয়ে কবিগুরুর মূর্তিকে ঢেকে দিয়েছে, কোথাও বা বিদেশীদের খুশী করবার উদ্দেশ্য প্রাপ্য পুষ্পমুষ্টি থেকে কবিগুরুকে বঞ্চিত করা হয়েছে। অবিদগ্ধ বুদ্ধির আক্রমণ এ যুগের একটা মস্ত সমস্যা। তার আক্রমণ প্রতিরোধ করতে গেলে "গণতন্ত্র নিপাত গেল" রব ওঠে; তার আক্রমণ অপ্রতিহত থাকলে সভ্য সমাজের অতলে তলিয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়। রবীন্দ্র শতবর্ষ উৎসব এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ, তাছাড়া প্রশংসাপত্র সংগ্রহের মনোভাবটাও পরিত্যাগ কবতে হবে—বিশেষতঃ বিদেশীদের কাছ থেকে। কোথাও একটা উঁচু মাথা দেখলেই প্রশংসাপত্রের জন্য হাত বাড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে যে হীনতা আছে, স্বার্থবুদ্ধিরূপ রিপু খুব প্রবল না হয়ে উঠলে তা বুঝতে কষ্ট হওয়াব কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে অনুরুদ্ধ হ'য়ে কোন বিদেশী সাহিত্যিক অধ্যাপক জানিয়েছিলেন যে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি কববার হেতু তিনি খুঁজে পান না, তাব ধারণায় Ram Prasad Sen is a greater poet than Rabindranath. এ অবশ্য শোনা কথা কিন্তু সব শোনা কথাই মিথ্যা নয়। গাল বাড়িয়ে দিয়ে অজ্ঞ ব্যক্তির হাতে চড় খাওয়া কেন। বিশেষ আঘাতের সবটা যখন প্রশংসাপত্র-প্রার্থীর গায়ে লাগছে না। আবার বিদেশে গিয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতার উপযোগিতা সম্বন্ধেও সন্দেহ আছে অনেকের মনে। যে শ্রোতৃমণ্ডলীর সকলেই বাংলা ভাষায় অ, আ, ক, খ সম্বন্ধে অজ্ঞ, সাধারণভাবে বাংলা সাহিত্য তথা ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধেও উদাসীন তাদের মধ্যে গিয়ে গায়ে পড়ে রবীন্দ্রসাহিত্য প্রচার স্বাধীন স্বপ্রতিষ্ঠিত জাতির যোগ্য নয়। বিদেশে সত্যই যদি কারো মনে রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে আগ্রহ জেগে থাকে তবে আসুক সে বাংলাদেশে, বসুক সে বাঙ্গালী ছাত্রের সঙ্গে একাসনে, পড়ুক সে বর্ণ পরিচয়, তারপর যথা সময়ে পৌঁছবে বোধোদয়ে। রবীন্দ্র সাহিত্য তার পরের কথা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে যথার্থ গৌরব বোধ থাকলে এই দৃষ্টিতেই দেখতাম। কিন্তু না, তা হওয়ার উপায় নাই। কেননা, যুগের বিচিত্র নিয়মে রবীন্দ্রনাথ এখন রাজনৈতিক পাশা খেলার একটি ঘুঁটিতে পরিণত হয়েছেন। কোন্ জাত কত রবীন্দ্র সাহিত্য ভক্ত— এই রেষারেষির পথে সকলেই প্রবেশ করতেচেষ্টা করছে ভারতীয় রাজনীতির খাস দরবারে। ভারত সরকারও বড় গররাজি নন—রবীন্দ্র-সাহিত্যের ক্যাশ

সার্টিফিকেট তারা পুরা দামে ভাঙ্গাতে চেষ্টা করছেন বিশ্বের বাজারে। এর মধ্যেও দীনতা আছে—সে দীনতা সাবালক জাতের যোগ্য নয়।

এই উপলক্ষ্যে একটা কথা উঠেছে যে রবীন্দ্র-সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে হবে। কথাটা আলোচনা করা যাক। রবীন্দ্র-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অংশ গীতি-কবিতা যার তুলনা নেই বললেও চলে। কিন্তু গীতি-কবিতা তো ভাষান্তরে বহনযোগ্য নয়; ভাষান্তরে বাহিত হলে তার প্রাণ থাকে না। এহেন বস্তু ভাষান্তরে বহনের দায়িত্ব গ্রহণ করবে কে? আর ভাষান্তরে বাহিত হলেও রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রমাণ দাখিল করতে সক্ষম হবে না। ইংরাজী গীতাঞ্জলির সাহিত্যিক সাফল্যের দৃষ্টান্ত অনেকের মনে পড়বে। কিন্তু ইংবাজী গীতাঞ্জলি তো অনুবাদ নয়—নূতন স্থষ্টি। এখন আর তা সম্ভব নয়। কাজেই রবীন্দ্র-সাহিত্যের অপেক্ষাকৃত গৌণ অংশ, বিশেষ ভাবে তাঁর ছোট গল্পগুলো ভাষান্তরিত করে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু তাতেও পৌঁছে দেওয়া হবেনা রবীন্দ্রনাথের যথার্থ পরিচয়। গীতি কবিতা যাঁর প্রধান সম্পদ তাঁর পক্ষে এরকম অসুবিধ্য অপরিহার্য। অতএব দেখা যাচ্ছে যে পাশ্চাত্য জগতের কাছে তাঁর প্রধান পরিচয় হবে মনীষীরূপে, ভারতের বাণীবাহকরূপে, মানব-প্রেমিক ঋষিরূপে। সেই সঙ্গে জনশ্রুতিতে থাকবে যে তিনি একজন অসামান্য কবিও বটেন। এ মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। আরও একটা কথা। বিভিন্ন দেশে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থের অনুবাদ হচ্ছে; মুদ্রণ সংখ্যা চমকে দেয়—আমাদের পক্ষে গৌরব বোধ করা খুবই স্বাভাবিক। তবু, একটা সন্দেহের কুশাঙ্কুর মনের মধ্যে খোঁচা দেয়। কী অনুবাদ হচ্ছে? সাত নকলে আসল খাস্তা হচ্ছে না তো? জ্ঞানকৃত বিকৃতি পরিবেশিত হচ্ছে না তো? সম্যক বুঝবার উপায় নাই—অধিকাংশ ভাষাই, অধিকাংশের অজ্ঞাত। রবীন্দ্র-সাহিত্য যদি ভারতের পরিচয় বহন করে, তবে সে পরিচয় যাতে বিকৃত না হয় সে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু কে গ্রহণ করবে এ দায়িত্ব? বিশ্বভারতী, গ্রন্থের স্বত্ত্বাধিকারী, ভারত সরকার,—কে? এ বিষয়ে তাঁদের হুঁস আছে মনে হয়না। আগে অনেকবার এ সমস্যা উত্থাপন করে সাড়া পাইনি। আর হুঁস থাকলেও সাহসের আবশ্যক। কেউ-ই প্রথম ঢিলটি ছুঁড়তে চান না। আর যদি এ জাতীয় বিকার রোধ করবার ক্ষমতা আইনের হাতে না থাকে তবে অবশ্যই নিরুপায়।

কবিগুরুর শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যকে স্মরণীয় করে রাখবার উদ্দেশ্যে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে রবীন্দ্র অধ্যাপক পদ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হয়েছে। ইতিমধ্যেই কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্র অধ্যাপক পদ প্রতিষ্ঠা করে

পদাধিকারীর নাম ঘোষনা করেছেন। আপনলোককে অনাদর করবার স্বাভাবিক অধিকারের বলে পশ্চিম-বঙ্গ এখনো নিরুদ্যত। যাবতীয় রবীন্দ্র অধ্যাপক পদের মধ্যেও একটি অভিপ্রায়গত ছাঁচ বা প্যাটার্ণ থাকা আবশ্যক। সম্প্রতি অনেকে জাতীয় সংহতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছেন। আর রবীন্দ্র সাহিত্য যে বিচিত্র বিভেদের মধ্যে একটি ঐক্যবিধায়ক শক্তি এ কথা আগেই বলেছি। এখন এই রবীন্দ্র-অধ্যাপক পদগুলি যাতে এই ঐক্যবিধায়ক শক্তির বাহনরূপে জাতীয় সংহতি সাধনে সাহায্য করতে চেষ্টা করে—সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই অধ্যাপক পদগুলি প্রতিষ্ঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক। আর তা করতে হলে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র অধ্যাপক-পদগুলির মধ্যে লক্ষ্য ও অভিপ্রায়ের সংগতি সাধনের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্র সাহিত্যের একজন জাতীয় অধ্যাপক, ন্যাশনাল প্রফেসার নিযুক্ত হওয়া অত্যাবশ্যক। উক্ত অধ্যাপক পদগুলি যদি কেবল আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র না হয়, যদি ঐগুলি ঐতিহাসিক অভিপ্রায়ের ধারক বাহক হয়, তবে আমার এ প্রস্তাবটি চিন্তা করে দেখবার যোগ্য বলে মনে করি। এবারে উপসংহার। গোড়াতেই বলেছি যে রবীন্দ্র সাহিত্য সম্বন্ধে গুরুতর কোন তত্ত্বের অবতারণা করব না। আশা করি যে, সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছি। উপসংহারে সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করব এমন আশঙ্কার কারণ নাই।

সাহিত্যিক হিসাবে গৌরব করবার সাহস দিয়েছে আমাদের মনে রবীন্দ্র সাহিত্য। সাহিত্যকে নিছক শিল্প-কর্মের স্তর থেকে উচ্চতর পর্যায়ে টেনে তুলেছে রবীন্দ্র সাহিত্য; রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্তে সাহিত্যিক আজ আর শুধু শিল্পী বা বাগ্‌বণিক নয়, তার আসন আজ সাধক ও তত্ত্বজ্ঞানীর পার্শ্বে; ব্যাস-বাল্মীকি কালিদাস তুলসীদাস প্রভৃতি মহাকবির ধারা আমাদের সমকালে প্রবাহিত হ'ল রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে। তাঁর দিব্য বাণীর বৈদ্যুৎ সূত্রে গ্রথিত হ'য়ে মানুষ আরেকটু কাছে এসে পড়েছে মানুষের, বিশ্বপ্রকৃতি আর একটু কাছে এসে পড়েছে মানুষের হৃদয়ের, ভগবানের উপলব্ধি আর একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মানুষের মনে, চিরকালের জন্য তিনি বাড়িয়ে দিয়ে গিয়েছেন আমাদের দিন-রাত্রির মূল্য। ধন্য আমরা যে এ হেন মহাপুরুষের সমকালে জন্মগ্রহণ করেছি। তবু এক একবার মনে হয় মহাপুরুষের সমকালে জন্মগ্রহণ বোধ করি অবিমিশ্র সৌভাগ্য নয়। কোন এক দূর কালে, দূর দেশে ইতিহাসের কোন এক অনাগত দিগন্তে জন্ম-লাভ করলে তবেই হয়তো সম্যক অর্থোপলব্ধি ঘটতো রবীন্দ্রনাথের বিপুল ব্যক্তিত্বের ও বিপুল রবীন্দ্রসাহিত্যের।

সজনীকান্ত দাস

কাব্য শাখার সভাপতির ভাষণ

পরিচিতি :
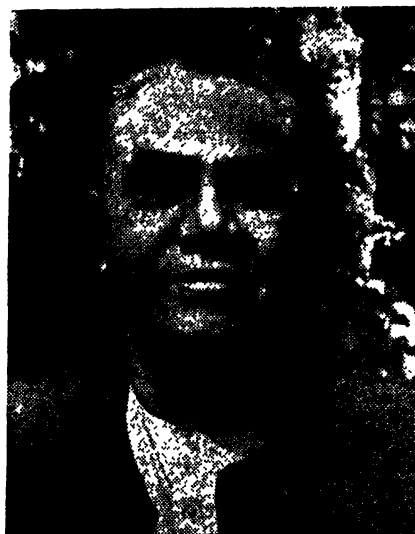
সজনীকান্ত দাস

১৯০০ সালে বর্ধমানের বেতালবন গ্রামে এঁর জন্ম। ইনি দিনাজপুর থেকে প্রবেশিকা, বাঁকুড়া থেকে আই-এস-সি এবং কলিকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি-এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইনি 'প্রবাসী' পত্রিকার সহ-সম্পাদকও অধুনালুপ্ত 'বঙ্গশ্রী' মাসিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, কেদারনাথ, শরৎচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে আধুনিকতম সাহিত্যিক পর্যন্ত প্রায় সকলের সংস্পর্শে বা সংঘর্ষে এঁকে আসতে হয়েছে। চলচ্চিত্র, বেতার, গ্রামোফোন, রাজনীতি, স্বদেশী গান—এসবের সঙ্গেও এঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ছিল। বহু সাহিত্যিক বন্ধুর প্রথম গ্রন্থ প্রকাশের গৌরবও এঁর। সমালোচনায়, কাব্য রচনায় ও ব্যঙ্গ রচনায় ইনি সিদ্ধহস্ত। এঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য অজয় (উপন্যাস), মৃত্যুদূত, রাজমোহনের স্ত্রী (অনুবাদ), আকাশবাসর (ছোট গল্প), বঙ্গ রণভূমে, মনোদর্পণ, মধু ও হুল, কালো-আঁধারি প্রভৃতি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইনি আজীবন সদস্য এবং কয়েক বছর সহ-সভাপতিও ছিলেন। 'শনিবারের চিঠি' পরিচালনা ও সম্পাদনা তাঁর জীবনের একটি প্রধান কীর্তি। ১৯৫৭ সালে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সরোজিনী স্বর্ণপদক' লাভ করেন।

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬২ তারিখে ইনি পরলোক গমন করেন। এঁর আলোকচিত্রটি ২৮শে জানুয়ারী ১৯৬২ তারিখে শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক গৃহীত।

সজনীকান্ত দাস

কাব্যসাহিত্য শাখার সভাপতির ভাষণ

১৩৪৪ বঙ্গাব্দের পয়লা ফাল্গুন অধুনা-রহিত বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত একবিংশ অধিবেশনে কাব্য-শাখার সভাপতিরূপে বাংলা কাব্যের তদানীন্তন অবস্থা ও চিরন্তন আদর্শ সম্পর্কে কিছু বলিবার ও শুনিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। সেই অধিবেশনেব মূল সভাপতি প্রমথ চৌধুরী ও সাহিত্যশাখার সভাপতি অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়দ্বয় ইতিমধ্যে ইহসংসার হইতে বিদায় লইয়াছেন। আজ প্রায শতাব্দীপাদ পবে কলিকাতার উদ্যোক্তাদের হৃদয়তায় এই নিখিল ভারত অনুষ্ঠানে সর্বপ্রথম যোগ দিতে আসিয়া সর্বাগ্রে সেই দুই সাহিত্যরথীর ভাষণ আমার স্মরণ হইতেছে। চৌধুবী মহাশয়ের মূল কথা ছিল: ''সাহিত্যরচনার মূলে আছে 'প্রেরণা'। কার প্রেরণা?—বোধ হয় লেখকের অন্তরস্থিত কোনরূপ ঐশী শক্তির।....আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, যে বস্ত অন্ধকাবে পথ দেখায়, অর্থাৎ সাহিত্য, তার আলোক সযত্নে রক্ষা করা।'' বর্তমানে বাংলাদেশে এবং বাংলার বাহিবে ভারতেব সর্বত্র যাঁহারা সাহিত্য-সম্মেলনের আয়োজন করিতেছেন তাঁহারা জাতিব জীবন-যাত্রায় একান্ত অপরিহার্য সেই আলোকশিখাকেই প্রজ্বলিত বাখিবাব প্রয়াস করিতেছেন। তাঁহারা জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন।

'কাব্য-জিজ্ঞাসা'র মীমাংসাকার গুপ্ত মহাশয় সেদিন কাব্যের বাহন ও গড়ন সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত নির্দেশ দিয়াছিলেন আজ তাহাও স্মরণ হইতেছে। তিনি বলিয়াছিলেন:

''কাব্যের লক্ষ্য রসের সৃষ্টি এবং তার উপায় ভাষার প্রয়োগ।....অখণ্ড সত্য এই যে, কাব্যের লক্ষ্য ভাষা দিয়ে রসের সৃষ্টি। ভাষানিরপেক্ষ যদি রস থাকে সে রস কাব্যের রস নয়।....কাব্যরসিকের কাব্যপাঠের আনন্দ কাব্যের বর্ণিত বিষয়ের আনন্দ নয়, কবির ভাষায় বিষয়ের বর্ণনার আনন্দ। ....কবি স্রষ্টা। 'অপার-কাব্যসংসারে কবিরেব প্রজাপতিঃ'। তবে এ প্রজাপতি সৃষ্টি করেন পঞ্চভূত দিয়ে নয়, ভাষা দিয়ে।....কাব্য বস্তুর বিবরণ নয়, বস্তুর অনুভূতির প্রকাশ। এই অমূর্ত অনুভূতির কাব্যমূর্তির দেহ হচ্ছে ভাষা; এবং মূর্তি থেকে তার দেহকে তফাত করা যায় না।....কবিকে তাঁর কবি-কর্মের

জন্যে কাজের ভাষাকে দিতে হয় নূতন রূপ। কবি-প্রতিভার কৌশল, শব্দের চয়নে রচনায় ও গ্রন্থনে ভাষায় যে সুর ও ব্যঞ্জনা আনে পুরাতন উপাদানে তাকে নূতন সৃষ্টি বললে ভুল হয় না। যা ছিল ভাষা কবি তাকে করেন বাণী। কবি-কর্মের দ্বিতীয় কৌশল, কাব্যের কথাবস্তুকে সেই নিপুণ গড়ন দেওয়া যে শিল্পরূপ হচ্ছে কাব্য-সৃষ্টির মূল কথা। কবির কাব্য-রচনার যে প্রেরণা। সে হচ্ছে কাব্যের বিষয়কে এই আকার ও রূপ দেবাব প্রেরণা। কাব্য বড় ছোট হয় তার বিষয়-বস্তুর প্রসার ও গভীরতায়, কিন্তু তার কাব্যত্ব নির্ভর করে এই গড়নের সুষ্ঠুতায়—কবির রূপদক্ষতায়। কাব্যের রস তার এই রূপের ফল। কবিকে তার জন্যে পৃথক যত্ন করতে হয না। কবি জ্বালেন দীপশিখা, আলোর ভাবনা তাঁর নেই।"

আমরা, বঙ্গভাষাভাষীরা সৌভাগ্যবান এই কারণে যে, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিকবি আমাদের কালে এবং আমাদের মধ্যেই তাঁহার ঐশী প্রেরণায় কাব্যের সহস্র দীপশিখা জ্বালাইয়া গিয়াছেন, আলোর ভাবনা আমাদেরও নাই। সেই আলো কী করিয়া দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার কাজে লাগাইব, আমাদের সমস্যা তাহাই। মহাকবির আবির্ভাবের শতাব্দীপূর্তি-বৎসরকে এই নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন বিগত বোম্বাই-অধিবেশনে শ্রদ্ধা ও সমারোহের সহিত বরণ করিয়াছিলেন, আজ বৎসরান্তে কবি-স্মরণের সেই আনন্দযজ্ঞে আহুতি দিবার জন্য কলিকাতায় কবির আবির্ভাব-ও-তিরোভাব-তীর্থে আমরা সমবেত হইয়াছি। তাঁহারই কাব্য-জীবনের অনুধ্যানে এই অনুষ্ঠান সফল ও সর্বাঙ্গ-সুন্দর হউক।

"কবিতা কি?" ("What is Poetry?") এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়াই এ. গ্রীনিং ল্যামবর্ণ শ্রেষ্ঠ কবির এই সংজ্ঞা দিয়াছেন:

"The greatest poet is he who has felt the most of all the things that move the hearts of men and felt them most deeply; and can touch the most hearts to sympathy...whose heart was made out of the hearts of all humanity and whose tongue had learned all human speech..."

অর্থাৎ, তিনিই শ্রেষ্ঠতম কবি, মনুষ্যচিত্তকে যে সকল বস্তু অভিভূত করে যিনি সে সকল বস্তু সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন এবং সে সকল বিষয়ে যাঁহার অনুভূতি গভীরতম, এবং যিনি অধিকাংশ মানুষের চিত্তে সহানুভূতির উদ্রেক করিতে পারেন......নিখিল-মানবের সম্মিলিত হৃদয় দিয়া যাঁহার হৃদয় গঠিত, এবং নিখিল-মানবের ভাষা যাঁহার জিহ্বাগ্রে।

এমন কবি সহস্রাব্দে একবার জন্মগ্রহণ করেন। অনৈতিহাসিক কালে যেমন বাল্মীকি ব্যাস হোমার এবং ঐতিহাসিক কালে কালিদাস শেক্সপীয়র, আমাদের এই অর্বাচীন কালে তেমনই রবীন্দ্রনাথ—মহাকালের দরবারে যাঁহার নিজের দাখিল করা দলিলে এই পরিচয় পাকা হইয়া আছে :

"জীবনের এই দীর্ঘ চক্রপথ প্রদক্ষিণ করতে করতে বিদায়কালে আজ (সপ্ততিতম জন্মদিনে) সেই চক্রকে সমগ্ররূপে যখন দেখতে পেলাম, তখন একটা কথা বুঝতে পেরেছি যে, একটিমাত্র পরিচয় আমার আছে সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র। আমার চিত্ত নানা কর্মের উপলক্ষ্যে ক্ষণে ক্ষণে নানা জনের গোচর হয়েছে। তাতে আমার পরিচয়ের সমগ্রতা নেই। আমি তত্ত্বজ্ঞানী শাস্ত্রজ্ঞানী গুরু বা নেতা নই....শুভ্র নিরঞ্জনের যাঁরা দূত তাঁরা পৃথিবীর পাপক্ষালন করেন, মানবকে নির্মল নিরাময় কল্যাণব্রতে প্রবর্তিত করেন, তাঁরা আমার পূজ্য ; তাঁদের আসনের কাছে আমার আসন পড়েনি। কিন্তু সেই এক শুভ্র জ্যোতি যখন বহুবিচিত্র হন, তখন তিনি নানাবর্ণের আলোকরশ্মিতে আপনাকে বিচ্ছুরিত করেন, বিশ্বকে রঞ্জিত করেন ; আমি সেই বিচিত্রের দূত। ....বিচিত্রের লীলাকে অন্তরে গ্রহণ করে তাকে বাইরে লীলায়িত করা—এই আমার কাজ। মানবকে গম্যস্থানে চালাবার দাবি রাখি নে, পথিকদের চলার সঙ্গে চলার কাজ আমার। পথের দুই ধারে যে ছায়া, যে সবুজের ঐশ্বর্য, যে ফুলপাতা, যে পাখীর গান, সেই রসের রসদে জোগান দিতেই আমরা আছি। যে-বিচিত্র বহু হয়ে খেলে বেড়ান দিকে দিকে স্বরে গানে নৃত্যে চিত্রে, বর্ণে বর্ণে রূপে রূপে, সুখ-দুঃখের আঘাতে-সংঘাতে, ভালোমন্দের দ্বন্দ্বে—তাঁর বিচিত্র রসের বাহনের কাজ আমি গ্রহণ করেছি, তাঁর রঙ্গশালার বিচিত্র রূপকগুলিকে সাজিয়ে তোলবার ভার পড়েছে আমার উপর, এই-ই আমার একমাত্র পরিচয়।"

শেলীর স্বল্পকালস্থায়ী জীবনে (১৭৯২–১৮২২) কবি-দৃষ্টির এই সমগ্রতা আসে নাই বলিয়া তাঁহার "কবিতার সওয়াল" বা "এ ডিফেন্স অব পোয়েট্রি"তে তিনি কবির ঘাড়ে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক অনেক কেজো কাজের গুরুদায়িত্ব চাপাইয়াছেন। তাঁহার প্রায় আড়াই শতাব্দীর অগ্রজ সার ফিলিপ সিডনির (১৫৫৪–১৫৮৬) মতই তিনিও কবি ও কাব্যের দায়িত্বজ্ঞানহীন সমালোচকের উক্তিতে উত্যক্ত হইয়া কবিতার মর্যাদা রক্ষায় সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ১৮২০ সনের শেষে 'অলিয়ার্স লিটারারি মিস্‌লেনি' নামক সাময়িক পত্রে টমাস লাভ পীকক "দি ফোর এজেস অব পোয়েট্রি" নামক নিবন্ধে ইংরেজী কবিতার ইতিহাসকে লৌহ (চসার), স্বর্ণ (শেক্সপীয়র), রৌপ্য (ড্রাইডেন হইতে গ্রে) এবং পিত্তল (ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও পরবর্তী) এই চারি যুগে ভাগ করিয়া প্রমাণ

করিতে চাহিয়াছিলেন যে কবিতার কাল নিঃশেষিত হইয়াছে, কবিদের প্রয়োজন ফুরাইয়াছে। শেলী সঙ্গে সঙ্গে জবাবে "এ ডিফেন্স অব পোয়েট্রি"র প্রথমাংশ লিখিয়া (জানুযারি, ১৮২১) 'অলিয়ার্স'-এর সম্পাদককে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু 'অলিয়ার্স' আর বাহির হয় নাই এবং শেলীর জবাবের শেষ দুই কিস্তিও অলিখিত রহিয়া গিয়াছে। ১৮২২ সনের ৮ই জুলাই ইতালিতে শেলীর অপঘাত-মৃত্যু হয়। এই অসম্পূর্ণ জবাবের শেষে শেলী বলেন:

"Inspite of the low-thoughted envy which would undervalue contemporary merit, our own will be a memorable age in intellectual achievements...The most unfailing herald, companion, and follower of the awakening of a great people to work a beneficial change in opinion or institution is poetry...Poets are the hierophants of an unapprehended inspiration; the mirrors of the gigantic shadows which futurity casts upon the present; the words which express what they understand not; the trumpets which sing to battle, and feel not what they inspire; the influence which is moved not, but moves. Poets are the unacknowledged legislators of the world."

অর্থাৎ সমসাময়িক প্রতিভাকে হেয় করিবার হীনমনোভাবপ্রসূত ঈর্ষা সত্বেও চিত্তপ্রকর্ষের ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্য এই যুগকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবে.... একটা মহৎ জাতি জাগরিত হইয়া যখন সমসাময়িক চিন্তাধারার অথবা কর্ম-ধারার কল্যাণকর পরিবর্তন সাধন করে, সেই জাগরণের অভ্রান্ত অগ্রদূত, সহচর ও অনুগামী অর্থাৎ সর্বাধিক সহায়ক হন কবিরা।......কবিরাই পুরোহিতস্বরূপ মন্ত্র জোগাইয়া আমাদিগকে অকল্পিত উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত করেন, তাঁহারাই সেই দর্পণ যাহার সাহায্যে আমাদের বর্তমানের উপর ভবিষ্যতের বিপুল প্রতিবিম্ব উদ্ভাসিত দেখিতে পাই, যাহা তাঁহাদের নিজেদের বোধাতীত তাঁহাদের কণ্ঠে তাহারই বাণী ধ্বনিত হয়, যুদ্ধে তাঁহাদের ভেরীনিনাদ মানুষকে কতখানি উৎসাহিত করে, তাহা তাঁহারা অনুভবও করেন না, নিজেরা অনড় থাকিয়া তাঁহারা সেই শক্তি সঞ্চার করেন যাহা মানুষকে নড়ায়। কবিরাই যে জগতের সংবিধান-কর্তা এ কথা স্বীকৃত না হইলেও সত্য।

প্রবীণ রবীন্দ্রনাথ কবি ও কাব্যের ওকালতিতে এতখানি দাবি করেন নাই, তিনি 'অনুরাগে'র দোহাই পাড়িয়াছেন:

"কবির কাজ এই অনুরাগে মানুষের চৈতন্যকে উদ্দীপ্ত করা, ঔদাসীন্য থেকে উদ্বোধিত করা। সেই কবিকেই মানুষ বড় বলে যে এমন সকল বিষয়ে

মানুষের চিত্তকে আশ্লিষ্ট করেছে যার মধ্যে নিত্যতা আছে, মহিমা আছে, মুক্তি আছে, যা ব্যাপক এবং গভীর কলা ও সাহিত্যের ভাণ্ডারে দেশে দেশে কালে কালে মানুষের অনুরাগের সম্পদ রচিত ও সঞ্চিত হয়ে উঠছে। এই বিশাল ভুবনে বিশেষ দেশের মানুষ বিশেষ কাকে ভালবেসেছে সে তার সাহিত্য দেখলেই বুঝতে পারি। এই ভালোবাসার দ্বারাই তো মানুষকে বিচার করা।"

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা তিনি বলেন যাহা আমরা রবীন্দ্রনাথকে বিচার করিতে বসিয়া নিজেদের মর্জি ও রুচি অনুযায়ী বিস্মৃত হই। কথাটি এই:

"কবির কাব্যেও সুরের অসংখ্য বৈচিত্র্য। সবই যে উদাত্তধ্বনির হওয়া চাই এমন কথা বলি নে। কিন্তু সমস্তের সঙ্গে সঙ্গেই এমন কিছু থাকা চাই, ইঙ্গিত ধ্রুবের দিকে, সেই বৈরাগ্যের দিকে যা অনুরাগকেই বীর্যবান ও বিশুদ্ধ করে।"

স্টিফেন গসন ('দি স্কুল অব অ্যাবিউজ—কন্‌টেনিং এ প্লেজেণ্ট ইনভেক্‌টিভ এগেন্‌স্ট পোয়েট্‌স্....' ১৫৭৯) যেমন ফিলিপ সিড্‌নিকে, সার রবার্ট হাওয়ার্ড যেমন জন ড্রাইডেনকে ('অ্যান এসে অব ড্র্যামাটিক পোয়েট্রি' ১৬৬৮) এবং টমাস লাভ পীকক (১৮২০) যেমন শেলীকে উত্তেজিত করিয়া যথাক্রমে কাব্য, মিল ও কবিদের স্বপক্ষে কলম ধরাইযাছিলেন, তেমনি কোনও অজ্ঞাতনামা "আধুনিক" যে রবীন্দ্রনাথকেও উত্তেজিত করিয়া থাকিবেন তাঁহার কলিকাতা টাউন হল জয়ন্তী উৎসবের "প্রতিভাষণে" তাহার পরিচয় আছে। তিনি বলিতেছেন:

"দূরকাল ও বহুজনকে যে-সম্পদ দান করার দ্বারা সাহিত্য স্থায়ীভাবে সার্থক হয়, কাগজের নৌকায় বা মাটির গামলায় তো তার বোঝাই সইবে না। আধুনিক-কাল-বিলাসীরা অবজ্ঞার সঙ্গে বলতে পারেন এ-সব কথা আধুনিক কালের বুলির সঙ্গে মিলছে না—তা যদি হয় তা হলে সেই আধুনিক কালটারই জন্যে পরিতাপ করতে হবে। আশ্বাসের কথা এই যে, সে চিরকালই আধুনিক থাকবে এত আয়ু তার নয়।

কবি যদি ক্লান্ত মনে এমন কথা মনে করে যে কবিত্বের চিরকালের বিষয়গুলি আধুনিককালে পুরোনো হয়ে গেছে তা হলে বুঝব আধুনিক কালটাই হয়েছে বৃদ্ধ ও রসহীন। চিরপরিচিত জগতে তার সহজ অনুরাগের রস পৌঁছচ্ছে না, তাই জগৎটাকে আপনার মধ্যে নিতে পারল না। যে-কল্পনা নিজের চারিদিকে আর রস পায় না, সে যে কোনো চেষ্টাকৃত রচনাকেই দীর্ঘকাল সরস রাখতে পারবে এমন আশা করা বিড়ম্বনা।"

কাব্যসাধনায় এই ধ্রুব বা "ধ্রুবতারা" রবীন্দ্রনাথকে আবাল্য পথ প্রদর্শন করিয়াছে এবং তিনি চির-পুরাতন অথচ চিরনবীন এই ধরণীর প্রকৃতি-পরিবেশ হইতে নিত্য নূতন রস আহরণ করিয়াছেন। তাই বর্তমান পৃথিবীর তিনিই একমাত্র কবি যিনি বিশ্ববাসীকে অকুণ্ঠ বিশ্বাসের সঙ্গে বলিতে পারিয়াছেন ঃ

"আমি ভালোবেসেছি এই জগৎকে, আমি প্রণাম করেছি মহৎকে, আমি কামনা করেছি মুক্তিকে, যে-মুক্তি পরমপুরুষের কাছে আত্মনিবেদনে, আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে, যিনি সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। ....আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে—এখানে সর্বদেশ সর্বজাতি ও সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা,—তাঁরই বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহংকার, আমার ভেদবুদ্ধি ক্ষালন করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি।"

জীবনের সার্থক সুন্দর পরিপূর্ণ বিকাশের মধ্যে অখণ্ড প্রত্যয়ের সঙ্গে তিনিই বলিতে পারিয়াছিলেন—

"যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।
এই জ্যোতিঃসমুদ্র মাঝে যে শতদল পদ্ম রাজে
তারই মধু পান করেছি ধন্য আমি তাই—
যাবার দিনে এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই।"

কবি ও কাব্যের এই যে মহান আদর্শ বিগত অর্ধশতাব্দীকাল আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতিগোচর ছিল এবং অনন্ত ভবিষ্যতের জন্য যে বিপুল সম্পদের উত্তরাধিকারী আমরা রহিয়া গেলাম, কাব্য-সাধনার পথে সেই জন্ম-সৌভাগ্যবান আমাদের যদি বিভ্রান্তি ঘটে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে আমরা স্বেচ্ছায় উন্মার্গ-গামী হইয়া দুর্ভাগ্যকে ডাকিয়া আনিয়াছি।

রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ, উত্তরাধিকার লাভ করিবার পূর্বেই আমরা পাইয়াছিলাম। আজ হইতে ঠিক পঞ্চান্ন বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন পঁয়তাল্লিশ, ১৩১৩ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের প্রথম সভা-পতিরূপে তিনি বিংশশতকের বাঙালী তরুণদের আহ্বান ও আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ

"এখন আমাদের কালের পীতরশ্মি চন্দ্রমা অস্তমিত হইতেছে, তোমাদের কালের তেজোদ্ভাসিত সূর্যোদয় আসন্ন—তোমরা তাহারই অরুণ-সারথি। আমরা ছিলাম দেশের সুপ্তিজালজড়িত নিশীথে; অন্যত্র হইতে প্রতিফলিত ক্ষীণ

জ্যোতিতে আমরা দীর্ঘরাত্রি অপরিস্ফুট ছায়ালোকেব মাযাবিস্তাব করিতেছিলাম। আমাদের সেই কর্মহীন কালে কত অলীক বিভ্রম এবং অকারণ আতঙ্ক দিগন্তব্যাপী অস্পষ্টতার মধ্যে প্রেতের মত সঞ্চরণ করিতেছিল। আজ তোমবা পূর্বগগনে নিজেব আলোকে দীপ্তিমান হইয়া উঠিতেছ। এখনও জলস্থল-আকাশ নিস্তব্ধ হইয়া নবজীবনের পূর্ণবিকাশের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে ; অনতিকাল পবেই গৃহে গৃহে পথে পথে কর্মকোলাহল জাগ্রত হইয়া উঠিবে। এই কর্মদিনের প্রখব দীপ্তি দেশের সমস্ত রহস্য ভেদ করিবে—ছোট বড় সমস্তই তোমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিব সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। তখন তোমাদেব কবিবিহঙ্গগণ আকাশে যে গান গাহিবে তাহাতে অবসাদের আবেশ ও সুপ্তিব জড়িমা থাকিবে না—তাহা প্রত্যক্ষ আলোকেব আনন্দে, তাহা করতললব্ধ সত্যেব উৎসাহে সহস্র জীবন হইতে সহস্র ধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে। এই জ্যোতির্ময আশাদীপ্ত প্রভাতকে সুমহৎ সুন্দর পরিণামে বহন করিয়া লইবার ভার তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিযা আমরা বিদাযের নেপথ্যপথে যাত্রা করিতে উদ্যত হইলাম। তোমাদেব উদযপথ মেঘনির্মুক্ত হউক এই আমাদের আশীর্বাদ।"

ইহা ইংরেজী ১৯০৭ সনের গোড়ার কথা, স্বদেশী আন্দোলনের প্রসন্ন প্রভাতকাল। বাংলার তরুণেরা তখন সত্যসত্যই নবসূর্যোদয়ের আলোকে দীপ্তিমান, কিন্তু সে কর্মের ক্ষেত্রে, মননের ক্ষেত্রে নয়। কাব্য-সাহিত্যের মণ্ডপে সেদিন যাঁহারা হাজার বৎসরের ঐতিহ্যের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া রবির আলোকে দীপ্তিমান হইতেছিলেন তাঁহারা আজও পর্যন্ত তাঁহাদের জীবন ব্যাপী সাধনার দ্বারা সেই ঐতিহ্যের ধাবা অব্যাহত রাখিয়া চলিয়াছেন, হঠাৎ-নতনত্ব সম্পাদন করিয়া কোনও বিস্ময় বা চমকেব সৃষ্টি করিতে পারেন নাই বটে কিন্তু বনস্পতির আওতায় এবং আজ বনস্পতির বিহনে, অরণ্যশোভা বজায় রাখিয়া চলিয়াছেন। তাঁহারা আমার প্রণম্য, কিন্তু আজ আমার আলোচনার বিষয় নহেন।

"অন্যত্র হইতে প্রতিফলিত" যে ক্ষীণ জ্যোতির কথা রবীন্দ্রনাথ সেদিন উল্লেখ করিয়াছিলেন সেই "অন্যত্রে"র অবস্থাও তখন বিঘ্ন-বিরোধ-সঙ্কুল। ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যে তখন নূতন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে টেনিসন, ব্রাউনিং, ম্যাথু আর্নল্ড প্রভৃতি বৃহৎ পাদপেরা বিদায় লইয়াছেন, বৃহতের মধ্যে যে দুই জন অবশিষ্ট—সুইনবার্ন ও কিপলিং, বৃহত্তর ইংরেজ-সমাজের আস্থা তাঁহাদের প্রতি শিথিল হইয়া আসিয়াছে ; নাতিদীর্ঘদের মধ্যে আর্নেস্ট ডাউসন ও আর্থার সাইমনস আসর

জমাইতে পারিতেছেন না, কেল্‌টিক নবজাগরণের ফলে ডব্লু, বি, ইয়েটস ও জর্জ রাসেল (এ. ই.) সবে মাথা তুলিতেছেন। মহীরুহের বিশালতা লাভ-না করা পর্যন্ত ইংলণ্ডের রসিক সমাজ কোনও কবির খাতির করিতে চান না কাজেই পুরাতনের প্রতি তাঁহারা বীতরাগ, নূতনের প্রতিও উদাসীন। এমন সময়, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে, একজন প্রখ্যাত ল্যাটিন গবেষক-পণ্ডিত এ, ই, হাউসম্যানের 'এ শ্রপশায়ার ল্যাড' কাব্য প্রকাশিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের কাব্য-রসিকেরা উৎফুল্ল হইয়া ঘোষণা করিলেন, পুরাতন বস্তাপচা মালের মধ্যে এই তো নূতনের আবির্ভাব দেখিতেছি! মুহুর্মুহু সংস্করণে 'এ শ্রপশায়ার ল্যাড' হাজারে হাজারে বিকাইতে লাগিল। হাউসম্যান ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যে, সত্যকার নূতনত্ব সঞ্চার করিলেন। তখনও অতীতের কবর খুঁড়িয়া জন ডান উইলিয়াম ব্লেক ও জেরাল্ড ম্যানলে হপকিন্সকে নূতনের পয়গম্বররূপে খাড়া করা হয় নাই। 'এ শ্রপশায়ার ল্যাডে'র সাফল্য ইংলণ্ডের তরুণ কবিসমাজকে নূতন ভাবে ও ভাষায় উদ্বুদ্ধ করিল এবং এই নবজাগরণের প্রকাশ দেখা গেল ১৯১২ সনে এডওয়ার্ড মার্শ সঙ্কলিত ও প্রকাশিত 'জর্জিয়ান পোয়েট্রি' গ্রন্থে। ই, এম, তাঁহার ভূমিকায় লিখিলেন,

"This volume is issued in the belief that English Poetry is now once again putting on a new strength and beauty."

অর্থাৎ ইংরেজী কবিতা এখন আর একবার নূতন শক্তি ও সৌন্দর্য লাভ করিতেছে এই বিশ্বাসহে এই সঙ্কলন প্রকাশ করা হইল।

এই "শক্তি ও সৌন্দর্যে" সমসাময়িক তরুণেরা যতই উল্লসিত হউক, অগ্রজ প্রবীণেরা এগুলিকে বিশেষ আমল তো দেনই নাই বরঞ্চ প্রতিকূল মনোভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের ঘূর্ণ্যাবর্ত যখন গ্রেটব্রিটেনকেও টান দিল তখন তরুণ কবিরা অনেকেই তাহাতে ঝাঁপ দিলেন। চার বৎসরব্যাপী মৃত্যু ও মহামারীর পরে ইউরোপে যখন শান্তি ফিরিয়া আসিল তখন শ্মশান-বৈরাগ্যজনিত উচ্ছৃঙ্খলতায় কাব্যসরস্বতী উন্মাদিনী হইয়া বিবস্ত্র ও বীভৎস মূর্তি ধারণ করিয়াছেন। আকস্মিক যুদ্ধের আঘাতে নবীন কবিদের মনের ভারসাম্য যে ভাবে বিচলিত হইয়াছিল, তাঁহাদের রচনায় তাহার প্রকাশ দুঃখকর বটে, কিন্তু বিস্ময়কর নয়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ১৯০৭ সনে বাংলাদেশের যে সদ্যোজাত তরুণ সম্প্রদায়ের হস্তে সেদিনের "জ্যোতির্ময় আশাদীপ্ত প্রভাতকে সুমহৎ সুন্দর পরিণামে বহন করিয়া লইবার ভার" সমর্পণ করিয়াছিলেন তাঁহারা প্রত্যক্ষ কোনও কারণে নয়, ইউরোপীয় উচ্ছৃঙ্খলতার হাওয়া মনের গায়ে লাগাইয়াই বাউরা ও বেপরোয়া

হইয়া উঠিল। ফলে "মা যাহা হইলেন" তাহাতেই আতঙ্কগ্রস্ত রবীন্দ্রনাথ বলিতে বাধ্য হইলেন,—

"যেখানে না মানাই হচ্চে সহজ পন্থা, সেখানে সেই অশক্তের সস্তা অহঙ্কার তরুণের পক্ষেই সবচেয়ে অযোগ্য। ভাষাকে মানি নে যদি বলতে পারি, তা হলে কবিতা লেখা সহজ হয়, দৈহিক সহজ উত্তেজনাকে কাব্যের মুখ্য বিষয় কবতে যদি না বাধে, তা হলে সামান্য খরচাতেই উপস্থিত মতো কাজ চালানো যায়, কিন্তু এইটেই সাহিত্যিক কাপুরুষতা।"

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী এই বিকৃতি ও ব্যভিচারের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি কাব্যের সংজ্ঞা ও বিষযবস্তুব বদল এবং ছন্দের বিলোপ-সাধন। এক মহামারী ব্যাধি, শুধু আমাদেব নয়, সমগ্র পৃথিবীর কাব্যসংসারকে আক্রমণ করিয়াছে। ইংলণ্ডে এমন সব অবাঞ্ছিত বস্তু কাব্যের মর্যাদা দাবি করিতেছে যে ইংরেজী কাব্যে আধুনিকতাব বাল্মীকি অ্যালফ্রেড এডওয়ার্ড হাউসম্যানকেই কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত (৯ই মে, ১৯৩৩) লেজলি ষ্টিফেন বক্তৃতায় ('দি নেম অ্যাণ্ড নেচার অব পোয়েট্রি', 'কবিতার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি') বলিতে হইয়াছে:

"...the legitimate meanings of the word poetry were themselves so many as to embarrass the discussion of its nature. All the more reason why we should not confound confusion worse by wresting the term to licentious use and affixing it either to dissimilar things already provided with names of their own or to new things for which new names should be invented."

অর্থাৎ কবিতা শব্দের ন্যায়সঙ্গত অর্থের সংখ্যা এমনিতেই এত বেশি যে ইহার প্রকৃতি আলোচনা করিতে বসিলে গোলে পড়িতে হয়। এই কারণেই এই শব্দের উচ্ছৃঙ্খল প্রয়োগের দ্বারা এবং যে সকল বিসদৃশ বস্তু ইতিমধ্যেই অন্য নিজস্ব নামে অভিহিত হইয়া থাকে কিংবা যে সকল নূতন বস্তুর ভিন্ন নাম আবিষ্কৃত হওয়া সঙ্গত সেই সকল বস্তুকে কবিতা আখ্যা দিয়া এই গোল-যোগকে গোলকধাঁধায় পরিণত করা আমাদের উচিত নয়।

কাব্যের ক্ষেত্রে অরাজকতার ফলে আর এক সঙ্কট উপস্থিত হইল, ইংরেজী কাব্যে আধুনিকতার বেদব্যাস, 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' এবং 'দি কক্‌টেল পার্টি'র কবি টি, এস, এলিয়টকেও যে বিষয়ে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিতে হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন (১৯৩৩):

"...we see generation after generation of untrained readers being taken in by the sham and the adulterate—indeed prefer-

ring them, for they are more easily assimilable than the genuine article."

অর্থাৎ আমরা দেখিতেছি আনাড়ি পাঠকেরা বংশপরম্পরায় জাল এবং ভেজাল কবিতার পাল্লায় শুধু পড়িতেছে না, খাঁটি মালের চাইতে সেগুলি সহজপাচ্য বলিয়া সেইগুলিই বেশি পছন্দ করিতেছে।

আজকাল যে কোনও সাময়িকপত্র, বিশেষ করিয়া একান্তভাবে কবিতার নামে উৎসর্গিত পত্রিকা খুলিলেই কবিতা শিরোনামায় প্রকাশিত বহু বিচিত্র বস্তু দৃষ্টিগোচর হয় যাহার কোনটি পাটিগণিত, কোনটি ইতিহাস, কোনটি গদ্যনিবন্ধ, আবার কোনটি বিজ্ঞাপনের খাতে প্রকাশিত হইলে সঙ্গত ও শোভন হইত। ইহার মধ্যে জাল ও ভেজালের সংখ্যাই বেশি। মিসেস ভার্জিনিয়া উলফ্ যখন সমসাময়িক কবিতার শোচনীয় অধঃপতন দৃষ্টে তাঁহার "লেটার টু এ ইয়ং পোয়েট" "একজন তরুণ কবিকে লিখিত পত্রে" তাঁহাকে ইংরেজী কাব্যসাহিত্যের ঐতিহ্য স্মরণ করাইয়া শেকস্‌পীয়র ও মিলটনের আদর্শ অনুসরণ করিতে বলিয়াছিলেন, তখন ষ্টিফেন স্পেণ্ডার রাগের মাথায় বলিয়াছিলেন বটে, আমরা আধুনিক কবিরা চিরকালের বিস্ময় হইতে চাহি না, আমাদের সকল শক্তি ও বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া নিজেদের কালের প্রতিনিধিই হইতে চাই, আমরা অতীতের নকল করিতে চাই না, বর্তমানের দখল চাই; কিন্তু আর একজন সমসাময়িক কবি পিটার কুয়েনেল না স্বীকার করিয়া পারেন নাই—

"...Most verse written in the twentieth century, whether the poet is prepared to admit it or not, represents a frenzied effort to gain time, mere 'business' till the fire begins to kindle. The burning glass may not prevail against damp twigs ; but meanwhile cocked knowingly to one side, it can be made to flash the sun in the audience's face. Look, I've started a blaze he calls exultantly. We rub our eyelids, but the pyre is still unlit."

অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীতে যে সকল পদ্য রচিত হইতেছে, কবিরা স্বীকার করুন আর নাই করুন, সেগুলি হইতেছে প্রতীক্ষাকালের কালক্ষেপের উন্মাদ প্রয়াস, যতক্ষণ আগুন না জ্বলে ততক্ষণ ফুঁ-বাতাসের প্রয়োজনীয় আয়োজন মাত্র। আতশী কাচ ভিজা কাঠকুটাকে এখনও হয়তো বাগাইতে পারিতেছে না ; কিন্তু ইতিমধ্যে জানিয়া শুনিয়া কায়দা করিয়া আতশী কাচকে একদিকে কাত করিয়া সূর্যকিরণকে দর্শকের মুখের উপর ফেলিয়া উল্লাসের সঙ্গে বলা হইতেছে, দেখ, আগুন ধরাইয়াছি। আমরা চোখের পাতা রগড়াইতেছি

বটে কিন্তু কাঁচা কাঠে এখনও আগুন ধরে নাই।

আমাদের অবস্থা আরও মারাত্মক। এখানকার অগ্নিসাধকদের হাতে দীপশলাকা নাই, আতশী কাঁচও নাই, জ্ঞানের ধার নাই, বুদ্ধির দীপ্তিও নাই। ইহারা মুখের ফুঁয়েই কাঁচা কাঠে আগুন ধরাইতে চায়। ফলে ইহাদের যত কোপ ছন্দ ও ভাষার উপর গিয়া পড়িতেছে। যে ভাষার প্রয়োগ সম্পর্কে অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় আমাদিগকে সতর্ক করিয়াছিলেন সেই ভাষার আজকাল যে হাঁড়ির হাল হইয়াছে তাহা এতই সর্বব্যাপী ও প্রকট যে দৃষ্টান্ত দেওয়া অনাবশ্যক বোধ করিতেছি।

ছন্দ সম্বন্ধে ইঁহারা 'পুনশ্চ', 'পত্রপুটে'র দোহাই পাড়েন। শাহান্‌শাহ বাদশাহের যাহা খেলা, ঘুঁটে-কুড়নীর ছেলের তাহাই যে সর্বনাশের কারণ ইহা তাহাকে বুঝাইবে কে। ছন্দের এভারেস্টশৃঙ্গে দাঁড়াইয়া নটরাজ যদি শিশু-ভোলানাথ হইয়া স্খলিত-নৃত্য জুড়িয়া দেন তাহা সাধারণ মানুষের অনুকরণীয় নহে। ছন্দ সম্বন্ধে কবিদের একান্ত সচেতন করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথই আমাদিগকে ছন্দের পাঠ দিয়া বলিয়াছেন :

"শাশ্বতকালের কথাকে প্রকাশ করবার জন্যেই তো ছন্দ।....কথাকে তার জড়ধর্ম থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যেই ছন্দ।....কথাকে বেগ দিয়ে আমাদের চিত্তের সামগ্রী করে তোলবার জন্যে ছন্দের দরকার। এই ছন্দের বাহন-যোগে কথা কেবল যে দ্রুত আমাদের চিত্তে প্রবেশ করে তা নয়, স্পন্দনে নিজের স্পন্দন যোগ করে দেয়। এই স্পন্দনের যোগে শব্দের অর্থ যে কী অপরূপতা লাভ করে তা আগে থাকতে হিসাব করে বলা যায় না। সেইজন্যে কাব্যরচনা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। তার বিষয়টা কবির মনে বাঁধা, কিন্তু কাব্যের লক্ষ্য হচ্ছে বিষয়কে অতিক্রম করা ; সেই বিষয়ের চেয়ে বেশিটুকুই হচ্ছে অনির্বচনীয়। ছন্দের গতি কথার মধ্য থেকে সেই অনির্বচনীয়কে জাগিয়ে তোলে।"

রবীন্দ্রনাথ মর্ত্য হইতে বিদায়ের অব্যবহিত পূর্বে (২১ জানুয়ারি, ১৯৪১) তাঁহার কবিতা সর্বত্রগামী হয় নাই এই স্বীকৃতির সঙ্গে বলিয়াছেন :

"যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।"

তবে সেই কবির নিকট এই নিবেদনও করিয়াছেন, তাঁহার বাণী যেন সত্য হয়, সে "শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।" কারণ অভিজ্ঞতার সত্য মূল্য না দিয়াই সাহিত্যের খ্যাতি চুরি করা ভাল নয়,

"ভালো নয় নকল সে শৌখিন মজদুরি।"

তিনি যে আশঙ্কা ও সন্দেহ লইয়া বিদায় লইয়াছেন, সে আশঙ্কা এখনও অনেকেরই মনে আছে। তবে এ কথাও আমি বিশ্বাস করি এই যুগ এখনও যুগের কবির প্রতীক্ষা করিতেছে। এ যুগের জীবনযাত্রার শতধাবিভক্ত পথে পদে পদে যে আঘাত ও বেদনা আমাদিগকে প্রতিনিয়ত সহিতে হইতেছে, তাহার অভিজ্ঞতা যেদিন উপযুক্ত প্রকাশের ভাষা খুঁজিয়া পাইবে, যাহা একান্ত ইমোশন অথবা একান্ত যুক্তিই হইবে না, সেদিনই বাংলা-কাব্যসাহিত্যে নব-অরুণোদয় হইবে। আমাদের যুগের যে সকল তরুণ ফাঁকির পথে না গিয়া সাধনার কুটিল-দুর্গম পথে বিচরণ কবিতে করিতে রক্তাক্তচরণে একটা নূতন কিছু সম্ভাবনার প্রতীক্ষা করিতেছেন, তাঁহারা এই ব্যাকুলতার কথা বুঝিবেন। নকলকে, ফাঁকিকে লোকে স্বভাবতই অনুকরণ করিতে চায়। কঠিন এবং দরূহকে এড়াইতে গিয়া বাংলা-দেশের তরুণসম্প্রদায় কাব্যের নামে এই যে নিশ্চিত মৃত্যুর উপাসনা করিতেছেন এবং একটা ভ্রান্ত সহজিয়া কাল্ট খাড়া করিয়া সেই তন্ত্রে সকলকেই দীক্ষিত করিতে চাহিতেছেন, তাহাতেই আশঙ্কান্বিত হইয়া সাবধানবাণী উচ্চারণ করিতেছি। তাঁহারা যেন মনে রাখেন, এই অভিশপ্ত যুগের অক্ষম কবিসম্প্রদায়ের আমিও একজন।

এ যুগে যাহারা যুগের ভাষার নূতন ছন্দে সৃজিছে মোহ
প্রণাম তাদের সকলেরে করি, যাহাদের সুর মর্মে পশে।
সাম্‌নে রয়েছে শুষ্ক নীরস অঙ্ক জ্যামিতি বীজগণিতও,
ইতিহাস আর ধনবিজ্ঞান খোঁচা খোঁচা হয়ে রয়েছে জেগে—
অন্নবস্ত্র প্রয়োজন হেতু তাহারা সবাই সত্য জানি;
সত্য হলেও সবখানি নয়; চোখের আড়ালে আরো কি আছে!
অজানা আরোর খবর বন্ধু, কবিদের কাছে কামনা করি—
ছন্দ ও ভাষা থাক নাই থাক, মনে যেন মোহ সৃজন করে।

যুগ-মানবের অবসর কোথা, বিষ-জর্জর হায় মানব,
নীলকণ্ঠের জটার গঙ্গা ভুলেছে কি কভু কলধ্বনি?
হিসাবের খাতা বাগাইয়া ধরি হিসাবের ভুল হতেছে তবু—
চাঁদের আলোকে দীর্ঘ নিশাস ফেলিছে নিরেট বৈজ্ঞানিকও।
নূতনের মাঝে পুরাতন ভুল দেখিয়া ভরসা হয় আজিও;
ল্যাবরেটরির সন্ধান শেষ, শেষকথা তবু গোপন থাকে।
কাব্যের মোহে বাঁধা পড়ে আজো অব্যক্তের সেই তো লীলা,
বিজ্ঞান যেথা হার মেনে যায়, কাব্যের গতি অবাধ সেথা॥

মন্মথ রায়

নাট্যসাহিত্য শাখার সভাপতির ভাষণ

পরিচিতি

মন্মথ রায়

১৮৯৯ সালে ময়মনসিংহ জেলায় এঁর জন্ম। ১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এ ও বি, এল পাশ করেন। প্রথম জীবনে ইনি বালুরঘাটে ওকালতি করেন। এঁর রচিত 'মুক্তির ডাক', 'সেমিরেমিস', 'চাঁদ সদাগর', 'দেবাসুর', 'মহুয়া', 'কারাগমার', 'খনা', 'মীরকাশিম' প্রভৃতি বহু পূর্ণাংগ নাটক বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। এঁর 'Court Dancer' ভারতে নির্মিত প্রথম সবাক ইংরাজী চলচ্চিত্র—মেট্রোতে প্রদর্শিত প্রথম ভারতীয় ছবি। তাঁর বহু রেকর্ড নাট্যও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার প্রযোজক পদে নিযুক্ত থেকে বহু তথ্যচিত্র পরিচালনা করেন।

মন্মথ রায়

নাট্যসাহিত্য শাখার সভাপতির ভাষণ

নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সাঁইত্রিশতম বার্ষিক অধিবেশনে আজ সর্বপ্রথম নাট্যশাখার পত্তন হল। সেই শাখার সভাপতিত্বের সম্মান দিয়েছেন আপনারা আমাকে। আজ শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কথা বড় বেশি মনে হচ্ছে। এক বছর আগে এই নাট্যশাখার পত্তন হলে সভাপতিত্বের জন্য বাংলা নাটক ও নাট্যশালার মুখপাত্র রূপে যোগ্যতর লোক পেতেন আপনারা। এই বৎসরেই গত ৫ই মার্চ তাঁকে আমরা হারিয়েছি। আমি জানি সভাপতিত্বের এই সম্মান আমার ব্যক্তিগত সম্মান নয়—এ সম্মান গত দেড়শতাব্দী ধরে যাঁরা বাংলার অনন্য এক নাট্যঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছেন—তাঁদেরই সাধনা ও সিদ্ধির স্বীকৃতির স্বাক্ষর। বাংলার নাট্যকার ও নাট্যশিল্পীদের পক্ষ থেকে এজন্য আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী বৎসরে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে নিখিলভারত বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের কলকাতার এই অধিবেশন বঙ্গবাণীর বরপুত্রের উদ্দেশ্যে সাহিত্য সেবকদের শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপেই গণ্য হবে। কিন্তু এই সম্মেলনে সর্বপ্রথম প্রবর্তিত নাট্যশাখার অধিবেশনও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ২৮শে ডিসেম্বর প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত নব্য বাঙ্গালীর প্রথম নাট্যশালা হিন্দু থিয়েটারের দ্বারোদঘাটন হয় এই জোড়াসাঁকোর ঠাকুববাড়িতেই। বাংলার নাট্যশালার ইতিহাসে এটি যেমন স্মরণীয় তেমনি স্মরণীয়—পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য মঞ্চরীতি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত জোড়াসাঁকো নাট্যশালা—যে নাট্যশালায় রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম অভিনেতারূপে আত্মপ্রকাশ করেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'এমন কর্ম আর করব না' প্রহসনে 'অলীকবাবু'র ভূমিকায়। এই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতেই 'বিদ্বজ্জন সমাগম সভা'র অধিবেশনে, ১৮৮১খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে স্বরচিত বাল্মীকি প্রতিভার প্রথম অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকির ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, এবং সরস্বতীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন তাঁরই ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা দেবী। রবীন্দ্রনাথের নিজ পরিকল্পনা অনুযায়ী মৌলিক শিল্পচেতনায় রূপায়িত নাট্যাভিনয়ের সূত্রপাত জোড়াসাঁকোর এই পুণ্য পীঠস্থানেই।

আজ এখানে, ভারতের সর্বরাজ্যের বঙ্গবাণীর প্রতিনিধিগণ উপস্থিত। প্রায় প্রত্যেক উৎসবে তাঁরা বাংলা নাটকের অভিনয় অনুষ্ঠান করেন। বহুকালের

এই প্রথাতেই, বঙ্গসংস্কৃতি ভিন্ন রাজ্যে সমাদৃত হওয়ার একটি চিত্তাকর্ষক পথ পেয়েছে। এই পথেই মাতৃভূমির সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ আরো সুদৃঢ় হয়েছে। শুধু তাই নয়, এতেই অনুবাদের মাধ্যমে বহু বাঙ্গালী নাট্যকার বিশেষ করে গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিভিন্ন রাজ্যে পরিচিত ও সমাদৃত হয়েছেন। শরৎচন্দ্রের বহু উপন্যাসের নাট্যরূপও এমনি করে সর্বভারতে জনপ্রিয় হয়েছে। রবীন্দ্রজন্ম শতবার্ষিকী বৎসরে রবীন্দ্রনাট্যসৃষ্টিও সর্বভারতে অভিনন্দিত হল। ভিন্ন রাজ্যবাসী বঙ্গবাণীর সেবকগণের এই পরম কৃত্য প্রীতি শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদের সঙ্গে স্মরণ করি।

গত ৪ঠা ডিসেম্বর বর্ধমান গঙ্গাটিকুরীতে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের রজত জয়ন্তী অধিবেশনে সর্বপ্রথম প্রবর্তিত নাট্যশাখার সভাপতির ভাষণে আমি বাংলা নাটক ও নাট্যশালার একটি সংক্ষিপ্ত সামগ্রিক চিত্র দিতে চেষ্টা করেছি। কারণ, অতীতের বিবর্তনই বর্তমান এবং বর্তমানের বিবর্তনই ভবিষ্যৎ। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনেও এবার সর্বপ্রথম প্রবর্তিত নাট্যশাখার অধিবেশনে সেই নাট্য-পরিক্রমা অপ্রাসঙ্গিক হবে না আশা করি।

আমাদের নাটক ও নাট্যশালার আদি কথা প্রসঙ্গে সংস্কৃত নাটকের ইতিহাস স্মরণীয়। ভাস, অশ্বঘোষ, কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতির গৌরবোজ্জ্বল নাট্যাবদানেই গ'ড়ে উঠেছিল একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সংস্কৃত নাটকের স্বর্ণযুগ। ডাঃ কীথের মতে সংস্কৃত নাটকেই সংস্কৃত কাব্য ও সাহিত্যের পরম প্রকাশ স্বাক্ষরিত হয়েছিল। কিন্তু এই নাট্যচর্চা সীমাবদ্ধ ছিল রাজপুরীর নাট্যশালায় —দেশ ও জাতির মুক্ত অঙ্গনে নয়। বর্ণশ্রেষ্ঠ সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণের রচিত উচ্চ-কাব্য-রসাশ্রিত সংস্কৃত নাটক অভিজাত রাজকুলের এবং রাজানুগৃহীত ব্যক্তিদেরই সাংস্কৃতিক বিলাস ছিল।

এথেন্স বা রোমের মুক্তাঙ্গন রঙ্গশালায় যে সব নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা ছিল, জনসাধারণও ছিল তার রসজ্ঞ দর্শক। এদেশে সেরূপ ব্যবস্থা না থাকায় সংস্কৃত নাটক দেশের বৃহত্তম জনসমাজকে আনন্দ পরিবেশন করে নি কখনও—জাতীয় নাট্যশালাও গড়ে ওঠে নি তৎকালে এদেশে।

রাজানুগ্রহপুষ্ট সংস্কৃত নাটক হিন্দুরাজত্ব অবসানে অবলুপ্তির পথে গেল। ভারতে প্রতিষ্ঠিত হল মুসলমান শাসন। মুসলমান শাসনকালে নাট্যকলা ও অভিনয়প্রথা রাজানুগ্রহ বা পৃষ্ঠপোষকতা থেকে হল বঞ্চিত। কিন্তু মানুষের শাশ্বত রসপিপাসা তাতে নিরস্ত থাকল না। রাজ-উপেক্ষিতা নাট্যকলা প্রজা-বন্দিতা হয়ে আত্মপ্রকাশ করল বাংলাদেশের মুক্ত অঙ্গনের যাত্রাগানে। শিবের ছড়া, মঙ্গলচণ্ডীর গান, মনসার ভাসান, কৃষ্ণযাত্রা, রাসযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা,

চপকীর্তন, কৃষ্ণকীর্তন, গম্ভীরা বা গাজন গান প্রভৃতি লোকনাট্যের সংস্পর্শে প্রভাবিত যাত্রাগান নাট্যরূপে রূপান্তরিত হয়ে ওঠে এবং দেশে বৃটিশ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই যাত্রাগানই বাঙালীর জাতীয় নাট্যোৎসবে পরিণত হয়।

ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশে ইংরেজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রবর্তন হল। কয়েকটি ইংরেজী থিয়েটার স্থাপিত হল কলকাতায়। আজ থেকে একশ' ছেষট্টি বৎসর পূর্বে ১৭৯৫ সালের ২৭শে নভেম্বর 'Bengaly Theatre'ও স্থাপিত হল কলকাতায়। যিনি প্রথম এই বাংলা নাট্যশালা স্থাপন করলেন, বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে চির-স্মরণীয় হয়ে থাকবেন সেই হেরাসিম লেবেডেফ—একজন ভারতীয়-সংস্কৃতি মুগ্ধ রাশিয়ান। তিনি তাঁর ভাষাশিক্ষক গোলকনাথ দাসকে দিয়ে Disguise নামে একটি ইংরেজী প্রহসন বাংলায় অনুবাদ করিয়ে বাঙালী অভিনেতা-অভিনেত্রী দিয়ে ওই প্রহসনটিকে অভিনীত করান ওই 'Bengaly Theatre'-এ ১৭৯৫ সালের ওই ২৭শে নভেম্বর। এই নাটকটিই সর্বপ্রথম অভিনীত বাংলা নাটক।

এর পর ধীরে ধীরে শিক্ষিত ধনী বাঙালীদেরও অনেকে বাংলা নাট্যশালা স্থাপন করতে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। এইরূপ প্রচেষ্টায় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'হিন্দু থিয়েটার'ই বাঙালী প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যশালা। এই সব নাট্যশালায় বাংলা নাটকের অভিনয় ক্রমশঃ জনপ্রিয় হতে লাগল। সে যুগের নাট্যকারদের মধ্যে হরচন্দ্র ঘোষ, রামনারায়ণ তর্করত্ন এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের নাম স্মরণীয়। কিন্তু এঁরা মূলতঃ ছিলেন অনুবাদক-নাট্যকার। মৌলিক নাটক রচনার দক্ষতা নিয়ে এসে দাঁড়ালেন মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্র। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-দীক্ষা সত্ত্বেও তাঁদের নাটকে সংস্কৃত নাটকের প্রভাব ছিল যথেষ্ট। এই সময়ে বেশ কিছুকাল ধরে নাট্যরচনায় ও প্রযোজনায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দুই নাট্যরীতির প্রভাবই পরিলক্ষিত হতে লাগল। অবশেষে প্রতীচ্য রীতিরই হল জয়। সাহিত্যজগৎ তখন বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাচ্ছটায় উদ্ভাসিত। ভাবপ্রকাশে ভাষা তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য লাভ করল। সংলাপ রচনা আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠে মনকে দোলা দেবার ক্ষমতা পেল। পাশ্চাত্ত্য নাট্যরীতিতে নতুন করে জীবন্ত হয়ে উঠল নাট্যাভিনয়ের পৌরাণিক কাহিনী এবং সামাজিক চিত্র। বাংলা নাটকের সূচনা থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাঙালীর নাট্যচর্চা অনেকটা প্রভাবান্বিত হয়েছিল এলিজাবেথিয়ান স্টেজ ও সেক্সপীয়রের নাট্যাদর্শে। কিন্তু এতে লজ্জার কিছু নেই। প্রকৃত আর্টের কোন জাতি নেই। ভৌগোলিক

সংজ্ঞা দ্বারা তা সীমিতও নয় কোনদিন। বাংলা-নাট্য-সাহিত্য ও নাট্যশালার ক্রমবিকাশ বর্ণনা করার দীর্ঘ সময়ের স্বাধীনতা আমার নেই। কিন্তু রেঁনেশাঁ গর্বে নবজাগ্রত এই নাট্যশক্তি যে নাট্যদিকপালদের পরিচালনায় ধর্মজীবনে, সমাজ সংস্কারে ও রাজনৈতিক চেতনায় দেশ ও জাতিকে ভাবাপ্লুত ও উদ্বুদ্ধ করেছিল তাঁদের অনুল্লেখ অমার্জনীয় হবে।

রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুল সর্বস্ব', উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ, সরোজিনী', মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী', 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী', 'জামাই বারিক', 'নীলদর্পণ', গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বিল্বমঙ্গল', 'জনা', 'পাণ্ডবগৌরব', 'প্রফুল্ল', 'বলিদান', 'সিরাজদ্দৌল্লা' অমৃতলাল বসুর 'বিবাহ বিভ্রাট', 'কৃপণের ধন' 'খাস দখল', মনোমোহন রায়ের 'রিজিয়া', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'মেবার পতন', 'সীতা', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'প্রতাপসিংহ', দুর্গাদাস', 'নূরজাহান', 'সাজাহান', মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাজীরাও', ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ক্ষত্রবীব' বরদা-প্রসন্ন দাশগুপ্তের 'মিশরকুমারী'. নিশিকান্ত বসুর 'বঙ্গে বর্গী', 'দেবলাদেবী', ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'আলিবাবা' 'প্রত্যাপাদিত্য', 'রঘুবীর', প্রভৃতি নাটক বাংলার নাট্য-ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে।

আনন্দদানের সঙ্গে সঙ্গে জাতিকে ধর্মানুশীলনে, সমাজ সংস্কারে এবং দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করবার যাদুমন্ত্র ছিল এই সব অবিস্মরণীয় নাটকে। কিন্তু বাংলা নাটকের এই গৌরবময় ঐতিহ্য সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল রবীন্দ্র-নাটকে। বাংলা নাট্য-সাহিত্যের মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন থেকেও রবীন্দ্র-নাট্যপ্রবাহ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে এক অতুলনীয় ভাব-জগতের সন্ধান দেয়। এই ভাব-জগতের ভিত্তি ছিল রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র জীবন দর্শন, সৌষ্ঠব ছিল তাঁর অপরূপ কাব্যা-শ্রয়ী অপূর্ব ভাষাদ্যুতি এবং প্রাণশক্তি ছিল তাঁর উদার উদাত্ত মানবতাবোধ। রবীন্দ্রনাট্যের প্রসাদেই বাংলা নাটক বিশ্বনাট্য-সাহিত্য-গৌরবের দাবিদার হতে পেরেছে। তাঁর গীতিনাট্য, যথা: 'বাল্মীকি প্রতিভা' ও 'মায়ার খেলা' কাব্যনাট্য যথা : 'রাজা ও রাণী', 'বিসর্জন', 'মালিনী', নাট্যকাব্য, যথা: 'বিদায়-অভিশাপ', 'গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ', প্রহসন, যথা : 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'চিরকুমার সভা', 'শেষরক্ষা', সাংকেতিক অথবা তত্ত্বনাটক, যথা : 'শারদোৎসব', 'রাজা' 'অচলায়তন', 'ডাকঘর', 'ফাল্গুনী', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী', সামাজিক নাটক যথা : 'শোধ বোধ', 'বাঁশরী', নৃত্যনাট্য যথা : 'নটীর পূজা', 'তাসের দেশ', 'চিত্রাঙ্গদা', 'চণ্ডালিকা', 'শ্যামা', যে কোন দেশের নাট্যসাহিত্যের গৌরবরূপে অভিনন্দনযোগ্য। এ দেশের প্রচলিত নাট্যরীতি

যথাযথ অনুসরণ না করে যে স্বভাব-সঙ্গত নাট্যরীতির প্রবর্তন তিনি করে গেছেন তা পূর্বপ্রচলিত যাত্রাগানের নাট্যরীতিকেই বরং মর্যাদা দান করেছে।

রবীন্দ্র-প্রতিভার কল্যাণে অনন্য এক নাট্যধারার প্রবর্তন হল বটে কিন্তু তার ভাবাদর্শ উচ্চগ্রামে গ্রথিত থাকায় এবং ব্যাপক প্রচেষ্টার অভাবে তা শিক্ষিত ব্যক্তিদেরই চিত্তানন্দ হয়ে রইল ; জনসাধারণের সাংস্কৃতিক আনন্দের পরিবেশক হয়ে থাকল সাধারণ নাট্যশালাগুলিই। নটগুরু গিরিশচন্দ্রের সৃষ্ট সুদৃঢ় নাট্য-ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল যে পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক নাটকের স্বর্ণযুগ, তা ম্লান হবার মুখে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ অবসান কালে আবির্ভাব হল নবদৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন নাট্যকলা বিশারদ এক নতুন নট সম্প্রদায়ের যার নায়ক ও নাট্যাচার্য ছিলেন নটকুলশিরোমণি শিশিরকুমার ভাদুড়ী, মধ্যমণি ছিলেন নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী এবং অন্যান্য জ্যোতিষ্ক ছিলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী, যোগেশ চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, নরেশ মিত্র, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী তারাসুন্দরী, শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী, শ্রীমতী প্রভা, শ্রীমতী কঙ্কা, শ্রীমতী চারুশীলা, শ্রীমতী নীহারবালা, শ্রীমতী সরযূবালা প্রমুখ নটনটীগণ। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে স্টার থিয়েটারে অপরেশচন্দ্রের 'কর্ণার্জুন' ও ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে নাট্যমন্দিরে যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'সীতা' নাটকাভিনয়ে শুরু হল এঁদের নবনাট্য অভিযান। ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, মহেন্দ্র গুপ্ত, শ্রীমতী শান্তি গুপ্তা এই নবনাট্য গোষ্ঠির পরবর্তী জ্যোতির্মণ্ডল। নবাগত ও ক্রমাগত কুশীলবগণের উচ্চাঙ্গের অভিনয়ে স্মরণীয় হল, পরবর্তী কালে যে সব নাটক, তাদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখ্য রবীন্দ্রনাথের 'গৃহপ্রবেশ', 'চিরকুমারসভা', শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'ষোড়শী', 'রমা', মন্মথ রায়ের 'চাঁদসদাগর', 'কারাগার', 'অশোক', 'সাবিত্রী' 'খনা' 'মীরকাশিম', শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'গৈরিক পতাকা', 'সিরাজদ্দৌল্লা' 'ঝড়ের রাতে' 'স্বামী-স্ত্রী', 'তটিনীর বিচার', 'ধাত্রীপান্না', রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের 'মানময়ী গার্লস স্কুল', জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'রীতিমত নাটক', 'পি ডাবলিউ ডি', যোগেশ চৌধুরীর 'দিগ্বিজয়ী', রমেশ গোস্বামীর 'কেদার রায়', মহাতাপচন্দ্র ঘোষের 'আত্মদর্শন', ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলমগীর', মহেন্দ্র গুপ্তের 'উত্তরা', 'পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিং', টিপু সুলতান', 'মহারাজ নন্দকুমার' বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'মাটির ঘর', 'বিশ বছর আগে' তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুই পুরুষ', শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বন্ধু', মনোজ বসুর 'প্লাবন', 'নূতন প্রভাত', অয়স্কান্ত বক্সীর 'ভোলা মাস্টার', প্রবোধকুমার মজুমদারের 'শুভযাত্রা', ভূপেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শঙ্খধ্বনি'। এই যুগেই মধু বোস পরিচালিত এবং

সাধনা বোস তারকায়িত ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্স (C. A. P.) আর একটি নবীন অভ্যুদয়। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলিবাবা', মন্মথ রায়ের 'বিদ্যুৎপর্ণা', 'রাজনটী', 'রূপকথা' প্রভৃতি ছিল এঁদের জন অভিনন্দিত নাট্যাবদান। প্রমথনাথ বিশীর হাস্যরসাত্মক নাটকগুলিও সাহিত্যের অপর এক দ্যুতি। ১৯২৩ থেকে ১৯৪৩ আধুনিক যুগের বিশিষ্ট এই কুড়ি বৎসর অন্তে ১৯৪৪ সনে বিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে শুরু হল অতি আধুনিক যুগ অথবা সাম্প্রতিক যুগ—যে যুগে শুরু হল আবার এক নবনাট্য আন্দোলন।

বাংলার বর্তমান নবনাট্য আন্দোলন জাতির সামনে আজ বহু প্রশ্নের অবতারণা করেছে। যে যুগে এ আন্দোলন শুরু হয়েছে তাকে যুদ্ধোত্তর স্বাধীনতা যুগ বলা চলে। দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধ কালে ১৯৪২ সালে তখন দেশে চলছে 'আগষ্ট বিপ্লব'। ১৯৪৩ সালে এল যুদ্ধবাজ সরকারের স্বার্থান্ধ চক্রান্তে মনুষ্যসৃষ্ট মহামন্বন্তর। ১৯৪৭ এল দেশবিভাগ মূল্যে স্বাধীনতা। মহামন্বন্তরে মহামারীতে হতভাগ্য পঞ্চাশ লক্ষ নরনারী অনাহারে অনশনে প্রাণ দিল। সরকারী কন্‌ট্র্যাক্টর, দালাল, মুনাফাবাজ কালোবাজারীরা রক্তশোষক রাক্ষসে পরিণত হল। যুদ্ধবাজ মিলিটারীর জৈব লালসা লেলিহান হয়ে উঠল। যুদ্ধ, মন্বন্তর এবং দেশবিভাগজনিত উদ্বাস্তু সমস্যায় জাতির জীবনেও এল এক মহা বিপ্লব। অর্থনৈতিক বনিয়াদ ধ্বসে পড়ল। সরকারী প্রচেষ্টায় শিল্পসম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনও জোরদার হয়ে দাঁড়াল। জমিদারী প্রথার বিলুপ্তি হল বটে, কিন্তু ভূমিহীন কৃষকের সমস্যা সঙ্গে সঙ্গে দূর হল না। ভূমিজীবী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অর্থ-নৈতিক বনিয়াদও ভেঙে গেল। একান্নবর্তী প্রথায় ফাটল ধরল। অর্থনৈতিক সংকটের দরুণ মধ্যবিত্ত পরিবারের তরুণীরাও অফিসের চাকরি গ্রহণে বাধ্য হতে লাগল। স্ত্রী-পুরুষের সহ-শিক্ষা, এক অফিসে চাকরি, ট্রামে বাসে এক সঙ্গে যাতায়াত, এক সঙ্গে সাংস্কৃতিক আনন্দ উৎসব প্রভৃতি কারণে মধ্যবিত্ত সমাজ-জীবনেও এল একটা নতুন পরিবর্তন। বিধবা-বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, স্বেচ্ছা-বিবাহ প্রভৃতির আইন ক্রমে ক্রমে অধিকতর ফলপ্রসূ হতে লাগল। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সমস্যা এবং সর্বোপরি বেকার সমস্যা তীব্র হয়ে উঠল। ব্যক্তি সমস্যা ক্রমশঃ শ্রেণী সমস্যায় পরিণত হতে লাগল। অসন্তোষ বিক্ষোভ এবং শ্রেণীস্বার্থ সংঘাতে বাংলা অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। রাষ্ট্রবিপ্লবের মতই এই সামাজিক বিপ্লব সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল।

নাটক ও নাট্যশালাকে জাতির এবং সমাজের দর্পণ বলা হয়। বাংলার নাটক এবং নাট্যশালা এই সংজ্ঞাকে চিরকালই সার্থক করেছে। এই যুগ-

সন্ধিক্ষণে, ১৯৪৪ সালে, নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নামক নাটক —সমাজ বাস্তবতা ও মননশীলতার এক নব জীবনদর্শন। ফ্যাসি-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সাংস্কৃতিক শাখা-উদ্ভূত ভারতীয় গণ-নাট্য সঙ্ঘ (I.P.T.A.) সমাজ সচেতন 'নবান্ন' নাটকের অপূর্ব অভিনয় করে বাংলার নাট্যজগতে এক বিদ্যুৎ চমক সৃষ্টি করেন। খ্যাতি ছিল না, পরিচিতি ছিল না, অর্থসম্পদ ছিল না, ছিল শুধু নিষ্ঠার সম্পদ, প্রাণের ঐশ্বর্য এই শিল্পীগোষ্ঠীর। ছেঁড়া চট দিয়ে গড়া পট প্রাঙ্গণে গড়ে উঠল নবনাট্যের এক নতুন আদর্শ—বিজন ভট্টাচার্যের রচনায়, শম্ভু মিত্র ও বিজন ভট্টাচার্যের যুগ্ম পরিচালনায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং সুধী প্রধান প্রমুখ শিল্পী সহকর্মীদের সহযোগিতায়। নতুন এক সৃষ্টি, নতুন এক ভাবাদর্শ নিয়ে বাংলায় শুরু হয়ে গেল নবনাট্য আন্দোলন। পেশাদার নাট্যশালার বাইরে অপেশাদার নাট্যসঙ্ঘ ও যে জনচিত্ত জয়কারী অভিনয়ে সমর্থ —এটা নতুন করে আবার প্রমাণিত হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপেশাদার নাট্য-গোষ্ঠী গঠনের জোয়ার এসে গেল দেশে। যুগসত্যকে রূপায়িত ক'রে যুগ-মানস প্রতিফলিত করে নাট্যকাররা লিখতে লাগলেন যুগোপযোগী নাটক। নাটক ও তার প্রযোজনা নিয়ে শুরু হয়ে গেল নানা পরীক্ষা ও নিরীক্ষা। আর এতেই আমরা ক্রমে ক্রমে পেতে লাগলাম বহু মননশীল নাট্যকার, প্রতিভাধর পরিচালক, রূপদক্ষ কুশীলব, ঐন্দ্রজালিক মঞ্চশিল্পী, সর্বোপরি প্রগতিশীল প্রয়োগ—কুশল নাট্যসংস্থা। 'বহুরূপী' 'লিটল্ থিয়েটার গ্রুপ' 'শৌভনিক' 'থিয়েটার সেণ্টার', 'ক্যালকাটা থিয়েটার' আজ জাতির চিত্তজয়ী স্বনামধন্য নাট্য প্রতিষ্ঠান। অভ্যুদয়, অনুশীলন সম্প্রদায়, নাট্যচক্র, অশনিচক্র, অচলায়তন, লোকমঞ্চ, রূপকার, শিল্পীমন, নবনাট্যম, বঙ্গীয় নাট্যসংসদ, গন্ধর্ব, রঙ-বেরঙ, শ্রীমঞ্চ, শিল্পীমহল, বৈশাখী, সাজঘর, সানডে ক্লাব, লোক-সংস্কৃতি-সংঘ, কথাকলি, দশরূপক, চতুর্মুখ, ছদ্মবেশী, কুশীলব, পঞ্চমিত্রম্ প্রভৃতিও আজ জনপ্রিয় সুপরিচিত নাট্যসংস্থা। শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্র, শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, চারুপ্রকাশ ঘোষ প্রমুখ নাট্যশিল্পীদের আশ্চর্য অভিনয়ে এই যুগ সমুজ্জ্বল।

এই যুগধর্মী নবনাট্য আন্দোলনে যে সকল নাট্যকার বরণীয় তাঁদের মধ্যে অন্তত: কয়েকজনের নাট্যকর্মের বিশেষত্ব আলোচনা না করে তৃপ্ত হতে পারছি না। দেশের অবহেলিত জনগণ, যাঁদের চরিত্র এতদিন পর্যন্ত অধিকাংশ নাটকে দৃশ্যান্তর বিরতির ফাঁক-পূরণে সাহায্য করত, তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থতাকে মূর্ত করে তুললেন বিজন ভট্টাচার্য তাঁর 'নবান্ন' নাটকে; ছিন্নমূল উদ্বাস্তু নিম্নবিত্তের জীবনকে মঞ্চে নিয়ে এলেন 'গোত্রান্তর' নাটকে। এই দিক দিয়ে ঋত্বিক ঘটকের 'দলিল'ও শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অর্থনৈতিক ও

সামাজিক বিশৃঙ্খলার পটভূমিকায় জীবন-কল্যাণকে তুলে ধরলেন তুলসী লাহিড়ী তাঁর 'পথিক' নাটকে ; কৃত্রিম সাম্প্রদায়িক আবরণের আড়ালে মানুষের যে সত্যরূপটি রয়েছে তাকে মঞ্চে উপস্থিত করলেন 'ছেঁড়াতার' নাটকের মাধ্যমে। অর্থনৈতিক চাপে নিপীড়িত দুঃখীজনের মর্যাদা বোধকে তিনি মূর্ত করে তুললেন 'দুঃখীর ইমান' নাটকে। সাম্প্রদায়িক সংঘাতের বিভিন্ন দিক মূর্ত হয়ে উঠল 'রাজকন্যার ঝাঁপি' খ্যাত ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'দিনান্তের আগুনে।' অন্তরের আবেগ দিয়ে সমাজ বাস্তবকে মঞ্চের উপর প্রতিফলিত করলেন দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাস্তভিটা,' 'মোকাবিলা', 'তরঙ্গ' 'মশাল', 'গোলটেবিল' 'জীবনস্রোত' প্রভৃতি নাটকের মাধ্যমে। সামাজিক ও মানসিক সঙ্কট থেকে উদ্ভূত সমস্যা নিয়ে নাটক লিখলেন সলিল সেন। এঁর বিশিষ্ট নাট্যরচনা 'নতুন ইহুদী', 'মৌচোর', 'ডাউন ট্রেন'! প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের 'শহরতলী' আর একটি সমাজ-সচেতন নাট্যসৃষ্টি। 'বারো-ঘণ্টা' খ্যাত কিরণ মৈত্রের 'বুদবুদ', 'নাটক নয়' প্রভৃতি নাটক নাটিকা সমাজ বাস্তবের সার্থক রূপায়ন। খণ্ড-ক্ষুদ্র ভগ্নাংশে বিভক্ত আধুনিক জীবনকে রূপ দিলেন ধনঞ্জয় বৈরাগী তাঁর 'রূপোলি চাঁদ', 'এক মুঠো আকাশ', 'রজনীগন্ধা' প্রভৃতি নাটকে। 'বিচারের বাণী', 'ছায়ানট'-খ্যাত উৎপল দত্ত কয়লা-খনি শ্রমিকদের মর্মবাণী রূপায়িত করলেন তাঁর দেশবিখ্যাত নাটক 'অঙ্গারে'। সমষ্টির বক্তব্যকে থিয়েটারের চতুষ্কোণ থেকে মুক্তি দিয়ে জনসাধারণের মুক্ত অঙ্গনে নিয়ে এলেন বীরু মুখোপ্যাধ্যায় তাঁর 'রাহুমুক্ত' যাত্রা-নাটকের মাধ্যমে। তাঁর 'সংক্রান্তি' ও 'সাহিত্যিক' সার্থক নাট্যসৃষ্টি। আধুনিক মানুষের জটিল মানস প্রতিফলিত হল সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর 'ছায়াবিহীন', 'সমান্তরাল', 'ছারপোকা' প্রভৃতি নাটকে। সাম্প্রতিককালে আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে আরও কিছু উল্লেখযোগ্য নাটক রচিত হয়েছে। 'নীচের মহল'-খ্যাত উমানাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন 'জল', 'অপরাজিত'-খ্যাত রমেন লাহিড়ী লিখেছেন 'শততম রজনীর অভিনয়', জোছন দস্তিদার লিখেছেন 'দুই মহল', মনোরঞ্জন বিশ্বাস লিখেছেন 'আমার মাটি', উদীয়মান তরুণ নাট্যকার মনোজ মিত্র লিখেছেন 'নীলকণ্ঠের বিষ'। ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কেরানীর জীবন' ও 'ষ্ট্রীট বেগার', পরেশ ধরের 'শুধু ছায়া' ও 'ডানা ভাঙা পাখি', পৃথ্বীশ সরকারের 'লবণাক্ত' স্মরণীয় অবদান। ধীরেন্দ্রনাথ দাসের 'গাঙ্গুলী মশাই', বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের 'কষ্টিপাথর', ভানু চট্টোপাধ্যায়ের 'আজকাল', 'কাণাগলি', দেবব্রত সুর চৌধুরীর 'সাগ্নিক', কানাই বসুর 'গৃহপ্রবেশ', সুনীল দত্তের 'হরিপদ মাষ্টার' ও হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জনরব' জনপ্রিয় আধুনিক নাটক। আর একটি বিশিষ্ট নাম অজিত

গঙ্গোপাধ্যায়। এক নতুন প্রতিভার নবারুণ রশ্মি লক্ষ্য করা যায় তাঁর 'নচি-কেতা', 'সূর্যের মত সমুদ্র' ও 'পোষ্টমাষ্টারের বৌ' নাটক ত্রয়ে।

এই প্রসঙ্গে একাঙ্ক নাটক, নাট্যকাব্য, জীবনী নাটক, অনূদিত নাটক, উপন্যাসের নাট্যরূপও উল্লেখের দাবি রাখে। আজ থেকে ঠিক ৩৮ বৎসর আগে ১৯২৩ সালের এই ২৪শে ডিসেম্বর স্টার থিয়েটার সবুজপত্র সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর প্রশংসাধন্য, মৎপ্রণীত একাঙ্ক নাটক 'মুক্তির ডাক' অভিনয় করে একাঙ্ক নাটকের যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন, আজ তা বহু প্রতিভাশালী একাঙ্ক নাটক রচযিতার সাধনায় শুধু উর্বর নয়, শস্যশ্যামলও বটে। শচীন সেনগুপ্ত, তুলসী লাহিড়ী, বুদ্ধদেব বসু, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, পরিমল গোস্বামী, প্রমথনাথ বিশী, মনোজ বসু, বনফুল, অখিল নিয়োগী, বিধায়ক ভট্টাচার্য, সলিল সেন, ধনঞ্জয় বৈরাগী মাঝে মাঝে সার্থক একাঙ্ক নাটক রচনা করে নাট্য-সাহিত্যেব বৈচিত্র্য সাধন করেছেন, কিন্তু আধুনিককালে একাঙ্ক নাটক রচনাকে সাধনারূপে গ্রহণ করেছেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে স্মরণীয় দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত গঙ্গোপাধ্যায়, গিরিশংকর, সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, অমর গঙ্গোপাধ্যায়, অগ্নিমিত্র, অমরেশ দাশগুপ্ত, গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, বিশ্বেশ্বব মুখার্জী, কিরণ মৈত্র, সুনীল দত্ত, অচল বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র, সুরঞ্জন মিত্র, রমেন লাহিড়ী, বিদ্যুৎ বসু, শৈলেশ গুহনিয়োগী এবং শ্রীমতী তৃপ্তি রায়চৌধুরী। সাম্প্রতিক কালে গন্ধর্ব-প্রযোজিত একাঙ্ক নাট্য উৎসবেও কিছু শক্তিশালী একাঙ্ক রচযিতাকে আমরা পেয়েছি। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অতনু সর্বাধিকারী, ডঃ চিত্তরঞ্জন ঘোষ, ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায় ও মমতা চট্টোপাধ্যায়। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'সবার উপরে মানুষ সত্য' সাম্প্রতিক একাঙ্ক নাটকটি বিশ্ব-নাট্যসাহিত্যে স্থান পাবার যোগ্য। বিন্দুতে সিন্ধুদর্শনের ন্যায় একাঙ্ক নাটকেও পূর্ণাঙ্গ নাটকের আবেদন দুর্লভ নয়। কর্মব্যস্ততা ও গতিশীলতা আমাদের জীবনকে যেরূপ চঞ্চল করে তুলেছে তাতে এ ভবিষ্যদ্বাণী আমি করতে সঙ্কোচ বোধ করছি না যে, আজকের একাঙ্ক নাটকই ভবিষ্যতের পূর্ণাঙ্গ নাটক।

জীবনী নাটকও নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম জীবনী নাটকের গৌরব 'শ্রীমধুসূদন'-খ্যাত কথাসাহিত্যের 'বনফুল—' বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের প্রাপ্য। তাঁর 'বিদ্যাসাগর'ও একটি স্মরণীয় অবদান। অন্যতম জনপ্রিয় কথা-সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রামমোহন' জীবনী নাটকটিও শ্রদ্ধেয় অবদান। শৈলেশ বসুর 'নেতাজী', সুনীল দত্তের 'বর্ণ-পরিচয়', এবং মন্মথ রায়ের 'শ্রীশ্রীমা' উল্লেখযোগ্য।

সাম্প্রতিককালে নাট্য-কাব্যের অনুশীলনও এক নব-দিগন্তের সূচনা। রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে অতুলনীয় ছিলেন। আধুনিককালে ফ্রান্স, স্পেন, আমেরিকা ও ইংলণ্ডের নাট্যকাব্য যেমন নূতন মর্যাদা লাভ করেছে, বাংলা নাট্যসাহিত্যেও এর অনুপ্রবেশ লক্ষ্যণীয়। দিলীপ রায়ের 'দুই আর দুই', রাম বসুর 'নীলকণ্ঠ', গিরিশংকরের 'সমুদ্র,' কৃষ্ণ ধরের 'এক রাত্রির জন্য' প্রশংসনীয় অবদান।

অনূদিত নাটকের ক্ষেত্রও আজ খুবই উর্বর। শ্রেষ্ঠ বিদেশী নাটকের অনুবাদে আমাদের নাট্যসাহিত্য যেমন সমৃদ্ধ হচ্ছে, আবার তেমনি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যও হারাতে পারে এ আশঙ্কাও রয়েছে। উমানাথ ভট্টাচার্যের 'নীচের মহল', 'ঘূর্ণি' ও 'শেষ সংবাদ', অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'থানা থেকে আসছি', 'শকুন্তলা রায়', 'আকাশ বিহঙ্গী', কুমারেশ ঘোষের 'Salome', সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর 'ছায়াবিহীন', শিবেন মুখোপাধ্যায়ের 'তিন চম্পা', সাধনকুমার ভট্টাচার্যের 'রাজা ইডিপাস', বহুরূপীর 'পুতুল খেলা', শৌভনিকের 'Ghosts', লিটল থিয়েটারের 'ওথেলো', আই-পি-টি-এর '২০শে জুন' স্মরণীয় অনূদিত নাট্যার্ঘ।

উপন্যাসের নাট্যরূপ আমাদের নাট্যশালায় নতুন নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সার্থক নাট্যরূপ বহুকাল সুধা পরিবেশন করেছে। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের বহু উপন্যাসের সার্থক নাট্যরূপ আধুনিককালে দক্ষ অভিনয়ে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছে। রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীতে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প ও কবিতার নাট্যরূপেও আমরা অনেক ক্ষেত্রে উদ্ভাসিত হয়েছি। প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির উপন্যাসের নাট্যরূপও জনপ্রিয় হতে দেখেছি। উপন্যাসের নাট্যরূপদাতাদের মধ্যে যোগেশ চৌধুরী, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, বিধায়ক, ভট্টাচার্য, শচীন সেনগুপ্ত, তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য, ধনঞ্জয় বৈরাগী, বীরু মুখোপাধ্যায় এবং সন্তোষ সেন শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এ বিষয়ে দেবনারায়ণ গুপ্তের কৃতিত্ব অবিসম্বাদীরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত।

নবনাট্য আন্দোলন দেশে নাট্য-রসাস্বাদনের যে দুর্নিবার ক্ষুধা সৃষ্টি করেছে, পেশাদার নাট্যশালাগুলিও তাতে উপকৃত হচ্ছে। পেশাদার নাট্যশালার নাটকও আজ প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। শ্রীরঙ্গমে 'দুঃখীর ইমান' থেকেই পেশাদার নাট্যশালায় যে নতুন সুর বেজে ওঠে, তা থেমে থাকে নি, বরং নতুন আঙ্গিকে, নব নাট্যরীতিতে পেশাদার নাট্যশালার নাটকও আজ সমাজ চেতনার প্রতিফলন হয়ে দাঁড়িয়েছে। মিনার্ভার 'জীবনটাই নাটক', 'কেরানীর জীবন', 'এরাও মানুষ', রঙমহলের 'শেষ লগ্ন', 'সাহেব বিবি গোলাম', 'এক মুঠো

আকাশ', 'অনর্থ', বিশ্বরূপার 'ক্ষুধা' ও 'সেতু', মিনার্ভায় লিটল থিয়েটার গ্রুপের 'ছায়ানট', 'অঙ্গার', 'ফেরারী ফৌজ', ষ্টার থিয়েটারের 'শ্যামলী', 'পরিণীতা', 'শ্রীকান্ত' ও 'শ্রেয়সী' সার্থক নাট্যসৃষ্টিরূপে শত শত রাত্রির অভিনয়-গৌরবধন্য ও জনসম্বর্ধিত। আধুনিক নাট্যপ্রযোজনায় বাস্তবানুগ নাট্য-আঙ্গিকও একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। মঞ্চশিল্পে, বিশেষ আলোকসম্পাতে সতু সেন এবং তাপস সেনেব ঐন্দ্রজালিক কৃতিত্ব আজ সর্বজনবিদিত।

কলকাতায় ইংবেজি-আদর্শে থিয়েটার বা নাট্যশালা প্রবর্তনের পূর্বে যাত্রা পালাগানই যে জাতীয় নাট্য-উৎসব ছিল, এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। কলকাতা তথা সমগ্র বাংলা দেশে থিযেটাব ক্রমশঃ চালু হযে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করে, কিন্তু যাত্রাগানও পল্লী অঞ্চলে তার জনপ্রিযতা বজায় বাখতে সমর্থ হয়। মুকুন্দদাসের যাত্রা তো আমাদেব স্বাধীনতা সংগ্রামে অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। আধুনিককালের যাত্রা-নাটক অনেকটা থিযেটারের নাটকের বৈশিষ্ট্য বরণ করে নিলেও স্বকীয চবিত্র একেবাবে হারায় নি এবং এর রোমাণ্টিকধর্মী আবেদন জনসাধারণকে এখনও অভিভূত করে। যাত্রাগানকে আধুনিক জনপ্রিয় করবার জন্য 'বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনীব' প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়।

বর্তমান কালে 'থিযেটার সেণ্টার' প্রমুখ বহু নাট্যসংস্থা কর্তৃক আয়োজিত একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা একাঙ্ক নাটকের মান উন্নয়নের বিশেষ সহায়ক হযেছে—তেমনি সহায়ক হয়েছে 'বিশ্বরূপা' নাট্য-উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষৎ কর্তৃক একাঙ্ক ও পূর্ণাঙ্গ নাটকের মান উন্নয়নের জন্য অনুষ্ঠিত আজ তিন বৎসর ব্যাপী অক্লান্ত প্রচেষ্টা। নাট্যকারদেব স্বার্থ সংরক্ষণ এবং নাট্যচর্চার উন্নতি ও প্রসাবকল্পে স্থাপিত বাংলার নাট্যকারদেব নিজস্ব প্রতিষ্ঠান 'নাট্যকার সঙ্ঘ' প্রথম নাট্য-সম্মেলনের আয়োজন করেন। 'বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পবিষৎ'ও এ পর্যন্ত তিনটি বার্ষিক নাট্যসম্মেলনের অনুষ্ঠান করে প্রগতিশীল নাট্যচর্চার সম্যক আলোচনার সুব্যবস্থা করেছেন।

বাংলা নাটকের এবং নাট্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশ অনুধাবন করা নাট্যচর্চার পক্ষে অপরিহার্য। এইরূপ ঐতিহাসিক গবেষণার পথ প্রস্তুত ও প্রশস্ত করে দিয়েছেন ডক্টর সুশীলকুমার দে, প্রিয়রঞ্জন সেন, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর সুকুমার সেন, ডক্টর পি, সি, গুহঠাকুরতা, ডক্টর সাধনকুমার ভট্টাচার্য, ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায়, হেমেন্দ্রকুমার রায় এবং প্রাচীনকাল থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বাংলা নাট্য-সাহিত্যের দুই ইতিহাস রচয়িতা : ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং ডক্টর অজিত কুমার ঘোষ। এই প্রসঙ্গে প্রধানতঃ বাংলা নাটকের আলোচনা জীব্য বর্তমান-

কালের তিনটি সাময়িক পত্রিকা 'বহুরূপী', 'গন্ধর্ব' এবং 'সূত্রধারে'র নামও স্মরণীয়। দৈনিক সংবাদপত্রগুলি বাংলা নাটক ও নাটকাভিনয়ের তথ্য ও আলোচনা পরিবেশন কবে নাট্য আন্দোলনের সহায়ক হয়েছেন। 'আনন্দ-বাজার পত্রিকা'য় প্রতি বৃহস্পতিবার একটি বিশেষ পৃষ্ঠাকে 'আনন্দলোক' নামে অভিহিত কবে বাংলায় নাট্যচর্চা প্রসারে সাহায্য করেছেন। পত্র-পত্রিকাব এই প্রচেষ্টা আমাদের ধন্যবাদার্হ।

নাটক হচ্ছে দৃশ্যকাব্য। অভিনয়েই নাটকের সার্থকতা সম্পূর্ণ হয়। নাট্যশালাব জন্য যেমন নাটকের প্রয়োজন নাটকের জন্যও নাট্যশালা তেমনই অপরিহার্য। অভিনযের সুব্যবস্থা না হলে নাটকের মান উন্নয়নের কোনও আশা নেই। বাংলা নাটকের পক্ষে নাট্যশালার স্বল্পতাই এখন একটি প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িযেছে। বাংলার রাজধানী কলকাতার কথাই ধরা যাক। বহুকাল থেকে দেখা যাচ্ছে কলকাতায় চারটির বেশী স্থায়ী পেশাদার নাট্যশালা নেই। কলকাতাব জনসংখ্যা যে উর্ধস্তরে গিয়ে পৌঁছেচে তাতে এই চারটি স্থায়ী নাট্যশালা দর্শকদেব নাট্য-পিপাসা মেটাতে নিতান্তই অপর্যাপ্ত। অপেশাদার নাট্যসংস্থাগুলি স্থায়ী মঞ্চের অভাবে সঙ্কুচিত। স্থায়ী নাট্যশালার অপ্রতুলতা বাংলার নবনাট্য আন্দোলনের অগ্রগতির পথে শোচনীয় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জাতীয় নাট্যশালা স্থাপন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের একটি বহু ঘোষিত অভিলাষ ছিল। জাতীয় নাট্যশালার জন্য মৎপ্রদত্ত একটি পরিকল্পনা, মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সাগ্রহে, শিশিরকুমার ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, সলিল মিত্র, শিশির মল্লিক প্রভৃতি নাট্যনেতাদের সহযোগে ১৯৫৩ সালের ১৫ই নভেম্বর অনুষ্ঠিত এক সভায় আলোচনা করেন, কিন্তু তা আলোচনাতেই পর্যবসিত হয়। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী মৃত্যুর কিছু পূর্বে বলেছিলেন, 'পদ্মভূষণ উপাধি চাই না, চাই জাতীয় নাট্যশালা।' সুখের বিষয় এই রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী শুভ বৎসরে গত পনেরোই আগস্ট, স্বাধীনতা দিবসে, এই মহানগরীতে জাতীয় নাট্যশালার ভিত্তি স্থাপন করেছেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী জহরলাল নেহরু। দুঃখের বিষয় এই নাট্যশালার সংগঠন, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে কোন ঘোষণা এখনও পর্যন্ত জনসাধারণ অবগত নন। জাতীয় নাট্যশালার বিরাট ইমারতটি গড়ে উঠেছে, সম্পূর্ণ হতেও নাকি আর বিশেষ দেরি নেই। কিন্তু বিভিন্ন পেশাদার ও অপেশাদার নাট্যসংস্থার সঙ্গে জাতীয় নাট্যশালার যদি নাড়ীর যোগ না থাকে, তবে তাকে জাতীয় নাট্যশালা বলা যায় কি না, আশা করি সরকার এ বিষয়টি বিবেচনা করে দেখবেন—বিশেষ,

যেখানে দেশের সকল নাট্য সংস্থাই এই জাতীয় নাট্যশালাটিকে বাংলার গর্ব ও গৌরবে পরিণত করতে সমুৎসুক।

আমাদের নাট্যসাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনায় আর একটি বিষয় খুবই লক্ষ্যণীয়। পাশ্চাত্য নাটককে কথা-সাহিত্যের সঙ্গে পৃথক করে দেখা হয় নি। ইবসেনের নাটক, সিগ্রিদ আণ্ডসেটের উপন্যাসের কাছে মর্যাদায় কিছু মাত্র ন্যূন নয়। সাহিত্যের দরবারে ঔপন্যাসিক সার্ত্র ও নাট্যকার সার্ত্র-এর সমান আদর। ব্রেখ্‌টের নাটক ও কামুর উপন্যাস সাহিত্যের আলোচনাচক্রে একই মর্যাদায় আলোচিত। ঔপন্যাসিক হেমিংওয়ের সঙ্গে নাট্যকার ইউজিন ও' নীল অথবা নাট্যকার টেনেসি উইলিয়ামসকে কিছু নীচু করে বিচার করা হয় না। সাহিত্য যদি দেশ-কাল-জাতির দর্পণ হয়, তবে বাংলা কথাসাহিত্যের দর্পণ খুবই উজ্জ্বল সন্দেহ নেই, কিন্তু বাংলা নাট্যসাহিত্যের দর্পণও অনুজ্জ্বল নয়। জাতিকে মহৎভাবে অনুপ্রাণিত করা যদি সাহিত্যের দায়িত্ব হয়, তবে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র থেকে আরম্ভ করে গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ এবং রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কালের শক্তিশালী নাট্যকারেরা এ দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছিলেন বা করে আসছেন। বাংলা কথা-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি যদি পাঠকের মনে দোলা দিয়ে থাকে তবে বাংলা নাটকের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি আপামর জনসাধারণের মনে,সমগ্র জাতির মনে দোলা দিয়ে এসেছে। তর্ক হয়তো উঠতে পারে যে, শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিকগণ যেখানে বুদ্ধিদীপ্ত পাঠকের সত্তাকে জাগ্রত করেছেন বাংলার নাট্যকারগণ সেখানে শুধুই জনসাধারণের সস্তা ভাবপ্রবণতার ইন্ধন জুগিয়েছেন। এ কথা বললে আমি এই অর্থই করব যে, শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিকগণ তবে গজদন্ত মিনারে আরোহণ করে সমগ্র জনসাধারণকে ভাবপ্রবণ জনতার মিছিলরূপে দেখেছেন। আর যদি তাই হয়, তবে আমি নাট্যকার ওই গজদন্ত মিনার থেকে দূরে সরে এসে ওই ভাবপ্রবণ জনতার সামিল হয়েই থাকতে চাই—যে জনসভায়, যে দর্শকসভায় বিদ্যাসাগর, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি মনীষী ও ঋষিগণ বসে বুদ্ধিজীবি-নিন্দিত ঐ সস্তা আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে থিয়েটারে হাততালি দিয়ে গেছেন। তা ছাড়া, কথাসাহিত্যিকদের কথাসাহিত্য সাধারণ জনের তথাকথিত সস্তা আবেগের সমর্থন যদি না পেত তবে তাঁদের গ্রন্থের নিত্য নতুন সংস্করণের সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে তাঁরা তাঁদের ওই গজদন্তমিনারে উঠে বসতেও পারতেন না। ক্ষোভের সঙ্গে আমি একথা শুধু এই কারণেই বলতে বাধ্য হলাম যে, এখনও আপনারা লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন, বেশির ভাগ সাহিত্যপত্র-

পত্রিকায় নাটক ছাপা হয় না। এমন কি বিপুল কলেবর শারদীয় সংখ্যাগুলিতেও না। ব্যতিক্রম অবশ্য আছে এবং সে সব ক্ষেত্রে সম্পাদকের এবং পাঠকদের নাট্যপ্রীতি সাহিত্যপ্রীতি থেকে ভিন্ন নয়।

দেড়শত বৎসরের নাট্যপরিক্রমা স্বল্প পরিসরে পরিবেশনযোগ্য নয়। তাতে ভুল ত্রুটির সমধিক সম্ভাবনা। এই নাট্যপরিক্রমার তালিকায় স্মরণযোগ্য বহু নামই হয়তো উল্লিখিত হয় নি, তাতে কিন্তু তাঁদের অমর্যাদা হল না, অমর্যাদা হল আমারই। এ তালিকা দেবার প্রয়োজন বোধ করেছি এই জন্য যে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে নাট্যশাখার প্রবর্তন এই প্রথম। তা ছাড়া, দেশের নাট্যসাহিত্য সম্পর্কে বহুলোক উন্নাসিক ভাব পরিপোষণ করেন এটাও মিথ্যা নয়। প্রায়ই শোনা যায় আমাদের দেশে নাকি নাটক নেই। দেশের নাটক অবহেলা করে পাশ্চাত্ত্য নাটকের গুণপনায় অনেকে শতমুখ। হয়তো এটা আভিজাত্য আকর্ষণের সহজ পথ। কিন্তু বাংলা নাট্যসাহিত্যের সাম্প্রতিক মান সাম্প্রতিক পাশ্চাত্য নাটকের মানের চেয়ে নিকৃষ্ট মনে করবার কোন কারণ নেই, এ কথা নির্ভয়ে ঘোষণা করে আমি বিদায় নিচ্ছি রবীন্দ্রনাথের ক্ষুদ্র একটি কবিতা পরিবেশন করে:

"বহু দিন ধ'রে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হ'তে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শীষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।"

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

সংবাদসাহিত্য শাখার সভাপতির ভাষণ

পরিচিতি :
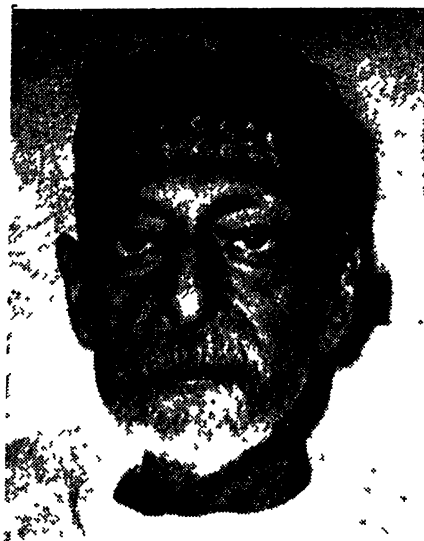
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

১৮৭৬ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে যশোরের চৌগাছা গ্রামে এঁর জন্ম। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পরে ইনি কৃষ্ণনগরে পড়াশুনার জন্য আসেন। পরে কলিকাতায় পড়াশুনার জন্য আসেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি-এ পাশ করার পর ইনি ঐ কলেজেই ইংরাজী সাহিত্যে এম-এ এবং রিপন কলেজে আইন পড়েন। ১৯০৫ সালে ইনি স্বদেশী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯১৪ সালে দৈনিক বসুমতীর প্রথম প্রকাশ থেকেই তিনি ওর সম্পাদনা করতে থাকেন। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি দৈনিক ও সাপ্তাহিক বসুমতীর সম্পাদনা করেন। ইনি এ্যাড্ভান্স ও মাতৃভূমি পত্রিকারও কিছুকাল সম্পাদক ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের অন্যতম অধ্যাপক এবং ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটেরও একজন মনোনীত সদস্য ছিলেন। এককালে ইনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলরও ছিলেন। ইনি কয়েকটি গ্রন্থও রচনা করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—বিপত্নীক, অধঃপতন, প্রেমের জয়, নাগপাশ, প্রেম-মরীচিকা, চোরাবালি, অশ্রু, প্রত্যাবর্তন প্রভৃতি।

(১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬২ তারিখে ইনি পরলোকগমন করেন।)

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

সংবাদসাহিত্য শাখার সভাপতির ভাষণ

আমেরিকান রাজনীতিক ব্রায়ন ইংরেজ শাসিত ভারতে আসিয়া অবস্থা বিবেচনা করিয়া লিখিয়াছিলেন ইংরেজ ভারতের কিছু উপকার করিয়াছে, কিন্তু তাহার জন্য সে যে মূল্য লইয়াছে তাহা অত্যধিক। ইংরেজ যে সকল উপকার করিয়াছিল সে সকলের মধ্যে সংবাদপত্র প্রবর্তন অন্যতম বলা যায়। কিন্তু সংবাদপত্রকে স্বাধীনতা লাভের জন্য যে চেষ্টা করিতে হইয়াছে তাহাও অসাধারণ। প্রায় সকল দেশেই শাসকগোষ্ঠী সমালোচনা সম্বন্ধে অসহিষ্ণু এবং আপনাদিগকে অভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন। সেই জন্য স্বাধীন দেশ ইংল্যাণ্ডেও সংবাদপত্রের মত প্রকাশ স্বাধীনতা লাভ করিতে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল। আমেরিকার কোন বিচারক বলিয়াছেন লোক যখন অভাব অভিযোগ জানাইবার জন্য সংবাদপত্র প্রচার করিতে আরম্ভ করে তখন হইতেই সম্পাদকদিগকে দমিত করিবার জন্য নানা চেষ্টা হইয়াছে। স্বাধীন দেশেই যখন ইহা হইয়াছে তখন পরাধীন ভারতে যে তাহা হইবে তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। কিন্তু ভারতে বাঙ্গালীই সর্বপ্রথম মত প্রকাশ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। প্রথমে ইংরেজের ব্যবস্থা ছিল কোন লোক তাঁহাদিগের পক্ষে অপ্রীতিকর হইলে তাহাকে সরাসরি নির্বাসিত করা। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ১২ই ফেব্রুয়ারী ক্যালক্যাটা জার্ণালের সম্পাদক জে, এম, সিল্ক. বাকিংহামকে নির্বাসনের আদেশ দিবার পরেই বাঙ্গালার ইংরেজরা যখন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আরও ক্ষুণ্ণ করিবার চেষ্টা করেন তখন ছ'জন বাঙ্গালী তাহার বিরোধিতা করিয়াছিলেন--

চন্দ্রকুমার ঠাকুর
দ্বারকানাথ ঠাকুর
রামমোহন রায়
হরচন্দ্র ঘোষ
গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রসন্নকুমার ঠাকুর।

তাঁহাদিগের আপত্তি এদেশের আদালতে না টিঁকিলে রামমোহন রায় বিলাতে যাইয়া সেই নির্বাসনের বিরুদ্ধে আপীল করিয়াছিলেন। আপীলেও সংবাদ-পত্রের মত প্রকাশ স্বাধীনতা সমর্থিত হয় নাই। ১৮৩৫ খৃস্টাব্দে সার চার্লস মেট্‌কাফ ভারতীয় সংবাদপত্রকে স্বাধীনতা দান করায় ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এত অপ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন যে তাঁহাকে বড়-লাটের পদ ত্যাগ করিতে হয়। বাঙ্গালার সংবাদপত্র "বঙ্গবাসী"র বিরুদ্ধে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে রাজদ্রোহের জন্য মামলা উপস্থাপিত করা হয়। সে মামলা কোন রকমে মিটাইয়া ফেলা হয়। তাহার পর ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মারাঠা পত্রিকা "কেশরী"তে প্রকাশিত রচনার জন্য বালগঙ্গাধর তিলককে রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত করিয়া ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তিলক ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। তদবধি বহু সংবাদপত্রকে রাজদ্রোহের জন্য লাঞ্ছিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। বহু বাঙ্গালী সাংবাদিক দণ্ডিত হইয়াছিলেন এবং বাঙ্গালী সাংবাদিক উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব অভিযুক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন ভগবানের নির্দিষ্ট স্বরাজের কাজে তিনি যাহা করিয়াছেন সেজন্য তিনি বিদেশী শাসকদিগের নিকট কৈফিয়ত দিতে দায়ী নহেন। বাস্তবিক সরকার স্বদেশীই হউন আর বিদেশীই হউন সংবাদপত্রের পক্ষে সরকারের সমালোচনা করিবার সম্পূর্ণ অধিকার থাকা প্রয়োজন।

শ্রীরাজাগোপালাচারী বলিয়াছেন, ইংরেজের আমলে সরকারের বিরুদ্ধ সমালোচনা করাই স্বদেশপ্রেমিকদিগের রীতি ছিল। কিন্তু ভারত স্বায়ত্তশাসন লাভের পরে মোড় এমন ফিরিয়া গিয়াছে যে সরকারের সকল কাজের সমর্থন করাই যেন রীতি ও পদ্ধতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার ফলে সরকার আবশ্যক সমালোচনায় বঞ্চিত হইতেছেন।

যদি সংবাপত্রের প্রকৃত স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া গণতন্ত্রের গৌরব বৃদ্ধি করিতে হয় তবে ভারতীয় সংবাদপত্রের পক্ষে বর্তমান জাতীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযোগ আছে। তিনটি কারণে এদেশে সংবাদপত্র তাহার প্রচার, প্রতাপ ও প্রভাব যথোপযুক্তভাবে বর্ধিত করিতে পারিতেছে না—

(১) ভাষার বাহুল্য
(২) লোকের দারিদ্র্য
(৩) শিক্ষা প্রচারের অভাব।

এ তিনের জন্যই বর্তমান সরকারকে দায়ী না করিয়া পারা যায় না। কারণ বাঙ্গলার মত পরিপুষ্ট ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা না করিয়া তাঁহারা অপরিপুষ্ট

হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করায় তাহা প্রকৃত রাষ্ট্রভাষা হইতে অযথা বিলম্ব হইতেছে এবং এখনও খণ্ডিত ভারতের সর্বাংশে মত ব্যাপ্তির জন্য ইংরেজীই ব্যবহার করিতে হইতেছে। পর পর দুইটি পরিকল্পনা শেষ হইবার পরে এখনও বলা হইতেছে আরও দশ বৎসর ভারতকে পরিকল্পনা রূপায়িত করিবার জন্য বিদেশী ঋণের ও বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হইবে। অর্থাৎ দুইটি পরিকল্পনার পর তৃতীয় পরিকল্পনা রূপায়িত করিবাব জন্য আবশ্যক অর্থ দেশে পাওয়া যায় নাই এবং তিনটি পরিকল্পনাতেও চতুর্থ পরিকল্পনা রূপায়িত করিবাব আবশ্যক অর্থ পাওয়া যাইবে না। এদিকে বৈদেশিক ঋণ যেমন বাড়িয়া চলিযাছে দেশেব লোকের ব্যক্তিগত আয় তেমনই, দ্রব্যমূল্যের অনুপাতে, বর্ধিত না হওয়ায় লোকের পক্ষে একখানি সংবাদপত্র ক্রয় করাও কষ্টসাধ্য। যদিও সংবিধানে বলা হইয়াছে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক বালিকামাত্রেরই শিক্ষালাভেব ভার সরকারের তথাপি স্বায়ত্তশাসনলাভের এতদিন পরেও রাষ্ট্রে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হয় নাই। কেহ কেহ মনে কবেন পাছে শিক্ষালাভ করিলে লোক অধিকার-সচেতন হয় এবং গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে স্বৈবশাসন পরিচালিত করা অসম্ভব হয় সেই জন্যই সরকার সংবিধান-প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন করিতেছেন না। সে যাহাই হউক, সংবাদপত্রের ক্ষমতা বিস্তারের অন্তরায় কারণসমূহের দায়িত্ব হইতে সরকার অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন না।

কেবল তাহাই নহে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলিয়াছেন, যদিও কোন কোনদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সঙ্কোচক ব্যবস্থা হইয়াছে তথাপি ভারতে তাহা হয় নাই। এই উক্তিটি সত্য নহে। যেসকল অর্ধ-সত্য অসত্য অপেক্ষাও ভয়াবহ—ইহা তাহাই। কারণ গত বৎসরেও যে আসামে বাঙ্গালীরা সংবিধান-দত্ত অধিকারে বঞ্চিত হইয়াছে সেই আসামে সংবাদপত্রের অধিকার সঙ্কোচক আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে এবং ভারত সরকার তাহার অনুমোদন করিয়াছেন। সংবাদপত্রকে যদি তাহার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয় তবে এই সরকারের যাঁহারা কর্তা তাঁহাদিগের সহিত অধিক ঘনিষ্ঠতা বর্জন করিতে হইবে। কিন্তু দেখা যাইতেছে তাহাই হইতেছে না। পরন্তু সরকারের মন্ত্রী ও কোন বিশেষ রাজনীতিক দলকে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন অতিরিক্ত আদর দিয়া আপনাদিগের যে মনোভাবের পরিচয় দিতেছেন তাহা কোনরূপে বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না।

অল্পদিন পূর্বে আমন্ত্রিত হইয়া এক সভায় প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল ফতোয়া দিয়াছেন লেখ্য ভাষা ত্যাগ করিয়া সংবাদপত্রে কথ্য ভাষা ব্যবহৃত

হওযাই বাঞ্ছনীয। ইংল্যাণ্ডেব বিলাসব্যসনপ্রিয বাজা দ্বিতীয চার্লসেব দববাব যে সুন্দবীদিগেব দ্বাবা শোভিত ছিল মিসেস জেমসন তাঁহাদিগেব বিববণ লিখিযাছিলেন। দ্বিতীয চার্লসেব বাণী ক্যাথেবিন ঐ রূপসীদিগেব সহিত রূপে সমকক্ষ না হইলেও পুস্তকেব সর্বাগ্রে তাঁহাবই কথা লিখিত হইল কেন তাহাব কৈফিযতে গ্রন্থলেখিকা বলিযাছিলেন—"The queen leads the wav bv right of etiquette and courtesy, if not by 'right divine' of beauty." অর্থাৎ তাঁহাব পদাধিকাবই বাণীকে প্রথম স্থানেব অধিকাবী কবিযাছে। তেমনি জওহবলাল খণ্ডিত ভাবত-বাষ্ট্রেব প্রধানমন্ত্রী বলিযা নানা অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে আহূত হইযা থাকেন ও আলোচ্য বিষয সম্বন্ধে অনাযাসে মত প্রকাশ কবেন। এক্ষেত্রে তিনি অন্তত বাঙ্গালা সংবাদপত্রেব ব্যবহৃত ভাষা সম্বন্ধে বিবাট অজ্ঞাতবই পবিচয দিযাছেন। বাঙ্গালা সংবাদপত্র মহাবাষ্ট্রীয সংবাদপত্রেবই মত কথ্য ভাষায লিখিত হয না পবন্তু লেখ্য ভাষায লিখিত হয। সংবাদপত্রকে যদি লেখ্য ভাষা পবিত্যাগ কবিযা কথ্য ভাষা ব্যবহাব কবিতে হয তবে তাহাতে তাহাব ক্ষতি ব্যতীত লাভ কখনো হইতে পাবে না। কাবণ তাহা হইলে একই প্রদেশেব সব লোকও এক সংবাদপত্র পাঠ কবিলে তাহাব মর্ম গ্রহণ কবিতে পাবিবে না। বর্তমান সবকাবেব কর্তৃপক্ষবা সাম্প্রদাযিকতা স্বীকাব কবিয়া লইযা অর্থাৎ জাতীযতা কর্মনাশাব জলে বিসর্জন দিযা ভাবতকে খণ্ডিত কবিযাছেন, তাহাব পবে আবাব মোহনদাস কবমচাঁদ গান্ধী ও তাঁহাব শিষ্যগণ তপশিলী ও অতপশিলী দুইভাগে বিভক্ত কবিযা হিন্দু সমাজকে বিভক্ত ও দুর্বল কবিযাছেন। সংবাদপত্রে কথ্য ভাষা ব্যবহৃত হইলে সংবাদপত্রকে সবল না কবিযা দুর্বল কবাই হইবে।

এখনই পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানে বাঙ্গালাব স্থানে উর্দু প্রতিষ্ঠিত কবিতে ব্যর্থকাম হইযা যে উর্দু ঘেঁষা বাঙ্গালাব আদব কবিতেছেন তাহাতে কিছুদিন পবে পূর্ব পাকিস্তানেব লোক পশ্চিবঙ্গেব সংবাদপত্র পডিযা বুঝিতে পাবিবে না। অবস্থা দাঁড়াইবে—

(১) বামচন্দ্র বিবি সীতাসহ বনে গমন কবিলে দশবথ পুত্রশোকে এন্তেকাল হইলেন।

(২) কত কেবামৎ জানবে বান্দা কত—
কেবামৎ জান
মাঝ দরিয়ায় জাল ফেলে—
ডাঙ্গায় বোসে টান।

(৩) চাষবাস করো খাচ্ছিল আব্দুল
ছেল আব্দুল ভাল
জাহাজের খালাসী হৈয়া আব্দুল
দরিয়ায় ডুবে মল।

ইহার উপর যদি আবার পশ্চিম বঙ্গেই নানরূপ কথ্যভাষায় সংবাদপত্র লিখিত হয় তবে অবস্থা কি দাঁড়াইবে তাহা পণ্ডিত জওহরলাল না বুঝিলেও সাধারণ লোক বুঝিতে পারে। আশা করি, সংবাদপত্রকে আরও দুর্বল করিবার জন্যই তিনি এইরূপ প্রস্তাব করেন নাই।

সংবাদপত্রের ভাষা কিরূপ হওয়া প্রয়োজন তাহার আলোচনা বাঙ্গালা-দেশের বহুদিন পূর্বেই হইয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা প্রবন্ধে করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধ ১২৬০ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ইংরেজী ১৩ই মার্চ ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে লিখিত হয়। কাজেই আজ নূতন করিয়া উপদেশ লইবার কোন প্রয়োজন অন্ততঃ বাঙ্গালীর নাই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ইঁহাদিগের দ্বারা সংবাদপত্রের ভাষা নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে।

সাহিত্য সম্মেলন যদি সংবাদ সাহিত্যকে আবশ্যক গুরুত্ব প্রদান করেন তবে তাঁহাদিগকে একটি কাজ করিতে হইবে। তাঁহাদিগকে সরকারের অনুগ্রহ লাভের আগ্রহ ত্যাগ করিতে হইবে। মন্ত্রী ও মন্ত্রীর রাজনীতিক দলের তুষ্টি-সাধনে তাঁহাদিগকে বিরত হইতে হইবে। ইংল্যাণ্ডে স্বাধীন দেশে—লর্ড গ্র্যানভিল যখন "টাইমস্" পত্রের সম্পাদককে বলিয়াছিলেন তাঁহার সহিত মিঃ গ্লাডষ্টোনের ঘনিষ্ঠতা হইলে "টাইমস্" পত্রের ও গ্লাডষ্টোনের উভয়েই উপকার হয় তখন সম্পাদক মহাশয় সে প্রস্তাব অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন—পাছে ঘনিষ্ঠতা স্বাধীন মতপ্রকাশের অন্তরায় হয়। গঙ্গাটিকুরিতে সম্মেলনের অধিবেশনে যাহা হইয়াছে তাহাই লক্ষ্য করিয়া একথা না বলিয়া থাকা যায় না। বর্ধমানে সাহিত্যিক ও সাংবাদিকের অভাব ছিল না তবে, যাঁহাদিগের অবদানে বাঙ্গালা সাহিত্য ও বাঙ্গালা সংবাদপত্র কোনরূপে উপকৃত হয় নাই, সেইরূপ লোককেই—প্রাধান্য প্রদানে লোকের মনে এখন সন্দেহের উদ্ভব হইয়াছে যে, সাহিত্য সম্মেলন রাজনীতিক দলবিশেষের নির্বাচনী সভায় পর্যবসিত হইয়াছিল। ইহা সত্য কিনা সে আলোচনা না করিয়াও অনায়াসে বলিতে পারা যায় পথ যখন পিচ্ছিল—বিশেষ কোন কোন সংবাদপত্রও

যখন সরকারের নিকট ঋণী—তখন যাহাতে লোকের মনে সন্দেহের উদ্রেক না হইতে পারে তাহাই করা একান্ত কর্তব্য।

বাঙ্গালা দেশে রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া বহু সাংবাদিক সংবাদ-পত্রের মতপ্রকাশ স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন ও বর্তমান সাংবাদিকরা যেন সর্বদাই সেবিষয়ে অবহিত থাকেন। কোনরূপ প্রভাবে যদি সংবাদপত্র স্বাধীন মত প্রচারে কুণ্ঠানুভব করেন তবে সংবাদপত্রের যাহা অবশ্য কর্তব্য তাহাই বর্জিত হয়। সংবাদপত্র এদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামে অল্প কাজ করে নাই। যে সরকার তাহার প্রচার ও প্রতাপ ক্ষুণ্ণ করিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী সে সরকারের সহিত ঘনিষ্ঠতা অনিষ্টের কারণ হইতে পারে। সংবাদপত্রের আদর্শ থাকা প্রয়োজন স্বাধীন মত প্রকাশ। সে আদর্শ ভ্রষ্ট হইলে সংবাদপত্রের সার্থকতা নষ্ট হয়। আশা করি, সাহিত্য সম্মেলন সংবাদপত্রের সার্থকতা নাশে কোনরূপ সহায় না হইয়া সেই স্বাধীনতা যাহাতে রক্ষিত হয় তাহাই করিবেন।

বিমল ঘোষ

শিশুসাহিত্য শাখার উদ্বোধকের ভাষণ

পরিচিতি ঃ

বিমল ঘোষ

১৯১০ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ এঁর জন্ম। মাত্র ১২ বছর বয়স থেকেই এঁর লেখা শিশু-সাহিত্যের পত্রিকাগুলিতে নিয়মিত প্রকাশিত হয়। কলকাতার আর্ট স্কুলে মাত্র দু'বছর পড়ার পর তিনি তৎকালীন ইংরাজী পত্রিকা 'এ্যাড্‌ভান্স' এর বিজ্ঞাপন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হন এবং সেইসময় সাংবাদিকতাও শিক্ষালাভ করেন। ১৯৩৯ সালে আনন্দবাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার বিজ্ঞাপন বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। কিছুদিন পরে আনন্দবাজার পত্রিকায় 'আনন্দমেলা' নামে শিশু-কিশোরদের আলাদা একটি বিভাগ ইনি পরিচালনা সুরু করেন। 'মণিমেলা' নামে ভারতের প্রথম শিশু সংগঠনের ইনি প্রতিষ্ঠাতা। বর্তমানে ইনি আনন্দবাজার পত্রিকার বিভাগীয় সম্পাদকরূপে নিযুক্ত। এঁর লেখা ছোটদের বিভিন্ন বইগুলি শিশু ও কিশোর পাঠকদের অত্যন্ত প্রিয়। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পরিভ্রমণ করে ইনি সেইসব দেশের শিশু-সাহিত্যের ও শিশুকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করেন। শিশু ও কিশোরদের জন্য অনেক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ছাড়া এঁর লেখা 'ইউরোপের অগ্নিকোণে' নামক বৃহৎ গ্রন্থটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিমল ঘোষ

শিশুসাহিত্য শাখার উদ্বোধকের ভাষণ

বহুদিন পরে কলকাতায় নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন বসলো। কলকাতার সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিরা ও আমরা সাহিত্য-সেবীরা ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হতে সমাগত বহু পুরাতন বন্ধু ও সুধীজনের সান্নিধ্য পেলাম, সত্যিই এ পরম আনন্দ ও সৌভাগ্যের কথা।

আরও বিশেষ আনন্দের কথা এই যে, এবারকার এই সাহিত্য-সম্মেলনের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে শিশু-সাহিত্য শাখার অধিবেশন ও আলোচনার ব্যবস্থা করেছেন উদ্যোক্তারা। এজন্য তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। শিশু-সাহিত্য ও শিশু-কিশোর সংগঠনই আমার জীবনের ব্রত। এই ব্রত-সাধনে একনিষ্ঠভাবে আজ প্রায় ত্রিশ বছর আমি ব্রতী আছি—এই মাত্র আমার পরিচয়।

বছর কুড়ি আগেও সাহিত্য-সম্মেলনে 'শিশু-সাহিত্য' বিশেষ বিভাগে আলোচনার বস্তু বলে গণ্য হয়নি। শিশু-সাহিত্যের দরদী লেখকরাও—যে সাহিত্য-স্রষ্টাদের সম-পর্য্যায়ে পড়ে, তখনও পর্যন্ত একথাও সাধারণভাবে ঘোষিত বা স্বীকৃত হয়নি।

আনন্দবাজার পত্রিকায় ভারতের দৈনিক পত্রিকার সর্বপ্রথম শিশু-বিভাগ প্রবর্তনের পর, শিশু-সাহিত্যের মর্যাদা সম্পর্কে আমি জামসেদপুরে 'চলন্তিকা সাহিত্য সম্মেলনে' যে আলোচনা ও আন্দোলন শুরু করি, তার ফলেই প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ বারাণসী অধিবেশনের সময় আমার প্রস্তাব অনুযায়ী শিশু-সাহিত্য-সম্রাট দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারকে শিশু-সাহিত্য-শাখার সভাপতি পদে বরণ করেন ও আমাকে প্রধান বক্তার পদ দিয়ে সাহিত্য সম্মেলনে শিশু-সাহিত্য শাখার প্রবর্তন করেন। সেই অধিবেশনে আমার ভাষণে শিশু-সাহিত্য যে সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের চেয়ে কোনও অংশে হেয় নয়, বরং এর ক্ষেত্র আরও কত বড়ো, কতো জটিল তা বিশ্ব-শিশুসাহিত্যের গবেষণা-প্রসূত তথ্য ও সত্যগুলি দেখিয়ে প্রমাণ করি। শিশুসাহিত্যকে নতুন সম্মানের আসনে এই ভাবে প্রতিষ্ঠা করার যে-দাবী আমি জানাই, সেটির সমর্থন পাই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, দক্ষিণারঞ্জন প্রমুখ সার্থক স্রষ্টা ও গুণগ্রাহী

গুরুদের কাছ থেকে। শুধু তাই নয়, শিশু-সাহিত্যের বৈজ্ঞানিক বিচার-বিবেচনা ও গবেষণা—ইংলণ্ড, জার্মানী, আমেরিকা প্রভৃতি অগ্রসর দেশগুলিতে কিভাবে চলছে, তার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করে আমি যেটুকু লাভবান হয়েছি, তাও শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, দক্ষিণারঞ্জন প্রভৃতির গোচরে আনি। তাঁরা আমাকে আরও উৎসাহ দেন। তাঁদের সেই উৎসাহ ও প্রেরণাই এখনও আমার মধ্যে শিশুসাহিত্য সম্বন্ধে নিত্য নূতন জ্ঞান লাভের পিপাসা জাগিয়ে রেখেছে—আমি এখনো বিশ্ব-শিশু-সাহিত্য-গবেষণাগারের একজন ছাত্র মাত্র। বাঙলা শিশু-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এক হিসাবে আমি তরুণ লেখক মাত্র ; কারণ শ্রদ্ধেয় যামিনীকান্ত সোম, কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও শ্রদ্ধেয়া সুখলতা রাও প্রভৃতি প্রাচীন ও প্রবীন শিশু-সাহিত্য স্রষ্টারা বিদ্যমান রয়েছেন, এখনও তাঁরা সৃষ্টি করে চলেছেন। তাই আজ এই শিশু-সাহিত্য শাখা উদ্বোধন করার ভার আমার উপর ন্যস্ত হওয়ায় একান্ত সঙ্কোচ বোধ করছি। তবুও শিশু-সাহিত্য-ক্ষেত্রে আমার দীর্ঘ দিনের সঞ্চিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিবেদনের নির্দেশ ও আমন্ত্রণ যখন এই সাহিত্য সম্মেলনের প্রবীন ও শ্রদ্ধেয় সাহিত্য-সেবী উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, তখন সে আমন্ত্রণ শিরোধার্য না করে উপায় নেই। এই নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের আদি প্রতিষ্ঠান—প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের কর্ণধাররা ইতিপূর্বেও আমাকে বোম্বাই, কানপুর, ও দিল্লীর সর্বভারতীয় সাহিত্য সম্মেলনে তিন তিনবার শিশু-সাহিত্য শাখায় সভাপতির আসন দিয়ে যে একক সম্মানে ভূষিত করেছেন, তারই কৃতজ্ঞতা ও স্মরণ-গৌরবে আপনাদের সকলের সামনে দাঁড়িয়েছি। আগের সেই তিনটি সাহিত্য সম্মেলনে শিশু সাহিত্য শাখার সভাপতি হিসাবে ও অন্যান্য বহু সম্মেলনে আমি যে-সব তথ্য ও বক্তব্য নিবেদন করেছি—তার পুনরাবৃত্তি করবোনা। বহুজনে বহুভাবে তা করেছেন, হয়তো করবেনও। অর্থাৎ আমি (১) শিশু-সাহিত্যের ইতিহাস, (২) শিশু-সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি (৩) শিশুসাহিত্যে বাঞ্ছিত ও অবাঞ্ছিত কি? প্রভৃতি প্রসঙ্গ উত্থাপন না করে, সেই কথাগুলিই নিবেদন করবো, যেগুলি হয়তো এই অধিবেশনে উপস্থিত গুণীজ্ঞানী, সাহিত্যিক, শিশু-সাহিত্য-স্রষ্টা, শিশু-সাহিত্যের পাঠক ও প্রকাশকদের চেতনার দুয়ারে আঘাত হানবে। আশা করবো তার ফলেই শিশু-সাহিত্যের আরও নতুন নতুন সম্ভাবনার সিংহ-দুয়ার উদ্ঘাটিত হবে। উদ্বোধিত করবে সেই পরম কল্যাণ-শক্তিকে, যে-শক্তি বাঙলার শিশু-সাহিত্য লেখকের লেখাকে জগতের সাহিত্যে অমর করে রাখবে। বিপর্যস্ত বিমূঢ় বিশ্বের সমস্ত শিশুর চলন্ত প্রাণের তার ঝঙ্কৃত করে, তাদের মহত্তর মানুষ হয়ে ওঠবার ও সত্যকারের নিরাপত্তা

ও শান্তির পথে ঐক্যবদ্ধ জগত গড়ে তোলার শুভ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করবে।

আজ তাই নতুন করে বিশ্বের সকল শিশু-সাহিত্য লেখককে, বিশেষ করে সদ্য-স্বাধীন আমার দেশের লেখকদেরই এখন ভাবতে হবে, আমরা কী করে শিশু-সাহিত্যের মাধ্যমে ভাবীকালের মানুষ ও ভবিষ্যত জাতি—ছোট ছোট শিশুদের সবাইকে, মানুষের মহত্তর গুণগুলি আনন্দ ও আগ্রহের পরিবেশে চিনিয়ে ও শিখিয়ে দিতে পারবো। আগের দিনের মানুষ—আমাদের পিতৃ-পুরুষরা—মা ঠাকুবমাব মুখে গল্প শুনে, কথকতা যাত্রা গান শুনে, মানুষের মহৎ গুণগুলিকে যেমন ,সহজ ভাবে দেখতে পেতেন, যেমন সহজ ভাবে শিখতে পারতেন, আজ আমরা, আমাদেব বংশধববা আর তা পারি না। কারণ, সে-সব দেখাবার শেখাবার দায়িত্বগুলি ঘরের মানুষদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে পরের হাতে সঁপে দিয়েছে আধুনিক বিজ্ঞানেব যুগ। এযুগ দূবকে যেমন নিকট কবেছে, তেমন নিকটকেও দূব কবেছে। জন্মাবাব পব অধিকাংশ শিশুই আজকাল মা'র বুক পায় না। মা'র কাছে থাকাব সুখ পায না। হাসপাতালে নাড়ি কাটাব সঙ্গে সঙ্গে তার মায়েব সঙ্গেই আড়ি, মায়েব কাছ থেকে ছাড়াছাড়ি। মায়েব দুধের বদলে গাইয়েব দুধ খাবে, তাও জোটেনা, বোতলেব দুধ। যাদের তাও জোটে না, তাদের জন্য ববাদ্দ পাড়ার সঙ্ঘ সমিতির দেওয়া জলে-গোলা গুঁড়ো দুধ। বড় হয়ে মাযের মুখ থেকে গল্প ছড়া শুনে সে যে মনের ক্ষুধা মেটাবে, শিখবে জানবে—তারও উপায় নেই। আজকালতো আগের ঠাকুরমা দিদিমাদের নিয়ে মায়েরা ঘর করেন না। আধুনিকতার হাওয়া লেগে সবদেশেই ঘর-সংসার হয়ে দাঁড়িয়েছে কেবল মাত্র খাওয়া-দাওয়া, ঘুমোবার এবং কাপড়-চোপড় বদল করার আস্তানা। সহযোগিতা, দরদ ও মমতাবোধের আনন্দমুখর কেন্দ্র ছিল যে-ঘর-সংসার, তা আজ সর্বত্র লুপ্ত। মায়ের মধুর মাতৃসত্তা ও দায়-দায়িত্ব লোপ করে জগতের অধিকাংশ মা হয়েছেন বহির্মুখী। কেউবা হতে চাইছেন পুরুষের সমকক্ষ নারী মাত্রই।

বড় সংসার, যৌথ-পরিবার সব ভেঙ্গে গেছে, খানিকটা অর্থের কারণে, অনেকটা স্বার্থের কারণে। তাই ছোটদের গল্প ছড়া শোনাবার যে-কাজটা ছিল মায়েদের—সেটাই নিতান্ত দরদী হয়ে তুলে নিলেন শিশু-সাহিত্য স্রষ্টারা। যে-কাজটি তাঁরা নিলেন, তার দায়িত্ব যে কতখানি, সেটা কিন্তু সকলে বোঝেন নি। যাঁরা বুঝলেন, শিশু-সাহিত্য-স্রষ্টাদের মধ্যে যাঁরা মায়ের মন নিয়ে শিশু-সাহিত্য রচনা করলেন—তাঁদের সৃষ্টি যুগের পর যুগ পেরিয়ে যুগান্তরের শিশুকে মায়ের দরদই যুগিয়ে দিতে স্থায়ী হয়ে রইল। যেসব শিশু-সাহিত্য স্রষ্টা তা

পারলেন না, তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্য, প্রচারের ঢাক ঢোল পেটানো সত্ত্বেও স্থায়ী হলো না। বিশ্বের শিশু সাহিত্যে এবং আমাদের দেশের শিশু-সাহিত্যেও তার প্রমাণ যথেষ্ট আছে।

মা ছাড়া শিশু এবং বইকে এক করতে কে পারেন? এ কাজটি সহজ কাজ নয়। কেন? সে কথা বলেছেন Anne Thaxter Eaton তাঁর "Reading with Children" বইটিতে। It is not a simple task, this bringing children and books together. It means knowing children and knowing books so thoroughly, that we may help the dreamer to see the wonder and romance of the world about him, and the matter of fact child to enter the realm of imaginative literature.

মায়েদের মহান দায়িত্ব শিশু-সাহিত্য যে কতখানি নিয়েছে, সেটা বিদেশের মায়েরা স্বীকার করেন ও অনুভব করেন। আর সেইজন্যই মায়েদের সহায়-তাতেই ইউরোপ, রাশিয়া, আমেরিকায় শিশু-সাহিত্য এতখানি উন্নতি ও প্রসার লাভ করেছে। সেখানে মায়েরাই ছোটদের হাতে ছোটদের মনের মতো একাধিক বই কিনে এনে তুলে দেন। এদেশের অধিকাংশ ছোট্ট বন্ধুই মায়ের সঙ্গতো পায়ইনা, এমন কি যে-বয়সের ছেলেমেয়ের যে-বইটি মনের মতো সঙ্গী হতে পারে, তাও কেউ এনে দেননা। অনেকেরই সামর্থে কুলোয় না, তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মা-বাবার আগ্রহের অভাবেই সেটি ঘটে ওঠে না। মা বাবার সামর্থ ও আগ্রহের অভাব দেখেই, বাইশ বছর আগে দৈনিক সংবাদপত্র আনন্দ-বাজার পত্রিকাতে 'আনন্দমেলা' বিভাগ প্রকাশ করে অধিকাংশ ঘরেই শিশু-সাহিত্য-রূপী আই-মায়ের পরিচয়কে প্রসারিত করার চেষ্টা করি। ভারতীয় ভাষার সংবাদপত্রে সেই প্রথম প্রচেষ্টা। পরে অবশ্য তারই অনুকরণে সব প্রদেশে, সব ভাষার দৈনিকে, এমন কি সিনেমা সাপ্তাহিক ও মাসিক প্রভৃতিতেও ছোটেদের বিভাগ খোলা হয়েছে। তার ফলে বাঙলা শিশু-সাহিত্যের নতুন স্রোতের জোয়ারে শ্যাওলা ময়লাও প্রচুর ঢুকছে। তার জন্যে চিন্তিত বা দুঃখিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। সব দেশের শিশু-সাহিত্যেই এমনটা ঘটছে যে, তাও আমি ইউরোপ ভ্রমণের সময়ও বিভিন্ন দেশের শিশু-সাহিত্য-লেখক ও মায়েদের মুখ থেকেও শুনে এসেছি। তবে সে সব দেশের মায়েরা শ্যাওলা ময়লা ছেঁকেই শিশু-সাহিত্য বাছাই করে ঘরে নেন। এদেশের বাবা মায়েদেরও সে বিষয়ে হুঁশিয়ার হতে হবে।

সেই আবেদনই আজ জানাচ্ছি সকলের কাছে। এই প্রসঙ্গে জনৈকা মার্কিণ লেখিকা, শ্রীমতী Mary Ellen Chase তাঁর "Recipe for a Magic

Childhood" বইটির এক জায়গায় একটি অত্যন্ত মূল্যবান কথা বিশেষ জোরের সঙ্গেই বলেছেন। তিনি বলেছেন—"For there is no substitute for books in the life of a child ; and the first understanding of this simple and irrefutable truth must come from his early perception of this parents' faith in it." শিশুদের জীবনে বইয়ের স্থান দখল করতে পারে—এমন কিছুই নেই এবং এই অকাট্য সহজসত্যটির উপলব্ধি মা-বাবার বইয়ের প্রতি বিশ্বাস ও অনুরক্তির অনুভূতি থেকেই শিশুর একান্ত শৈশবজীবনে অবশ্যই আসা চাই। আমাদের দেশের মা-বাবাদের বইয়ের প্রতি অনুরক্তি ও বিশ্বাস কতখানি তা মা-বাবারা নিজেরাই বিচার করে দেখবেন।

তাঁদের অনুরক্তি ও বিশ্বাস বাড়াবার জন্যই আমি জানাতে চাই—অক্ষম ও অপটু লেখকদের মতলবী শিশু-সাহিত্যের আবর্জনা কিছু বেড়ে থাকলেও, গত বিশ বছরে বাংলা শিশু-সাহিত্য—নতুন নতুন ক্ষমতাশালী লেখকদের রচনা সম্পদে সমৃদ্ধ হয়েছে। বিশেষ করে ১৯৪০ সালের পর থেকেই—এদেশের শিশু-সাহিত্য ভাষা, রচনাশৈলী, শোভন ও মুদ্রণ ঐশ্বর্যে ধীরে ধীরে পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর শিশু-সাহিত্যের সমকক্ষ হয়ে উঠেছে। ১৯৪০ সালে আনন্দ-বাজার পত্রিকার পাতায় শিশু-সাহিত্যের এই নতুন যুগের সূচনা দেখেই বিশ্ব-কবি দু' সপ্তাহ পরে নিজে লিখে পাঠিয়েছিলেন—

"মূর্ত তোরা বসন্তকাল মানবলোকে
সদ্য-নবীন মাধুরীকে আনলি চোখে।'

বিশ্বকবির লেখনী নিঃসৃত 'সদ্য নবীন মাধুরী' শব্দটির মধ্যে যে-ইঙ্গিত ছিল, তারই মধ্যে শিশু-সাহিত্যের 'নূতন যুগ'কে দেখতে পেয়েছিলেন বাঙলার অমর শিশু-সাহিত্য-সম্রাট দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। ১৯৪২ সালে বারাণসীতে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম শিশু-সাহিত্য অধিবেশনের প্রথম সভাপতিরূপে এই নুতন যুগকে যে অভিনন্দন তিনি জানিয়ে গেছেন, আজ তা আপনাদের না শুনিয়ে পারছি না।

রূপকথার যাদুকর দক্ষিণারঞ্জন তাঁর আপন ভাষার মিষ্টি সুরে কুড়ি বছর আগে যা শুনিয়েছিলেন, তা আমার কানে এখনও বাজছে—এখনও আমাকে প্রেরণা যোগাচ্ছে। তিনি শোনালেন "শিশু-সাহিত্য সেই একটি আঙুল। যার যাদুর আদরস্পর্শ জগৎকে গলিয়ে গড়ে তুলতে পারে এবং সহস্র যুগের যাত্রা-পথে নিশ্চিত নির্দেশ দেয় তার উজ্জ্বল মৃত্যুহীন জাতির অসংখ্য সু-তরুণ, চঞ্চল, নন্দিত বীর যাত্রীকে।"

ঐ ভাষণেই, ১৯৪০ সালে শিশু-সাহিত্যের যে নতুন যুগের সূচনা, তাকে চতুর্থ যুগ বলে স্বাগত করে তিনি শোনালেন—

"চতুর্থ যুগ এসেছে তার বিপুল আয়োজন নিয়ে।....বিশ্বের সমুদয় আলাপ এনে শিশুদের অন্তরমূলে গুঞ্জিত করে তুলেছেন এ যুগের নিপুণ সাহিত্যিক। শিশুদের সঙ্গে মনোভাবের আদান-প্রদান দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতিদিনের শুষ্ক-সংবাদের সৃষ্টিকেও অবিসংবাদিতরূপে তাঁরা শিশুদের আত্মীয়তার মধুচক্রে পরিণত করেছেন। আশার আশ্চর্য আনন্দ শ্রাবণ। এঁরাও সেই আঙ্গুলকেই খুঁজে বের করেছেন—পাথর, কঙ্কর, কর্দম এবং ফুলের পাপড়ির ভিতর থেকে—নবীন যুগের পথ-চলার সঙ্কেত দিতে।"

শিশু-সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক দক্ষিণারঞ্জনের সেদিনের সেই আশার বোধন ব্যর্থ হয়নি। তার প্রমাণ—গত বিশ বছরের মধ্যে বাঙলা শিশু-সাহিত্যে বহু অভিনব, বৈচিত্র্যবিশিষ্ট-বিষয়বস্তুর সংযোজনা ঘটেছে—কবিতা ও গদ্যে সৃষ্টি হয়েছে নতুন রচনা শৈলী। প্রবর্তিত হয়েছে নূতন মুদ্রণ ও অলংকরণ পারিপাট্য। শিশু-সাহিত্যের লেখক ও প্রকাশকের সংখ্যাও আগের চেয়ে দশগুণ বেড়েছে। অথচ একশ্রেণীর মতলবী সমালোচকদের মুখ থেকে প্রায়ই উচ্চারিত হয়—এ যুগে শিশু-সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি কিছুই হয়নি। যাঁরা এমন কথা বলেন, তারা এ যুগের নবতম শিশু-সাহিত্যের সৃষ্টিগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়েও অ-পরিচয়ের ভাণ করেন। যাই হোক অল্প কথায় আমি নবীন ও প্রবীন লেখকদের লেখা আধুনিক বাঙলা শিশু-সাহিত্যের উল্লেখ না করে পারছি না।

শিশু-সাহিত্যের চতুর্থ যুগের নূতন দাবী মেটাতে, নূতন ধারাকে স্বীকৃতি দিতে, রবীন্দ্রনাথ নূতন শৈলীতে রচনা করলেন তাঁর 'ছেলেবেলা', 'গল্প-সল্প', প্রভৃতি নতুন বইগুলি। দক্ষিণারঞ্জন তাঁর বহু খ্যাত 'ঠাকুরমার ঝুলি'র রচনা-রীতি ছেড়ে নূতন রীতিতে রচনা করলেন তার 'চিরদিনের রূপকথা'র নূতন রূপকথাগুলি। রবীন্দ্রনাথ ও নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের কলম থেকেও বেরিয়ে এলো নূতন ভাষায় নূতন ভঙ্গীর একাধিক বই।

সাম্প্রতিক কালে, ১৯৫৭ সালে সুখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ঘনাদার গল্প' প্রকাশিত হয়, এবং রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পায়। প্রেমেন্দ্রবাবু ইতিপূর্বেও ছোটদের জন্য বহু বই লিখেছেন—কিন্তু সেগুলির সঙ্গে এই বইটির অনেক তফাৎ। এই বইটি নতুন যুগের নতুন ধারার সঙ্গে তাল রাখতেই নতুন বিষয়-বস্তু ও নতুন রচনা-শৈলীতে লেখা। মশা, মাছি, পোকামাকড়, কাচের টুকরা,

পাথরের নুড়ি প্রভৃতি অতি তুচ্ছ সব উপকরণকে কেন্দ্র করে প্রেমেন্দ্র মিত্র যে কাহিনী গড়েছেন—তা সত্যই অভিনব।

তরুণ লেখক স্বপন দাসের 'আলোর পালক' শিশুমনের কল্পনার বহুমুখী বিলাসের এক নিপুণ ছবি। সম্পূর্ণ নতুন বিষয়বস্তু—অভিনব ব্যঞ্জনা! স্বামী বিশ্বাত্মানন্দের লেখা 'বনের ডাক' ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হয়েছে—গাছপালার নাম, গুণাগুণ বর্ণনা করে গল্প বলতে বলতে গাছ নিয়ে রকমারি কাজ ও খেলা যেভাবে তিনি শিখিয়েছেন—তা পড়ে মুগ্ধ না হয়ে পারিনি। এই বইটি বাঙলা শিশু-সাহিত্যে বিজ্ঞানের একটি অসামান্য সংযোজনা।

'বুদ্ধু ভূতুম' ছদ্মনামে নির্মল চৌধুরী এবং শ্রদ্ধেয়া লীলা মজুমদার হাসির গল্পগুলি লিখে এই যুগেই শিশু-সাহিত্যের হাসির রাজত্বে অভিনব সম্পদ দান করেছেন। শ্রীযুক্তা মজুমদারের,—'পদিপিসির বর্মী বাক্স' ও 'আনন্দমেলা'র বিশেষ সংখ্যাগুলিতে তাঁর লেখা গল্পগুলির মৌলিকত্ব সত্যই প্রশংসনীয়।

অভিনবত্বের পরিচয়ে বাঙলা শিশু-সাহিত্যের অতি সাম্প্রতিক কালের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি—পরলোকগতা সরলাবালা সরকারের 'পিনকুর ডায়রী'। ৭০।৭৫ বছর আগের বাঙলা দেশের পটভূমিকায় তাঁর সরল স্মৃতিকথন ছোট বড়ো সকলেরই উপভোগ্য হয়েছে। গল্প, রূপক, রূপকথার ক্ষেত্রে—ত্রিভঙ্গ রায়, মনোজিৎ বসু এবং তরুণ লেখক শৈলেন ঘোষ যে মুন্সিয়ানার পরিচয় এযুগে দিয়েছেন—সেটি প্রত্যক্ষ উন্নতির পরিচায়ক।

বিষয়-বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রেও বাঙলা শিশু-সাহিত্যে বহু নূতন ও মূল্যবান সম্পদ আমরা পেয়েছি। ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত—'কিশোর চাষীর আপন কথা' লেখক অশোক ভাই। চাষের মূল কথাগুলি বইটিতে এমন সহজ ও সুন্দর করে বলা হয়েছে যে ছোট বড়ো সকলেই বইটি হাতে পেলে না-পড়ে পারেন না। 'পুতুল বুড়ি', পরিতোষকুমার চন্দ্র, ননীগোপাল চক্রবর্তীর রকমারী হাতের কাজ শেখানোর সরস রচনাও—বিষয়-বৈচিত্র্যের উজ্জ্বল উদাহরণ।

শিল্পী শৈল চক্রবর্তী বর্তমান যুগের শিশু-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ইংরেজী ও বাঙলা শিশু-সাহিত্য রচনায় তাঁর সমান দক্ষতা। তাঁর 'ছোটদের ক্রাফট' বিষয়-বৈচিত্র্যে বাঙলা শিশু-সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি 'কাজ-খেয়াল-খেলা' বইটিরই পরিপূরক। অধ্যাপক ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'শ্যামলা দিঘীর ঈশান কোণে'—বইটি আগাগোড়া কবিতায় লেখা একটি মিষ্টি গল্প—রঙিন ছবিতে সাজানো, বড় বড় অক্ষরে ছাপা এই ধরণের বই বাঙলা শিশু-সাহিত্যে এর আগে কোনোদিন ছিল না।

এই রকম সুন্দর সুন্দর আরও বহু বই বাঙলা শিশু-সাহিত্যে সংযোজিত হয়েছে।

শিশু-সাহিত্যের ছোটদের কবিতায় হাসি ও আনন্দের বাঁশী বাজিয়েছেন এই যুগেই, সুনির্মল বসু সবচেয়ে অভিনব সুরে। তাছাড়া, ছড়া কবিতারও যথেষ্ট রূপান্তর ঘটিয়েছেন—এযুগের শিশু-সাহিত্যের নতুন কবিরা, তার মধ্যে দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় গোবিন্দপ্রসাদ বসু, শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়, নির্মাল্য বসু, আশা দেবী ও দিব্যেন্দু পালিত প্রভৃতি নতুন ছন্দে, ভাববৈচিত্রে এবং বিষয়বস্তুর সরসতায় বাঙলা শিশু-সাহিত্যকে কবিতা-সম্পদেও সমৃদ্ধ করছেন। এঁদের অভিনন্দন জানাই।

ছোটদের ছড়া ও কবিতার বইয়ের মধ্যে 'উড়কি ধানের মুড়কি', 'ঝুন্-ঝুন্-ঝুন্ মিষ্টি ছড়া' আপন মৌলিকত্বে ভাস্বর। বাঙলা শিশু-সাহিত্যের বই গুলিকে মুদ্রণ ও অলংকরণ পরিপাট্যে উন্নততর করার প্রয়াসে অল্প বিস্তর সমস্ত প্রকাশকই সচেষ্ট হয়েছেন শিশু-সাহিত্যের এই চতুর্থ যুগেই। কাজেই এ যুগকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

মুদ্রণ ও অলংকরণের ক্ষেত্রেও এই চতুর্থ যুগে বহু চিত্র শিল্পী শিল্প প্রতিভায় বাঙলা শিশু-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রবীনদের মধ্যে শিল্পী প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, ধীরেন বল, শৈল চক্রবর্তী, সমর দে, সত্যজিৎ রায় ও নবীনদের মধ্যে শিল্পী কান্তি সেন, বিমল দাস, সুধীর মৈত্র, রঘুনাথ, রেবতীভূষণ, নারায়ণ দেবনাথ নতুন যুগের নতুন ধারায় অতুলনীয় চিত্র-সম্পদ সৃষ্টি করেছেন। আর সেই কারণেই অন্যান্য ভারতীয় ভাষার শিশু-সাহিত্য প্রচ্ছদ ও চিত্রের দিক থেকে এখনও অনেক পিছিয়ে আছে।

শিশু-সাহিত্যের ছবির বইগুলিকে যাঁরা মোহনীয় করে প্রকাশ করছেন তাঁদের সকলকেই আমার অভিনন্দন জানাই। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রণী হলেন 'শিশু-সাহিত্য সংসদ'— তাঁদের প্রকাশিত 'ছড়া-সঞ্চয়ন', 'চেঙা-বেঙা' সিরিজের তিনখানি বই এবং 'ছবিতে পৃথিবী', 'ছবিতে রামায়ণ', 'ছবিতে মহাভারত', 'নিজে পড়ো', প্রভৃতি বই যে কোনও বিদেশী শিশু-সাহিত্যের সমকক্ষ। চণ্ডীচরণ দাস এণ্ড সন্সের প্রকাশিত বইগুলিও একই পর্যায়ের চমকপ্রদ শিশু-সাহিত্যের বই। বর্তমান বাঙলা শিশু-সাহিত্যের ক্ষেত্রে সর্বাধিক বিক্রীত সৃষ্টি ও সেগুলির রচয়িতাদের উল্লেখযোগ্য অবদান ও জনপ্রিয়তার প্রসঙ্গ ইত্যাদি এই শাখার সভাপতির ভাষণে আমরা শুনতে পাবো আশা করেই আমি সে-প্রসঙ্গ উল্লেখ করছি না।

তবে শিশু-সাহিত্যের এতখানি উন্নতি ও প্রসার সত্ত্বেও বাঙলার শিশু-

সাহিত্যের নতুন প্রতিভাশালী লেখকরা যে-সব সমস্যার সম্মুখীন, সেগুলিরও কিছু কিছু ইঙ্গিত আমি না দিয়ে পারছি না। তরুণ প্রতিভাশালী লেখকদের রচনার গুণাগুণ ঠিকমতো বিচার করার উপযুক্ত সম্পাদক বা প্রকাশক আমাদের শিশু-সাহিত্য-ক্ষেত্রে এখনও অত্যন্ত কম। যে-কেউ সাহিত্য বা মনস্তত্ত্বের অভিজ্ঞতা ছাড়াই এদেশের শিশু পত্র-পত্রিকার সম্পাদক পরিচালক হয়ে বসতে পারেন। হয়তো এর কারণ সেই ইংরাজী প্রবাদ বাক্যটি—"Where Angels fear to tread, fools rush in". এই প্রসঙ্গে ১৯৪৬ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী আমেরিকার Saturday Review সাপ্তাহিকে শিশু-সাহিত্য-সম্পাদনা সম্বন্ধে "The warm uncritical years" নামে যে প্রবন্ধটি ছাপা হয়, এদেশের শিশু-সাহিত্য সম্পাদকদের সেটি পড়তে অনুরোধ জানাই। এই প্রবন্ধে বলা হয়েছে—More than any other editorial job in publishing the children's editor's is highly specializcd."

প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান বা পত্র-পত্রিকার শিশু-সাহিত্য সম্পাদককে কঠোর পরিশ্রমী, জ্ঞানান্বেষী এবং আনন্দময় কর্মী ও সেবক হতে হবে। বিভিন্ন পাঠাগার ও শিশুদের মিলন-কেন্দ্রগুলি হবে তাঁর গবেষণাগার, সেখানে গিয়ে দেখতে হবে, বুঝতে হবে কি ধরণের বই ও পত্র-পত্রিকার কোন কোন্ বিষয়গুলি ছোটরা কতখানি মন দিয়ে পড়ছে। এবং তার কি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তাদের মনে, সেটিও জেনে নিতে হবে তাদের সঙ্গে আলাপ করে, গল্প করে। আর সেগুলি লেখকদের গোচরে আনবার দায়িত্ব সম্পাদকেরই। নতুন ও অপরিচিত লেখকদের কাছ থেকে প্রতিভার পরিচয় পাওয়ার জন্য খোলা হৃদয়ে উন্মুখ হয়ে থাকতে হবে। লেখকদের খ্যাতি বা প্রতিষ্ঠা বিচার না করে, রচনাগুণের ওজনেই সমাদর ও প্রশংসা করতে হবে। এই আচরণ বোধের বদলে এদেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গোষ্ঠি-আনুগত্য ও ব্যক্তিগত পরিচিতির মাপকাঠিতে মেপে নতুন প্রতিভাসম্পন্ন লেখকদের অতি সামান্য-সংখ্যক লেখাই এদেশের বহুল প্রচারিত পত্র-পত্রিকাগুলিতে ছাপা হয়। ছাপলেও, অধিকাংশ শিশু-মাসিক সম্পাদক তাঁদের কোনও সম্মান দক্ষিণাও দেন না! শারদীয়া সংখ্যা বা শারদীয়া শিশু-বার্ষিকী প্রভৃতির বিশেষ সংখ্যাগুলিতে বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদক ও পরিচালক-মণ্ডলী, একদা-খ্যাত লেখক বা খ্যাতনামাদের নামের উচ্চ মূল্য দিয়ে অবহেলা-প্রসূত গতানুগতিক রচনা ছাপার মোহমুক্ত হতে পারেন নি এখনও। ফলে উদীয়মান তরুণ প্রতিভাদের প্রতি সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবিচারই চলছে। প্রকাশকদের কাছ থেকেও ঐ একই রীতির বিচার তাঁরা পান। এর প্রতিকার হওয়া একান্ত দরকার। কারণ স্বাধীন ভারতের এই নবীন প্রতিভারাই

বাঙলা শিশু-সাহিত্যের ক্ষেত্রে পূর্ণতর পঞ্চম যুগের সম্ভাবনা নিয়ে আসছেন যে, সে কথা স্বীকার ও অনুভব করার সময় এসেছে।

শিশু-সাহিত্যের আলোচনা সভা প্রতি শহরে ও গ্রামে গ্রামে সংগঠিত করে শিশু এবং তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ করে বিদেশের মতোই এদেশে শিশু-সাহিত্যেব সম্পর্কে মতামত ও সমালোচনা শুনতে হবে এবং তার থেকেই নিতে হবে এদেশের শিশু-সাহিত্যকে আরও উন্নত আরও কল্যাণপ্রসূ করার পথনির্দেশ। আমি ব্যক্তিগতভাবে সেই পথই অনুসরণ করে চলেছি, এবং আমার শিশু-সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে যদি কিছু সাফল্য লাভ করে থাকি—তা আমার পাঠকদের চিঠিপত্র এবং সমালোচনার ইঙ্গিতকে শিরোধার্য করেই পেয়েছি। আশা করি, আপনারাও আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, এদেশের সমালোচনার ক্ষেত্রও এখনও ঠিক ততখানি উদার, নিরপেক্ষ, ও সত্যাশ্রয়ী হয়ে ওঠেনি। সমালোচনার দায়িত্ব যেমন বিরাট তেমনই পবিত্র একথা ভুললে চলবে না। বিখ্যাত সমালোচক Thomas Hornby Ferril এবিষয়ে বড় সুন্দর কথা বলেছেন—"there are only two kinds of literature, the living and the unliving, and there are only two kinds of criticism, the enduring and fashionable". আমাদের দেশের সমালোচনা ঐ fashionable মাত্র। শুধু মাত্র সাহিত্য-সম্মেলন ও শিশু-সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিয়ে একই কথা বার বার আবৃত্তি করে আত্মপ্রসাদ লাভ করার যে-পথে আমরা চলেছি, তাতে সাহিত্য বা শিশু-সাহিত্যের উন্নতির ধারা ব্যাহত না হলেও প্রশংসা-যোগ্যদের প্রশংসা করতে না পারার হীনমন্যতায়—আমরা শিশুসাহিত্যের অগ্রণী লেখকরা ধর্ম ও আদর্শচ্যুত হচ্ছি, এ কথাই আমার মনে হয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অভিমান, দলগত অভিযান, রাজনৈতিক মতবাদের তরবারিতে শান দিয়ে আমরা যে সর্বনাশ ডেকে আনছি, তার অবসান ঘটানো একান্ত দরকার' এবং সেজন্য আগতযুগের শিশু-সাহিত্য সাধকদের এগিয়ে আসা দরকার। সঙঘবদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্ঘশুদ্ধ হয়ে মিলিত হওয়ার আহ্বানই আমি তাদের জানাচ্ছি।

আমরা বাঙলা শিশু-সাহিত্যের লেখকরা যদি সত্যকার মিলনসূত্রে ও ঐক্যে আবদ্ধ হয়ে কোনও যোগ্য, পরিশ্রমী সংগঠন-নিপুণ শিশু-সাহিত্য লেখকের নেতৃত্বে এই কার্যে ব্রতী হতে চেষ্টা করি, তাহলে আমরাও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় ও মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় বিধানচন্দ্র' রায়ের সহায়তায় অচিরেই এই কলকাতা শহরেই 'সর্ব-ভারতীয় শিশু-সাহিত্য আকাদেমী' গড়ে

তুলতে পারি। কারণ ১৯৫৭ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর আমন্ত্রণে যখন তাঁর গৃহে যাই—তখন দিল্লীতে ভারতীয় শিশু-সাহিত্যের এক প্রদর্শনীব আযোজন হয়। সেই প্রদর্শনীতে বাঙলা শিশু-সাহিত্যের সংখ্যাধিক্য ও পাবিপাট্য দেখে—তিনি এই ভাবতীয শিশু-সাহিত্য আকাদেমী প্রতিষ্ঠার ব্যাপাবে বাঙালীরাই অগ্রণী হতে পাবে একথা বলেন। তাছাড়া আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন যে, আমাদেব মুখ্যমন্ত্রী পবম শ্রদ্ধেয় বিধানচন্দ্র রায তাঁর অবসবের সময়ে—বাঙলা-শিশু-সাহিত্যেব বইগুলি বিশেষ আগ্রহ সহকাবে পড়েন। তিনিও যে শিশু মনেব ও বাঙলা শিশু-সাহিত্যেব উন্নতির অনেক খবব বাখেন, সে পবিচয আমি তাঁব মুখ থেকেই শুনেছি। উড়িষ্যার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মাননীয হবেকৃষ্ণ মহতাবও বাঙলা শিশু-সাহিত্যের এক অনুবাগী পাঠক। শুধু তাই নয, তিনি বাঙলাদেশেব শিশু-কিশোব সংগঠন ও শিশু-সাহিত্যের উন্নতিব ধারাটিকে কতখানি শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখেন, তার পবিচয বহু বার আমি পেয়েছি আলাপ আলোচনা ও পত্রাদির মাধ্যমে। শুধু তাই নয়, উড়িষ্যাব শিশু-সাহিত্য এবং শিশু-সংগঠনেব ক্ষেত্রে—তিনি বাঙলা-দেশেব ঐ ধাবাটিকেই অনুসরণ করাব ব্যবস্থা করেছেন। আপনাদের অবগতির জন্য জানাই যে, উড়িষ্যাই একমাত্র ভারতীয় রাজ্য, যেখানে উড়িষ্যা রাজ্য-সবকারের সহযোগিতায় 'ওড়িয়া শিশু-সাহিত্য-সমিতি' গঠন করা হয়েছে ১৯৫৮ সালে। ওড়িয়া শিশু-সাহিত্যের নামকরা তরুণ ও প্রবীন লেখক গোদাবরীশ মহাপাত্র, বীরকিশোর দাস, মহেন্দ্র পট্টনায়ক ও অধ্যাপক জানকী-বল্লভ মহান্তি প্রভৃতি এই শিশু-সাহিত্য সমিতির সদস্য ও প্রধান উদ্যোক্তা। এঁদের এই সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও রাজ্যসরকারের সহযোগিতার মাত্র তিনবছরের মধ্যে ওড়িয়া শিশু-সাহিত্যে নতুন সম্ভাবনার প্রকাশও ঘটেছে। সবচেয়ে আনন্দের কথা, নবীন লেখক উদয়নাথ ষড়াঙ্গী তাঁর 'কুটুকুটু' বইটিব জন্য ১৯৫৭-৫৮ সালেব এবং গোদাবরীশ মিশ্র তাঁব লেখা 'মো-খেলাসাথী' বইটির জন্য ১৯৫৮-৫৯ সালের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছেন। কেরল রাজ্যও ভারতীয় শিশু-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। সেটি হলো, কালিকটে কেরলের মালয়ালম ভাষার শিশু-সাহিত্য লেখকদের মিলিত উদ্যোগে একটি Co-operative Publishing House প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—তাঁরা ইতিমধ্যে মালয়ালম শিশু-সাহিত্যকে বৈচিত্র ও শোভন সম্পদে অনেকখানি উন্নত করে তুলেছেন, প্রকাশকদের বঞ্চনা ও অবহেলার কবল থেকে শিশু-সাহিত্যের উদীয়মান লেখকদের মুক্ত করেছেন। মালয়ালম ভাষার শিশু-সাহিত্যে M. M. Kuzhiavali 'বালন পাব্লিকেশনে'র পক্ষ থেকে বহু

উদীয়মান প্রতিভাকে দিয়ে নতুন নতুন ভালো বই লিখিয়ে প্রকাশ করেছেন, এবং তিনি নিজেও প্রায় ৬০ খানি শিশু-সাহিত্যের বই লিখেছেন।

ভারতের অন্যান্য সব রাজ্যেও এখন শিশু-সাহিত্যকে উন্নত করার জন্য লেখকরা ঐক্যবদ্ধ এবং সংহত হয়েছেন। রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারও কিছু কিছু সাহায্য করছেন, এটা খুবই সুলক্ষণ। তবে ভারতীয় শিশু-সাহিত্যের সামগ্রিক উন্নতির পথ ততক্ষণ সম্পূর্ণ বাধামুক্ত হবে না, যতক্ষণ না এদেশের আর্থিক অবস্থা ও সমাজ-ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে ভাবী জাতির মন থেকে বিশৃঙ্খলা ও উদ্যমহীন হতাশার ভাব দূর করা সম্ভব হচ্ছে; যতক্ষণ না ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে ভাবগত বিরোধ-স্বষ্টির পথগুলিকে আমরা রোধ করতে পারবো।

সাহিত্য এবং বিশেষ করে শিশু-সাহিত্যের মাধ্যমেই ভিন্ন ভাষাভাষী, ভিন্ন রাজ্যবাসীদের ভাবগত ঐক্য ও জাতীয় সংহতি সুগঠিত হতে পারে বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তবে এর জন্য সুচিন্তিত পরিকল্পনা নিয়ে ভারতীয় শিশু-সাহিত্য আকাদেমী গড়ে বিভিন্ন ভাষার সার্থক সাহিত্য-স্রষ্টাদের বইগুলি পরস্পরের ভাষায় অনুবাদ করাতে হবে এবং সেগুলি সকল রাজ্যের পাঠাগারের মাধ্যমে শিশু কিশোরদের হাতে তুলে দিতে হবে। শুধু তাই নয়, বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন বেতার-কেন্দ্রের শিশু-বিভাগগুলির পরিচালকরা যে ভাবে খেয়াল-খুশি মাফিক চলছেন, সেভাবে তাঁদের চলতে না দিয়ে, তাঁদের চালানো উচিত চিন্তাশীল শিক্ষাবিদ, শিশু মনস্তত্ত্ববিদ ও শিশু-সাহিত্য লেখকদের নিয়ে গঠিত এক পরামর্শ সমিতির পরামর্শ অনুযায়ী। অন্যান্য দেশে আমি সেই ব্যবস্থাই দেখে এসেছি। B.B.C. তে ও আমেরিকায় বেতারের শিশু-বিভাগে এবং স্কুল প্রোগ্রামের মাধ্যমে সমসাময়িক শিশু-সাহিত্যের নূতন নূতন স্বষ্টিগুলির সঙ্গে দেশের শিশুদের পরিচয় ঘটানো হয়। ১৯৬১ সালের ১৯মে'র Times Literary Supplement এ এক সাংবাদিক এ সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তা হচ্ছে—

"The B.B.C. School programmes and children's corner do excellent work in introducing present day poetry and fiction to children. When this lead is followed up by conscientious teachers and parents the child is fortunate". তিনি আরও বলেছেন : "If we want our children to be able to appreciate the true thing, we must be prepared to give time to leading them to it."

আমাদের কলকাতা বেতার-কেন্দ্র School programme বা ছোটদের আসরে 'গল্পদাদু' ও দাদুমণি নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ যে ঐতিহ্য স্বষ্টি করেছিলেন

তার ধারক হিসাবেই আমি এবং আমার সমসাময়িক অনেকেই শিশু-সাহিত্যের চিন্তা ও সৃষ্টির প্রেবণা পেয়েছি, একথা অনেকেই স্বীকার করবেন। কিন্তু স্বাধীন ভারতে সেই বেতাব-কেন্দ্রেবই শিশুমহল, গল্পদাদুর আসবকে আজ কোন পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়েছে—সে বিচার আপনারাই করবেন, এবং আমি আশা কবি এই সম্মেলন এক প্রস্তাব গ্রহণ কবে কেন্দ্রীয় সরকার ও বেতাব দপ্তরেব মন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুত কেশকাবেব দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। শিশু-সাহিত্যেব উন্নতির ক্ষেত্রে সেটি হবে আপনাদের একটি সার্থক কাজ।

আবও একটি কাজ আপনাদের করতে হবে। রুশ প্রভৃতি দেশ থেকে বাঙলা ভাষায় সে দেশেব শিশু-সাহিত্য অনুবাদ ও আমদানী কবে এদেশে সস্তা দামে বিক্রয়েব ব্যবস্থায় এদেশের শিশু-সাহিত্য ও শিশু-সাহিত্য লেখকদেব সর্বনাশ ও ভাবীজাতির মনের যে ক্ষতি করা হচ্ছে, তা বন্ধ করার জন্য কেন্দ্রীয সরকারের কাছে দাবী জানাতেই হবে। এ ব্যাপারে এ দেশেব প্রকাশক, লেখকদের নিষ্ক্রিয়তা দেখে আমি ব্যথিত, কারণ আমার মনে হয়, বাঙলা দেশের ফুটপাথে, দোকানে, ট্রেণে মাত্র তিন আনা, চাব আনা দামে যে-সমস্ত বই বিক্রয়ের যে ব্যবস্থা—তা হয়তো শুধু বিদেশের রাজনৈতিক চক্রান্তেই হচ্ছে না। করা হচ্ছে এদেশেরই তেমন উৎসাহী একদল চক্রান্তকারীর ষড়যন্ত্রে, যারা দ্রুত উন্নতশীল বাঙলা শিশু-সাহিত্যের গলা টিপে মারতে চান। কাবণ বাঙলা ভাষা ছাড়া অন্যান্য ভারতীয় ভাষায়তো এতো বেশি রুশ ও অন্যান্য দেশেব অনুবাদ পথে ঘাটে বিকোতে আমি কোথাও দেখিনি। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারেব প্রধান মন্ত্রী মাননীয় জওহরলাল নেহেরু ও শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর শ্রীমালিব দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ ব্যবস্থা অচিরেই বন্ধ করা উচিত। তবে সেই বইগুলিব মূল্যমান বাঙলা শিশু-সাহিত্যের ঐ একই পর্যায়ের বইযের সমান করে যদি বিক্রয় করা হয়, তাতে কিছুমাত্র আপত্তি নেই। বিদেশের সাহিত্যের অনুবাদ, তা সে মার্কিণ, রুশ বা জাপান, চীন যে কোনও দেশেব বই হোক না কেন—অসমপ্রতিযোগিতার ক্ষেত্র সৃষ্টি করার চেষ্টা না কবলে তাদের আমরা নির্ভয়ে ও সাদরেই গ্রহণ করবো, কারণ বাঙলা শিশু-সাহিত্য আজ ঐ-সব উন্নত ও ক্ষমতাদর্পী দেশগুলির শিশু-সাহিত্যের চেয়ে কোনও অংশে হেয় নয়—বরং শ্রেয়ই।

ভাষণ শেষ করার আগে জানাই—বাঙলা শিশু-সাহিত্যের উন্নতি ও অগ্রগতির এই যুগে আমরা গত কয়েকবছরের মধ্যে আমাদের মধ্য থেকে হারিয়েছি শিশুর জগতের শ্রেষ্ঠ যাদুকর কবি রবীন্দ্রনাথকে, শিশু-সাহিত্য ও শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ, শিশু-সাহিত্য সম্রাট দক্ষিণারঞ্জনকে। শিশু-সাহিত্যের

আসর খালি করে অকালে অমরলোকে যাত্রা করেছেন শিশু-দরদী কবি সুনির্মল বসু, ফটিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রভাতকিরণ বসু প্রভৃতি বন্ধু ও অগ্রজরা। তাঁদের সাহচর্য, পরামর্শ ও স্নেহ হারিয়ে আমরা সত্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি, তবে সে-ক্ষতি পূরণ করতে পারি, আমরা তাঁদের সাধনার উত্তর-সাধক হয়ে। আজ তাঁদের আশীর্বাদ কামনা করে, তাঁদের নির্দেশকে পাথেয় করে, পরম শ্রদ্ধায় এই অধিবেশনের উদ্বোধন করি। শুভেচ্ছা ও প্রীতির সঙ্গে স্বাগত জানাই এই শাখার সভাপতি বন্ধুবর শ্রীযুত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে। সেই সঙ্গে প্রণাম করি শিশু ভোলানাথ এবং অতীত ও বর্তমানের যে-সব সাহিত্যস্রষ্টা এবং প্রকাশক বাঙলা শিশু-সাহিত্যকে এই গৌরবের যুগে সার্থকভাবে বহন করে এনেছে। প্রণাম করি শিশু-সাহিত্যের পঞ্চম যুগের বোধনে যাঁরা বসেছেন তাঁদের। প্রণাম করি আপনাদের সকলকে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

শিশুসাহিত্য শাখার সভাপতির ভাষণ

পরিচিতি :
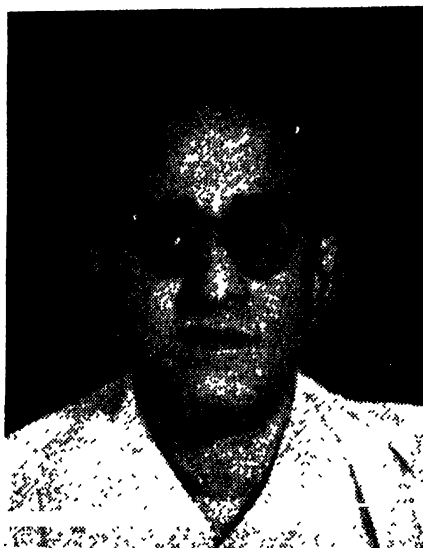
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

১৯১৮ সালে দিনাজপুর জেলার বালিয়াডাঙ্গি গ্রামে এঁর জন্ম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যে এম, এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন এবং পরে ডি, ফিল্ উপাধি লাভ করেন। বর্তমানে ইনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। এঁর প্রথম রচনা শিশু পত্রিকা 'মাস পয়লা'য় প্রকাশিত হয় দশ বছর বয়সে। দেশ, বিচিত্রা, শনিবারের চিঠি ও আনন্দবাজার পত্রিকায় এঁর সাহিত্য জীবনের বিকাশ হয়। ১৯৪৩ সালে 'উপনিবেশ' প্রকাশিত হয়ে এঁর পরিচিতি আনে। এঁর বইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য— সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী, শিলালিপি, লাল মাটি, পদসঞ্চার, ভস্ম পুতুল, বৈতালিক, শ্রেষ্ঠ গল্প, স্ব-নির্বাচিত গল্প, সাপের মাথার মণি, শুভক্ষণ ও সাহিত্যে ছোটগল্প।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

শিশুসাহিত্য শাখার সভাপতির ভাষণ

শিশুসাহিত্য শাখাব মূল ভাষণ দেবার দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ কবে আপনারা যে সম্মান আমাকে দিয়েছেন, তা অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গেই আমাকে গ্রহণ করতে হয়েছে। চিরাচরিত বিনয়ের প্রশ্ন নয়, বাংলা দেশে যে সমস্ত নিষ্ঠাবান সুপ্রতিষ্ঠিত শিশু-সাহিত্যিকেরা রয়েছেন, তাঁদের তুলনায় ছোটদেব জন্য আমার রচনা গুণে ও পরিমাণে নগণ্য। বয়স্ক-সাহিত্যের অধ্যাপনা এবং কিছু কিছু সাধনাই আমার পেশা ও নেশা। সুতরাং অনধিকার চর্চার সংকোচ থেকে নিজেকে কিছুতেই মুক্ত করতে পারছি না।

তবু আপনাদের সামনে সামান্য কিছু বক্তব্য নিবেদন করবার দায়িত্ব আমারও আছে। দুটো কারণে। প্রথমতঃ ছোটদের জন্য কিছু কিছু লিখে থাকি ; দ্বিতীয়তঃ শিশু-সাহিত্যের যারা পাঠক, তাদের অভিভাবকদের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলের হয়ে—দু-একটা কথা আমিও বলতে পারি। আমার আলোচনার গণ্ডী এর বেশী নয়।

আপনারা সকলেই জানেন, বাংলা দেশে শিশু-সাহিত্যের সার্থক বিকাশ ঘটেছিল জাতীয় জীবনের এক আশ্চর্য সন্ধিলগ্নে। বিদ্যালয়গত শিক্ষার সঙ্গে শৃঙ্খলিত শিশু-সাহিত্য প্রথম মুক্তির স্বাদ পেলো কয়েকটি পত্রিকার সাহায্যে—তারা হ'ল কেশবচন্দ্র সেনের 'বালক বন্ধু', প্রমদাচরণ সেনের 'সখা', জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর 'বালক' এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মুকুল'। এই পত্র-পত্রিকাগুলিই শিশু-সাহিত্যের অসীম সম্ভাবনাকে সূচিত করে তুলল। এদেরই বক্ষপুট থেকে ক্রমে ক্রমে বেরিয়ে এল একটির পর একটি অবিস্মরণীয় নাম : উপেন্দ্র-কিশোর রায় চৌধুরী, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তারপর আবির্ভূত হল উপেন্দ্রকিশোরের 'সন্দেশ'—তা থেকে বিকশিত হলেন সুকমার রায়চৌধুরী। ক্রমে ক্রমে দেখা দিলেন দক্ষিণা-রঞ্জন মিত্র মজুমদার, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সুনির্মল বসু এবং আরো অনেকে। তালিকা শুনিয়ে লাভ নেই, আপনারা সকলেই সে-সমস্ত নামের সঙ্গে সুপরিচিত।

যেটি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য, বাংলা শিশু-সাহিত্যের বীজ বপণ করা হয়েছিল দেশপ্রেম এবং জাতীয় চরিত্র গঠনের এক ঐতিহাসিক অধ্যায়ে।

সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা-আন্দোলন, জাতীয়তাবোধের বিস্তার বাংলা দেশব্যাপী এক বিপুল কর্মোন্মাদনা—এই পটভূমিতেই শিশুযোগ্য বিশেষ সাহিত্যকে গড়ে তোলবার কর্তব্যভার গ্রহণ করেছিলেন দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বজ্রগর্জন তখন ধ্বনিত হচ্ছে ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে, ভার্ণাকুলার প্রেস অ্যাক্ট এবং পুণার প্লেগ-অ্যাক্টের প্রতিবাদে দেশবাসীর মন তখন ঘৃণায় জর্জরিত; 'নীল দর্পণে'র ঘটনা তখনো সুদূর নয়। আকাশে তখন জাতীয় কংগ্রেসের অরুণরাগ। এই পরিবেশের ভেতরে যাঁরা শিশু-সাহিত্য রচনার এবং পত্র-পত্রিকা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নিয়েছিলেন, তাঁরা মাত্র শিশু রঞ্জনকেই তাঁদের একমাত্র বরণীয় বলে মনে করতে পারেন নি। আজকের বাংলা দেশে সুধী এবং প্রৌঢ়েরা শিশু-সাহিত্যকে সম্ভবতঃ সন্দেহ অনুকম্পার দৃষ্টি দিয়েই দেখে থাকেন; কিন্তু সেদিন প্রতিটি শ্রদ্ধেয় বাঙালী জাতীয় আন্দোলনের পরিপূরকরূপে শিশু-সাহিত্য সংগঠনের পুণ্যব্রত গ্রহণ করেছিলেন। তাই শিশু পত্রের সম্পাদনা করেছেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও আচার্য শিবনাথের মতো ব্যক্তিত্ব—সেই কারণেই, শিশু-সাহিত্যে কলম ধরেছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, কৃষ্ণকুমার মিত্র, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সখারাম গণেশচন্দ্র দেউস্কর, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং স্বয়ং রমেশচন্দ্র দত্ত। কিন্তু তাই বলে শিশু-সাহিত্যকে তাঁরা পাণ্ডিত্যের বিভীষিকায় পরিকীর্ণ করে তোলেন নি। রাজপুত-শিখ মারাঠার বীরত্ব-কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে শিশুমনকে আনন্দের আস্বাদ দিয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'শিশু'র কবিতাগুলি, শিবনাথ শাস্ত্রীর মতো গভীর গম্ভীর মানুষ ছোটদের জন্য কবিতা লিখেছেন, বিপিনচন্দ্র পালও শিশু-কবিতার চর্চা করে গেছেন। যা একাধারে শক্তি এবং সুস্বাদ বহন করে, তা-ই যে যথার্থ শিশু-সাহিত্য প্রাচীন বাঙালীরা এই মৌলিক সত্যটিকে কোনোদিন বিস্মৃত হয় নি; উনিশ শতাব্দীর শিশু-পত্রিকায় হাসির গল্প আছে, কিন্তু ভূতের সন্ধান মেলে না; বিজ্ঞানের কথা আছে, কিন্তু অবৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানকল্প কোনো ফ্যাণ্টাসির অবকাশ নেই। আজ লজ্জিত চিত্তে এই আত্ম-সমালোচনাটুকু আমাদের স্মরণীয় যে বিগতযুগের ঐতিহ্য বর্তমান শিশু-সাহিত্যে আমরা রক্ষা করতে পারি নি; ছবিতে, ছাপায় অথবা বইয়ের প্রাচুর্যে আমরা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছি, কিন্তু নিষ্ঠাবান প্রতিভাদীপ্ত শিশু-সাহিত্যিকের সংখ্যা আজ গর্বভরে গণনীয় নয়। কয়েকজন অবশ্যই আছেন—ছোটদের প্রতি অন্তরের অসীম মমতাবশত যাঁরা বয়স্ক-সাহিত্যের বৃহত্তর খ্যাতি ও অর্থের প্রলোভন ত্যাগ করে শিশু-সাহিত্যের সাধনা করে চলেছেন নিঃশব্দে। তাঁদের শ্রদ্ধা জানিয়েই বলি, বাংলা শিশু-সাহিত্যে আজ আরো নতুন নতুন প্রতিভার প্রয়োজন আছে।

অবশ্য, বাধাও কম নেই। পৃথিবীর কথা জানি না, কিন্তু আমাদের দেশে শিশু-সাহিত্য সেবা প্রায় 'গীতা'র ফলাফলহীন কর্মযোগের মতো। কখনো কখনো নামমাত্র মূল্যে কপিরাইট বিক্রী, কখনো বা সর্বগ্রাসী প্রকাশকের বেতনভুক লেখকত্ব, কখনো যৎসামান্য রয়্যালটি—যা সংগ্রহ করতে প্রাণান্ত অধ্যবসায় দরকার; পত্র-পত্রিকায় লিখলে পারিশ্রমিক দাবি করা ঔদ্ধত্য—বিশেষ সংখ্যা থেকে হয়তো নগণ্য কিছু অর্থমূল্য পাওয়া যায়। শতাধিক বই লিখেছেন, তাদের অনেকগুলিই প্রচুর পরিমাণে প্রচারিত, তবু অন্নকষ্টের হাত থেকে পরিত্রাণ পাননি এমন দুর্ভাগা শিশু-সাহিত্যিক হযতো আজকের সভাতেই উপস্থিত আছেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি। নামকরা প্রকাশক উপযাচক হযে বই ছেপেছেন এবং বছরের শেষে প্রথম মুদ্রণ নিঃশেষিত হলে যে হিসেব তাঁরা লেখককে পাঠিয়েছেন তাতে দেখা গেছে লেখকের একটি পয়সা প্রাপ্তি তো ঘটেই নি—বরং প্রথম মুদ্রণের ক্ষতি বাবদ তাঁরা লেখকের কাছে ত্রিশটাকা ছ' আনার দাবি জানিয়েছেন। এ-ধরণের কল্পনাতীত প্রবঞ্চনা মাত্র শিশু-সাহিত্যিকের ভাগ্যেই সম্ভব। সৎ এবং সুহৃদয় শিশু-সাহিত্য প্রকাশকের প্রতি অবশ্যই কোনো কটাক্ষ করছি না, কিন্তু জ্ঞান-বৃক্ষের এই অপূর্ব ফলটি আমাকেই একদা আস্বাদ করতে হয়েছিল। এই ধরণের চরিতার্থতা লাভ করেও যাঁরা শিশু-সাহিত্যের আরাধনাই জীবনের একমাত্র ব্রত করে নিয়েছেন—তাঁদের অতি মানব বললে অত্যুক্তি হয় না। বলাই বাহুল্য, এই সব দৃষ্টান্ত শক্তিমান লেখককে শিশু-সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট করে না। বয়স্ক-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে যাঁরা শিশু-সাহিত্যের চর্চা করেন, তাঁরা প্রায়শঃ তা অবসর বিনোদনের জন্যেই করেন। কিন্তু আবসরিক সাহিত্য মহৎ সাহিত্যের গৌরব রক্ষা করতে পারে না, তা অবনীন্দ্রনাথ-উপেন্দ্রকিশোর-যোগীন্দ্রনাথ-সুকুমার রায়-দক্ষিণারঞ্জন-হেমেন্দ্রকুমার রায়-সুনির্ম্মল বসুর উত্তরাধিকারবহ হয়ে উঠতে পারে না। উপভোগ্য রচনা কিছু কিছু মেলে, কিন্তু 'ক্ষীরের পুতুল', 'রাজ কাহিনী', 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'যকের ধন' কিংবা 'আবোল-তাবোল' সৃষ্টি হতে চায় না।

বাধা আরো আছে—সেটি মনস্তাত্ত্বিক এবং মর্যাদাগতও বটে। শিশু-সাহিত্যিকদের একটি প্রতিষ্ঠান অথবা কিঞ্চিৎ সরকারী দাক্ষিণ্য শিশুপ্রাণ লেখকদের কখনো কখনো কিছু সম্মান অর্পণ করলেও সমগ্রভাবে সাহিত্যের আসরে তাঁরা উপেক্ষিত—তাঁরা হরিজন। শিশুদের মতোই তাঁরা করুণার পাত্র। বাংলা সাহিত্যের অনেকগুলি ইতিহাসই তো লেখা হয়েছে, কিন্তু এ প্রশ্ন কি করা যায় না, যে আমাদের যে শিশু-সাহিত্য কেশবচন্দ্র সেন-রবীন্দ্রনাথ-

শিবনাথ শাস্ত্রীর সাধনায় বিকশিত ও বিবর্তিত হয়েছে—বয়সের দিক থেকে যা একশো বছরেরও বেশী প্রাচীন, বহু শ্রেষ্ঠ প্রতিভা যাকে অবলম্বন করে অমর-কীর্তির স্বাক্ষর রেখেছেন, যা আজকের অগণিত কীর্তিমান বাঙালীর বুদ্ধি ও চরিত্র গঠনের আনুকূল্য করেছে, তার সম্পর্কে একটি অধ্যায়ও কেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখকেরা যোজনা করেন নি? আমার হাতের কাছেই ম্যাক্‌মিলান প্রকাশিত আমেরিকান সাহিত্যের যে ইতিহাসখানি রয়েছে, তাতে সুদীর্ঘ ও সশ্রদ্ধ শিশু সাহিত্যের আলোচনা ও পরিচিতি দেখতে পাচ্চি। আমাদের দেশে এই উপেক্ষা কেন? ফ্রান্স সগৌরবে লা ফঁতেনের পরিচয় দেয়; হ্যান্স এণ্ডারসনের জন্ম-জয়ন্তী তাই দেশের সীমা পার হয়ে সারা ইয়োরোপের জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়; ইভান ক্রাইলভ সম্পর্কে রুষ দেশের মানুষ গর্বভরে বলে, "If you want to understand our people read Krilov"; লণ্ডনের হাইড পার্কে জেমস্‌ ব্যারীর 'পিটার প্যানে'র মূর্তি বিদ্রোহী নবীন বীরের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে; আমেরিকায় মার্ক টোয়াইনের শিশু-সাহিত্যকে চিরস্থায়ী গৌরবে সম্মানিত করা হয়; কিংসলি, লুইয়া এম অ্যালকট, কার্লো লরেনৎসিনি, লুই ক্যারল কিংবা সুসান কুলিজের নাম সাহিত্যের ইতিহাসে জ্বল জ্বল করে। কিন্তু এই ছবি কি আমাদের দেশে পাই? কলকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠান কি দক্ষিণারঞ্জনের একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠার কল্পনা করতে পারেন, গড়তে পারেন একটি 'সুকুমার রায় শিশু উদ্যান'?

দৈন্য এবং অবহেলার এই গ্লানি বহন করেও বাংলা দেশে শিশু-সাহিত্যের ধারা এখনো প্রবল প্রাণস্রোতে বয়ে চলেছে; কিন্তু তার পেছনে যাঁদের নিঃশব্দ সাধনা বিদ্যমান, তাঁদের আত্মত্যাগের পরিমাপ করা যায় না; যে সমস্ত সৎ প্রকাশক বহু অর্থ ক্ষতি স্বীকার করেও ছবিতে ছাপায় প্রতি মাসে শিশু-সাহিত্যের মনোরম উপচার সাজিয়ে দিচ্চেন, তাঁরা অশেষ ধন্যবাদ ভাজন। কিন্তু চির-কাল এভাবে চলতেই পারে না। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে হোক অথবা জন-সাধারণের সজাগ সহানুভূতির দ্বারাই হোক—অর্থ এবং মর্যাদার দ্বারা শিশু-সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের উপযুক্ত প্রতিষ্ঠা দান করা আমাদের জাতীয় কর্তব্য। কী উপায়ে এ কাজ করা সম্ভব, আমাদের সভায় সমবেত সুধী শ্রোতারাই তা নির্ধারণ করুন। সাহিত্য-সাধনায় অন্ন-সংস্থান হয় না—বাংলা দেশে এ-কথা আজ অশ্রদ্ধেয়; বাড়ী-গাড়ীর সৌভাগ্যও যে লাভ হতে পারে সে দৃষ্টান্তও বিরল নয়। উপেক্ষা এবং দীনতার ভার কি কেবল শিশু-সাহিত্যিকদের জন্যই আজ সঞ্চিত থাকবে?

এইখানে একটা মৌলিক প্রশ্ন মনে আসছে। সাহিত্যের বিচারে শিশু-

পাঠ্য বইগুলো কোনো উচ্চাঙ্গের শিল্পকৃতির পরিচয় বহন করে না বলেই কি সে অপেক্ষাকৃত অপাংক্তেয়? কিন্তু একথা কখনোই সত্য হতে পারে না। সাহিত্য বলতে যে রসোত্তীর্ণ শিল্পবস্তুকে বুঝি, তা শিশুর কল্পনা অথবা বয়স্কের জটিল মনস্তত্ত্ব—যাকেই আশ্রয় করুক, সেইখানেই সে স্বয়ংসিদ্ধ। প্রসঙ্গত একজন বাঙালী লেখিকার রচনা থেকে কিছু উদ্ধৃত করছি:

"যথার্থ শিশু-সাহিত্য বলিতে বুঝিব, যারা সর্ব বয়সের নরনারীর কাছেই একটি রসাস্বাদ আনিয়া দেয়; বয়সের পার্থক্য অনুসারে আস্বাদনের ব্যাপারে কিছু বিভিন্নতা ঘটিতে পারে কিন্তু সর্বস্তরের মানুষকে আনন্দদান করিবার মতো শিল্পগুণ তাহাতে থাকিবেই।" এবং "আসল কথা হইল, যাহা আদৌ সাহিত্য নয়, তাহা শিশু-সাহিত্যও নয়। শিশুদের জন্য যিনি লিখিবেন, তাঁহাকে প্রথমতঃ সাহিত্যিক হইতে হইবে; এবং তাঁহার হাত হইতে যাহা সৃষ্টিলাভ করিবে তাহার নায়ক-নায়িকা শিশু হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে নিত্য-সাহিত্যের রসই সঞ্চিত থাকিবে।" এই লেখিকা আরো বলেছেন, "তাই ছেলেবেলায় এলিসের কাহিনী যে রোমাঞ্চ জাগায়, বার্ধক্যে তাহা আরো গভীর আনন্দ বহন করিয়া আনে। শিশু-মন হ্যান্স অ্যাণ্ডারসনের রূপকথা পড়িয়া জীবনের সরোবরে আলোর খেলা দেখে, প্রৌঢ়ত্বে সেই মন তাহার গম্ভীর গভীরতায় মগ্ন হয়।" (বাংলা শিশু-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ)

এ থেকে দেখা যাচ্ছে যা খাঁটি শিশু-সাহিত্য, তা মাত্র রঙিন একটি খেলনার মতো শিশুচিত্ত তোষণের সাময়িক উপকরণই নয়; যে পদ্মটির উপর সরস্বতীর আসন, শিশু-সাহিত্যও তারই একটি অম্লান দল—বরং অনেকের চাইতে শুভ্রতর এবং পবিত্রতর। এই পবিত্রতার কথা স্মরণ রেখেই রবীন্দ্রনাথ যে সতর্ক বাণীটি উচ্চারণ করেছিলেন, সেটিও এখানে প্রণিধানযোগ্য: "সাহিত্য-রচনায় গুণী-লেখনীর সতর্কতা যদি না থাকে, যদি সে রচনা বিনা লজ্জায় অকিঞ্চিৎকর হয়ে ওঠে, তবে সেটা অস্বাস্থ্যকর হবেই, বিশেষতঃ ছেলেদের পাকযন্ত্রের পক্ষে। দুধের বদলে পিঠুলিখোলা যদি ব্যবসার খাতিরে চালাতেই হয় তবে সে ফাঁকি বরং চালানো যেতে পারে বয়স্কদের পাত্রে, তাতে তাদের রুচির পরীক্ষা হবে; কিন্তু ছেলেদের ভাগে নৈব নৈব চ।"

তা হলে শিশু-সাহিত্যের ভূমিকা এবং দায়িত্ব যে কত বড়ো, তার একটা সুস্পষ্টরূপ আমাদের কাছে দেখা দিচ্ছে। বয়স্ক-সাহিত্যের মতো কেবল রসোত্তীর্ণ হয়েই তার কর্তব্য শেষ হচ্ছে না; তাকে অনেক বেশী সতর্ক হয়ে, ভবিষ্যৎ মানব-সমাজের কল্যাণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত থেকে তবেই অগ্রসর হতে হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে বড়োদের জন্য লিখতে পারলেই ছোটদের সাহিত্য-

সৃষ্টির অধিকার জন্মায় না। তার জন্য উচ্চাঙ্গের শিল্পী হওয়া চাই, শিশুমন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা চাই, অতিশয় সাবধানতার সঙ্গে হওয়া চাই। সুতরাং শিশু-সাহিত্যিক রূপে যাঁরা সাফল্য লাভ করেন, তাঁদের কৃতিত্ব বয়স্ক সাহিত্যিকের তুলনায় উপেক্ষণীয় নয়। আর তাই যদি হয়, তা হলে আজ অনেক বেশী স্বীকৃতি ও সম্মাননা তাঁদের প্রাপ্য। অবশ্য এ দাবি আমি করছিনা যে বাঙালী শিশু সাহিত্যিকেরা সকলেই এই আদর্শ অনুসারে চলেন বা চলতে পারেন; কিন্তু কতদিন থেকে তাঁদের সতর্ক থাকতে হয়, আবার তার দৃষ্টান্ত দিচ্ছি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে। আমার একটি ছোটদের হাসির উপন্যাসের কোনো চরিত্র এক জায়গায় বলেছে, 'আমাদের উপর ভূতের উপদ্রব কেন? যে হেড্ পণ্ডিত মশাই শক্ত শক্ত ব্যাকরণের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন আর না পারলে ধরে ধরে ঠ্যাঙান, ভূতটা গিয়ে তাঁর ঘাড়ে চাপলেই তো পারে।' লেখার সময় মনে ছিল, ওটা একটুখানি নির্দোষ কৌতুক ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু একদিন একজন হেড্ পণ্ডিত মশাই ওই জায়গাটি তুলে আমাকে সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি মনে করেন, এই ধরণের লেখায় ছেলেমেয়েরা তাদের শিক্ষকদের সম্পর্কে উপযুক্ত শ্রদ্ধা অনুভব করতে পারে?' লজ্জিত হয়ে আমাকে স্বীকার করতে হয়েছে আমি অন্যায় করেছি। বইখানির পরবর্তী মুদ্রণে অংশটি আমি বদলে দেব।

আসলে শিশু-সাহিত্য রচনায় লেখককে তিনদিক থেকে সজাগ থাকতে হয়। সর্বপ্রথমে আসে শিশু মনের সঙ্গী—যে তরুণ চিত্তের আশা-আশঙ্কা আনন্দ-বেদনার অংশীদার, নিজের কল্পনা দিয়ে যে তার কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে—রবার্ট লুই ষ্টিভেনসনের মতো যে তার অভিযানের সহযাত্রী হতে পারে —'এডোয়ার্ড লীয়ার কিংবা সুকুমার রায়ের মতো তাকে খেয়ালী কল্পনায় উধাও করে দিতে পারে; তারপরে আসে জাত-সাহিত্যিক—যে মার্ক টোয়াইন-লুই ক্যারল-দক্ষিণারঞ্জনের মতো সমস্ত বস্তুটিকে শিল্প-রসায়িত করে তুলতে পারে; আর সর্বশেষে আসে শিবনাথ শাস্ত্রী কিংবা ম্যাক্‌সিম গোর্কীর মতো অভিভাবক, যার খরদৃষ্টি সব সময় বিচার করছে অবৈজ্ঞানিক, অসত্য এবং নীতিহীন কোনো জিনিস অলক্ষ্য কীটের মতো শিশু-সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করে অপরিণত মনকে বিষাক্ত করে তুলছে কি না। ভারতীয় অলঙ্কার-শাস্ত্রে কাব্যের মধ্যগত উপদেশকে 'কান্তাসম্মিত' বলে তুলনা করা হয়েছে; শিশু-সাহিত্যে আনন্দের আশ্রয়ে চরিত্র গঠন ও শুভবুদ্ধি সঞ্চার মাতৃস্নেহ, পিতৃনিয়ন্ত্রণ এবং খেলার সাথীর সাহচর্য—এই তিনটির উপরেই নির্ভর করে।

সম্প্রতি কোন বন্ধু ই বি হোয়াইটের একখানা আধুনিক শিশু-উপন্যাস

আমায় পড়তে দিয়েছে। বইখানির নাম 'Charlotte's Web'—একটি শূকরছানা এবং একটি মাকড়শার বন্ধুত্বের কাহিনী। মনোরম ভাষায় স্নিগ্ধ সুকুমার একটি কাহিনী ; গল্পের মধ্যে ভেড়া আছে, হাঁস আছে, ইঁদুর আছে—মানুষের চরিত্রও কিছু আছে। নিতান্তই তুচ্ছ জীব-জন্তুকে আশ্রয় করা গল্প, কিন্তু নিঃশব্দে তার মধ্যে আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা প্রবেশ করেছে। আশ্চর্য কৌশলে শূকরছানা উইলবারের প্রাণ বাঁচিয়ে মৃত্যুর আগে মাকড়শা শার্লটি বলছে, "After all, what's a life any way ? We're born, we live a little, we die. A spider's life, can't help being something of a mess, with all this trapping and eating flies. By helping you, perhaps I was trying to lift my life a triffle." উপন্যাসটি যখন শেষ হয়, তখন মাকড়শাটির জন্যে শিশুর চোখে জল আসে, সে অনুভব করে জীবনের সব চাইতে বড়ো সত্য "To lift the life a triffle !" এ-ই হল সত্যিকারের শিশু-সাহিত্য। রুশ-লেখক নসোভের 'School Boys', টমাস হিউয়েমের 'Tom Brown's School Days'কে নতুন আলোকে উজ্জ্বল করে স্কুলের ছাত্রকে আনন্দ এবং সুশিক্ষার উপকরণ জুগিয়েছে ; ইয়েফ্রেমভের বৈজ্ঞানিক গল্পগুলি শিশুর মনকে যেমন কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে, তেমনি আবিষ্কার ও অভিযানের প্রেরণা দিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলেছে।

আমাদের শিশু-সাহিত্যকে একদা বিশ্বমানের পর্যায়ে তুলেছিলেন রবীন্দ্র-নাথ-অবনীন্দ্রনাথ সুকুমার রায়—দক্ষিণারঞ্জন ; প্রমদাচরণ সেন তার জন্যে জীবনপাত করেছেন, আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর বিপুল কর্মযজ্ঞে শিশু-সাহিত্যের কল্যাণ-কামনায়ও একটি সশ্রদ্ধ আহুতি দিয়েছেন। আজ আমাদের যত দৈন্যই থাক, এই উত্তরাধিকারকে আমরা ব্যর্থ হতে দেব না। কিন্তু অনাসক্তি ও উপেক্ষার হাত থেকে শিশু-সাহিত্য মুক্তিলাভ করুক, তার নীরব কর্মযোগীরা সচ্ছল ও সম্মানিত হোক, রাষ্ট্র এবং জনসাধারণ আর একটু অবহিত হোন—তা হলেই এদিকে নতুন নতুন প্রতিভারা আকৃষ্ট হবেন—প্রবীণদের লেখনী আরো শক্তিশালী হবে। বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যের এই বিপুল সমাবেশের ভেতরে শিশু-সাহিত্যের পক্ষ থেকে এই দীন নিবেদনটিই মাত্র আমি উপস্থিত করছি। নমস্কার।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সঙ্গীত শাখার সভাপতির ভাষণ

পরিচিতি
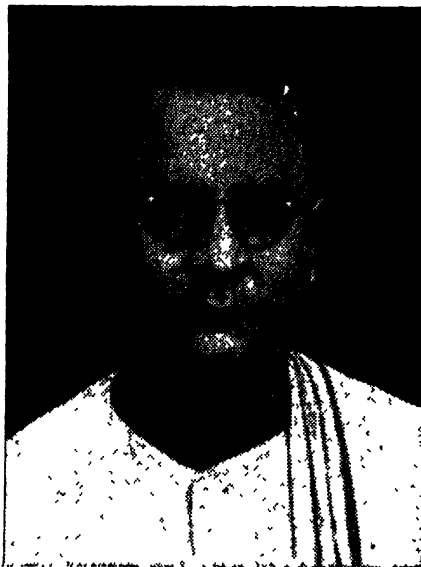
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

১৯০৭ সালে হুগলী জেলার প্রসাদপুরে এঁর জন্ম। ১৯২৭ সালে ইনি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য স্বামী অভেদানন্দের শিষ্য হন। ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস বিষয়ে ইনি একজন কৃতী বিজ্ঞানী। 'সংগীত ও সংস্কৃতি' গ্রন্থ রচনা করে ইনি ১৯৫৯ সালে শিশির স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেন এবং ১৯৬০ সালে Historical Development of Indian Music গ্রন্থ রচনা করে রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার পান। এছাড়াও দর্শন এবং সংগীতের বিভিন্ন বিষয়ে ইনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। বর্তমানে ইনি কলকাতা রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের সম্পাদক। এঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'Saviour' 'রাগ ও রূপ', 'বাংলা ধ্রুপদ-মালা', 'ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস', 'Historical Study in Indian Music.'

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সঙ্গীত শাখার সভাপতির ভাষণ

নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের ৩৭তম অধিবেশনে সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনার সুযোগ দান করায় কর্তৃপক্ষদের আমি আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন বাংলাদেশের সংস্কৃতিসম্পদ: সাহিত্য, শিল্প, ইতিহাস, দর্শন, কাব্য, সঙ্গীত প্রভৃতিকে ভারত ও ভারতের দেশবাসীর কাছে পোঁছে দেবার জন্য ছত্রিশ বছর ধরে যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা কোরে আসছেন তা প্রশংসনীয়। দেশের শিল্প, সভ্যতা ও সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্য বহন ও প্রচাব করার দায়িত্ব দেশবাসীরই। কেননা বিশেষ কোরে ঐ তিনটি ধারাই তার প্রাণপ্রবাহকে সচল ও সতেজ রাখে।

নিখিল তারত বঙ্গ-সহিত্য-সম্মেলনের সঙ্গীতশাখার অধিবেশনে বাংলা-দেশের সঙ্গীত-সংস্কৃতির রূপ ও অনুশীলনের কথাই আমি সংক্ষেপে বলব। ১১৭৪ থেকে ১১৭৬ সালে বাংলাদেশের একটি গণ্ডগ্রাম পদচিহ্নের স্বর্ণস্মৃতিকে কেন্দ্র কোরেই ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'আনন্দমঠ' রচনাকে সার্থক করেছিলেন। দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলাদেশ ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনালোকে তখন উদ্ভাসিত, কিন্তু সর্বত্যাগী ভবানন্দের মুখে সমগ্র ভারতের সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা অনিন্দ্যসুন্দর রূপ বন্দনা কোরে তিনি ধ্বনিত করেছিলেন—

বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্
শস্যশ্যামলাং মাতরম্—প্রভৃতি

বঙ্কিমচন্দ্রের মনে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমারেখা তখন বিলুপ্ত ও ভারত-মাতার দিগন্তপ্রসারিত শস্যশ্যামলা আনন্দোজ্জ্বল কল্যাণী মূর্তি উদ্ভাসিত। তিনি বাংলার ধূলিতে দণ্ডায়মান হোয়ে যখন সর্বংসহা ভারতজননীর পদ বন্দনা করেছিলেন তখন বাংলার ঔদার্য ও দৃষ্টিপ্রাচুর্যের মহিমা শুধুই ভারতে নয়,—সমগ্র বিশ্বে প্রচারিত হোল। তাই আজ নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের বিশাল ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সঙ্গীত সংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনা

করলেও ঐতিহ্যবাহী ভারতের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মানই রক্ষিত হবে। কেননা আমি মনে করি বাংলাদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ভারতেরই সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ।

তাছাড়া বর্তমান অঙ্গবিচ্ছিন্ন সীমায়িত মূর্তিই বাংলাদেশের সত্যকার রূপ নয়। বৃহত্তর বাংলার রূপ ছিল গিরিব্রজ বা বিহার, সমগ্র বঙ্গদেশ, কামরূপ বা আসাম ও উৎকল বা উড়িষ্যার বিশাল ভূখণ্ডকে নিয়ে এই বৃহত্তর বাংলার সমাজে খৃষ্টীয় ৯ম থেকে ১২শ শতকে পাই নাথ যোগীদের গাথা বা গান, বৌদ্ধ ও শৈব সন্ন্যাসীদের চর্যা ও বজ্রগীতি ও ঠাকুর জয়দেব-রচিত গীতগোবিন্দের প্রবন্ধ গান। গুপ্ত, পাল ও সেন রাজাদের আমলে নৃত্য, গীত ও নাট্যের রূপ ছিল পরিচ্ছন্ন ও সুসংস্কৃত। ঐতিহাসিক ফা-হিয়েন ভারত ভ্রমণকালে গুপ্তরাজাদের সময়ে নৃত্য গীতের কথা বর্ণনা করেছেন। চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন্-সাঙও সম্রাট হর্ষবর্ধনের সময়ে কনৌজে বিভিন্ন আনন্দানুষ্ঠানে নৃত্য গীতের বিবরণ দিয়েছেন। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের আবিষ্কারে ময়নামতী ও লামাই পাহাড় থেকে বাংলাদেশের প্রাচীন অনেক বাদ্যযন্ত্রের নিদর্শন পাওয়া গেছে এবং প্রাচীন বাংলার সমাজে সঙ্গীতের অনুশীলন যে অব্যাহত ছিল সে সব থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়।

রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় নৃত্য গীতেরও প্রচুর ব্যবস্থা ছিল এবং সে নৃত্য-গীতের রূপ ও প্রতিফলন ছিল নাট্যশাস্ত্র ও অন্যান্য প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রের অনুযায়ী। জয়দেব-রচিত গীতগোবিন্দের গীতিরূপ ও নটাঙ্গোর সেকশুভোদয়ে উল্লিখিত নৃত্য-গীতের কাহিনীও সেন রাজত্বের আমলে সঙ্গীতের অনুশীলন প্রমাণ করে। ধোয়ীর 'পবনদূত'-কাব্যে ও রূপরামের ধর্মমঙ্গলে দেবায়তনগুলিতে দেবদাসীদের নৃত্যের বর্ণনা পাওয়া যায় তা প্রাচীন বাংলায় নৃত্য-গীতচর্চার কথাই প্রকাশ করে। গৌড় ছিল বাংলার রাজধানী। গৌড়, দ্বারবঙ্গ বা দ্বারভাঙ্গা, মিথিলা, কামরূপ প্রভৃতি বৃহত্তর বাংলার দেশগুলি ছিল তখন সঙ্গীতচর্চার কেন্দ্র। জ্যোতিরীশ্বর কবিশেখরাচার্যের 'বর্ণরত্নাকর' পণ্ডিত লোচনের 'রাগতরঙ্গিনী' ও 'রাগসঙ্গীতসংগ্রহ' প্রভৃতি গ্রন্থ বৃহত্তর বাংলার সঙ্গীত-সাধনার মর্মকথাই প্রকাশ করে।

তেমনি খৃষ্টীয় ১৫শ শতকের মাঝামাঝি থেকে ১৭শ শতক পর্যন্ত স্বামী কৃষ্ণদাস, পুরুষোত্তম মিশ্রের পুত্র কবি নারায়ণ, গজপতি নারায়ণ দেব, গোপীনাথ কবিভূষণ, হরিনায়ক সূরী, কবিরত্ন কালঙ্কর প্রভৃতি রচিত 'গীতপ্রকাশ' 'সঙ্গীত-সরণি' 'সঙ্গীত-নারায়ণ' 'সঙ্গীত-কামোদ', 'সঙ্গীতসার' কালঙ্কুরনিবন্ধ' প্রভৃতি সঙ্গীত গ্রন্থের মাধ্যমে উৎকলে তথা বৃহত্তর বাংলায় রাগসঙ্গীতের অনু-

শীলনের কথা জানা যায়। মূল বাংলাদেশে রচিত সঙ্গীত গ্রন্থের সংখ্যাও কম ছিল না। মঙ্গল-কাব্যগুলিতে বাংলার সমাজে লোকগীতির প্রসঙ্গে নৃত্যগীতের বর্ণনা আছে। দু একটি উদাহরণ যেমন—গঙ্গারামের ধর্ম-মঙ্গলে ধর্মপূজায় গাজন অনুষ্ঠানের প্রধান অংশ অধিকার করতো নৃত্য-গীত এবং প্রাতে মধ্যাহ্নে ও সাযাহ্নে নৃত্য-গীতেব আয়োজন হোত বিচিত্র বাদ্যযন্ত্র ও শাস্ত্রীয রাগরাগিনীদের সহযোগ নিয়ে। মানিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গলেও তাই। মুকুন্দবাম ও মানিক দত্তের মঙ্গলচণ্ডীতে নৃত্য ও বাদ্যযন্ত্রের অনুগামী গীতেব কথা আছে। অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে তানপুরারও উল্লেখ পাওয়া যায। বিষহরি বা মনসাব পূজায় ও ভাসানে ছন্দোবদ্ধ গানে অনুশীলন হোত এবং 'তন্ত্রবিভূতি' ও 'জগজ্জীবন' গ্রন্থ দুটিই তার স্পষ্ট প্রমাণ। অনেক গানে খোল-করতালেবও ব্যবহার থাকতো। বাংলাদেশে বাউল, ভাটিয়ালি, জারি, সারি, গম্ভীরা প্রভৃতি আঞ্চলিক গানের অনুশীলন তো হোতই।

খৃষ্টীয় ১৩শ শতক থেকে ১৮শ শতক পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল থেকে ভারতচন্দ্রেব অন্নদামঙ্গল পর্যন্ত গ্রন্থগুলিতে বাংলার সমাজে কৃষ্ণকীর্তন, কালীকীর্তন থেকে আরম্ভ কোরে পাঞ্চলিকা বা পাঁচালি, মঙ্গলা গান, কীর্তিগাথা গান বা কীর্তন প্রভৃতি প্রবন্ধ গানের অনুশীলন হোত। তাদের গীতি রূপের পরিচয় দিয়ে খৃষ্টীয় ১৩শ শতকে শার্ঙ্গদেব তাঁর সঙ্গীত রত্নাকরের প্রবন্ধাধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তিনি বাংলার সমাজে চর্যা প্রভৃতি গানের গীতিরূপেব পরিচয় দিতেও কার্পণ্য করেন নি।

আবার খৃষ্টীয় ১৫শ-১৬শ শতকে শ্রীচৈতন্যের অভ্যুদয় থেকে খৃষ্টীয় ১৮শ শতক পর্যন্ত পদাবলী কীর্তনের রূপাযণের কথা আমরা জানতে পাবি। শ্রীচৈতন্যের সময়েই হাফ আখড়াই, কবি, তর্জা, বাউল প্রভৃতি গানের প্রচলন ছিল। শোনা যায়, যবন- হরিদাস হাফ আখড়াই ও কবি গানের প্রবতন করেন এবং বিপ্রদাস ও সনাতন দাস তাদের পরিপুষ্টি সাধন করেন। বেত্র নদীর ধারে ফুলিয়া ছিল ঐ দুটি গীতিচর্চার কেন্দ্রস্থল। শান্তিপুর, নবদ্বীপ ও ফুলিয়ার গায়কেরা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধাকে কেন্দ্র কোরে সখীসংবাদ, মানভঞ্জন, যুগলমিলন, মাথুর প্রভৃতি পালা রচনা করে গান করতেন। তাদের গীতিধারাও শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত নামকীর্তনকে ভিত্তি কোরেই পরবর্তীকালে ঠাকুর নরোত্তম অভিজাত প্রবন্ধগানের কাঠামোয় বিলম্বিত লয়ে রসকীর্তন বা লীলাকীর্তন প্রচার করেন। শাস্ত্রীয় রাগ-রাগিনী ও বিচিত্র তালের সমাবেশ থাকত। রায় রামানন্দ, স্বরূপ-

দামোদর, কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী, জীব গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী এবং পরে ঘনশ্যাম নরহরি চক্রবর্তী প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যেরা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত গোবিন্দলীলামৃত, কবি-কর্ণপুর রচিত 'আনন্দ বৃন্দাবন চম্পু', রূপ গোস্বামীর 'গীতাবলী', নরহরি চক্র-বর্তীর ভক্তি রত্নাকর 'সঙ্গীতসারসংগ্রহ' ও 'গীতচন্দ্রোদয়' প্রভৃতি গ্রন্থে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আলোচনাভঙ্গী দেখলেই পদাবলী কীর্তনও যে শাস্ত্রসঙ্গতভাবে অনুশীলিত হোত তা বোঝা যায়।

খৃষ্টীয় ১৮শ শতকের সূচনা থেকে ১৯শ শতকের প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলাদেশে সঙ্গীতের জগতে আর একটি রেনেসাঁ বা নবজাগরণের সূচনা হয়। ভারতচন্দ্র রায়, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবু প্রধানত শ্যামাসঙ্গীত, টপ্-খেয়াল ও টপ্পা প্রভৃতি গানের প্রচলন করেন। অযোধ্যা-নাথ গোস্বামী বা আজু গোঁসাইও রসিকতাচ্ছলে অনেক গান রচনা করেছিলেন। তখন বাংলার দুর্গামণ্ডপ ও চণ্ডীমণ্ডপগুলি ছিল সাহিত্য, শিল্প কাব্য ও সঙ্গীত আলোচনার কেন্দ্র-রূপ। সমাজ সংগঠন ও পারস্পরিক মিলনের কেন্দ্রও ছিল ঐ সকল মণ্ডপ। পবে হারু ঠাকুর, দেওয়ান রঘুনাথ রায়, রাজা রামমোহন রায়, দেওয়ান রামদুলাল, রাম বসু প্রভৃতি এবং পরবর্তীকালে দাশরথি রায়, রসিকচন্দ্র রায়, মনোমোহন বসু, শ্রীধর কথক, গোবিন্দ অধিকারী প্রভৃতি সঙ্গীত রচয়িতা ও গীত শিল্পীদের আবির্ভাবে বাংলার সঙ্গীত সমাজ বেশ জাগ্রত হয়েছিল। হিন্দুস্থানী খেয়ালের প্রবর্তন তখনো বাংলার সমাজে হয় নি। শ্যামাসঙ্গীত ও অন্যান্য দেব দেবী বিষয়ক গান মীড় গমক ও ছোটখাট তান-কর্তবের সহযোগে গান করা হোত এবং তারাই পরে টপ্-খেয়ালের রূপ পরিগ্রহ করে। নিধুবাবু কিছুটা হিন্দুস্থানী টপ্পার অনুকরণে বাংলা টপ্পার প্রচলন করেন ও বাংলা গানের জগতে এক যুগান্তর স্বষ্টি করেন বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। নিধুবাবু মানুষের সামাজিক জীবন প্রবাহের ও মানবীয় প্রেমের আদান-প্রদানের সঙ্গে যোগ রেখে বেশীর ভাগ টপ্পা গান রচনা করেন, সুতরাং তাঁর গানে স্বর্গের পরিবর্তে পৃথিবীর দুঃখ-কষ্ট মেশানো ধূলির জন্যই বেশী। তাঁর ''ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে'' 'তোমারি তুলনা তুমি প্রাণ এ' মহীমণ্ডলে', 'মিলনে যতেক সুখ মননে তা হয় না' প্রভৃতি গান সর্বজনপরিচিত।

তা ছাড়া বাংলার সমাজে তখন কৃষ্ণযাত্রা, কথকতা, রামায়ণ গান, তর্জা, ঝুমুর, যাত্রা প্রভৃতির অনুশীলন তো ছিলই। এ' সকল বিচিত্র শ্রেণীর গানে রাগ-রাগিনী হিসাবে ব্যবহার করা হোত সাহানা, বসন্ত, সুম, গৌরী পূরবী, বাগেশ্রী, খাম্বাজ, মূলতান, ভীমপলশ্রী এবং তাল হিসাবে আট মাত্রার যৎ, ষোল

মাত্রার কাওয়ালী ও আড়াঠেকা, বত্রিশ মাত্রার মধ্যমান, বারো মাত্রার চারভাগে বিভক্ত একতালা, আড়া, পোস্তা প্রভৃতি। বাগেশ্রীর রূপে ও বিকাশে একটু বৈশিষ্ট্য ছিল এবং স্বামী বিবেকানন্দ রচিত 'নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর' অথবা লালচাঁদ বড়ালের গাওয়া 'একি রূপ হেরি হরি, তুমি ধরেছ যোগীর বেশ' গান যাঁরা শুনেছেন তাঁরা এই বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য কিছুটা বুঝতে পারবেন। ভীমপলশ্রী ও মূলতান নিয়েও একটা মতদ্বৈত ছিল। বিশেষ কোরে তালের রূপানুশীলনে যে একটি বৈশিষ্ট্য ছিল তা এখনকার বয়োবৃদ্ধ শিল্পী ও সঙ্গীত-রসিকরা সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন। এখন বাংলাদেশে হিন্দুস্থানী খেয়াল ও ঠুংরী গানের সুষ্ঠু অনুশীলন ও বহুল প্রচার হচ্ছে সত্য, কিন্তু তখনকার সময়ে প্রচলিত যৎ, আড়াঠেকা, মধ্যমান ও একতালার ছন্দ-মাধুর্য এখনকার গানে আর নাই, বরং ধীবে ধীরে তারা লোপ পেতে বসেছে। টপ্পার অবস্থাও তাই। যে টপ্পা নিধুবাবুব পরও বাংলার বৈঠকী-আসরের অনেকটা জায়গা জুড়ে থাকতো এখন তা লুপ্তপ্রায় বল্লেই হয়। বাংলার এ'দিকে জাগরণের দিনে শিল্পীদের অবহিত হওয়া উচিত।

বাংলাদেশে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে ধ্রুবপদ বা ধ্রুপদের আসন ছিল এক সময়ে পুরোভাগে। এই সেদিনও বিশ্বনাথ রাও, অঘোরনাথ চক্রবর্তী, প্রসাদ মুখোপাধ্যায় বা নুলো গোপাল, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, যদুভট্ট, রাধিকা-প্রসাদ গোস্বামী, রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, নিকুঞ্জবিহারী দত্ত, মহিম চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র দত্ত, ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ধ্রুপদীয়াদের উদাত্ত কণ্ঠের সঙ্গে পাখোয়াজের গুরুগম্ভীর ধ্বনি বাংলার সঙ্গীতাসরগুলিকে মুখরিত কোরে রাখত। আজও শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅমর নাথ ভট্টাচার্য, শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ বিদগ্ধ ধ্রুপদগায়কগণ অতীতের সেই গৌরবময় স্মৃতিকে বাংলার সমাজে জাগ্রত রেখেছেন। বাঙ্গলাভাষায় চৌতাল, ধামার, প্রভৃতি তালে গান রচনা কোরে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও বাংলার প্রাচীন ধারাকে চিরস্মরণীয় করেছেন। ধ্রুপদচর্চার জগতে ভারতে বাংলার অবদান ও গৌরব এখনো শীর্ষস্থানে। সুতরাং বাংলার বর্তমান সঙ্গীতধারার যাঁরা ধারক ও সংরক্ষক তাঁদের ধ্রুপদের অনুশীলনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য অনুরোধ জানাই।

পূর্বেই বলেছি বাংলাদেশে হিন্দুস্থানী খেয়ালের প্রবর্তন হয় টপ্পারও অনেক পরে। বাংলায় হিন্দুস্থানী খেয়ালের বীজ রোপিত হয় খৃষ্টীয় ১৯শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। তখন বহু মুসলমান সঙ্গীতশিল্পী দিল্লী, আগ্রা ও ভারতের অন্যান্য স্থান থেকে বাংলায় এসে হুগলী, চুঁচড়া, শ্রীরামপুর, উত্তরপাড়া, কৃষ্ণনগর,

গোবরডাঙ্গা, বিষ্ণুপুর, মুর্শিদাবাদ, ময়মনসিংহ, ঢাকা, আগরতলা, কুমিল্লা, নাটোর, আসাম, গৌরীপুর এবং বিশেষ কোরে কলকাতায় বসবাস করতে থাকেন। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীতের পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জোড়াসাঁকোর রাজবাড়ীতে তখন প্রায় প্রত্যহই হিন্দু ও মুসলমান গায়কদের সঙ্গীতের আসর বসতো। রবীন্দ্রনাথ সেই পরিবেশ থেকেই তাঁর সঙ্গীত শিক্ষা ও রচনার প্রেরণা লাভ করেছিলেন। বরোদার মৌলা বক্স, গয়ার হনুমান দাস ও কানাইলাল চেঢ়ী, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, যদুভট্ট, বিষ্ণু চক্রবর্তী ও তখনকার খ্যাতনামা অন্যান্য শিল্পী তথা উস্তাদরা ঠাকুরবাড়ী-প্রাসাদে নিমন্ত্রিত হোতেন। এদিকে বাংলার বিভিন্ন সহরে ও কলকাতায় প্রখ্যাত সেনী ঘরাণার শিল্পী মান খাঁ, বড়ে মিঞা, হস্-সু-খাঁ, হর্দু খাঁ, দিলোয়ার খাঁ, বহিম বক্স, ককুভ খাঁ, পায়ে খাঁ, কালে খাঁ, মোরাদ আলী খাঁ, প্রভৃতি ধ্রুপদ ও খেয়ালের শিক্ষাদানে নিযুক্ত। ক্রমে বাংলাদেশে শিবনারায়ণ মিশ্র, কাশীনাথ মিশ্র, ভাইয়া গণপত রাও, মৈজুদ্দিন খাঁ, অঘোরনাথ চক্রবর্তী, নুলো গোপাল, রাধিকামোহন গোস্বামী, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, খলিফা বাদল খাঁ সাহেব, আলাদিয়া খাঁ, আবদুল করিম খাঁ, ফৈয়াজ খাঁ প্রভৃত ধ্রুপদের সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল গানের প্রসার সাধন করেন। পরবর্তীকালের হরেন্দ্রনাথ শীল, রাইচাঁদ বড়াল, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, গিরিজাশংকর চক্রবর্তী সেই প্রসারতাকে আরো পরিপুষ্ট করেন। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, বাংলাদেশে সঙ্গীত সমাজে হিন্দুস্থানী খেয়াল গানের প্রবর্তন করেন বিশেষভাবে অঘোরনাথ চক্রবর্তী, নুলো গোপাল, শিবনারায়ণ মিশ্র, পণ্ডিত গুরুপ্রসাদ মিশ্র, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী প্রভৃতি। তবে তখনকার বাংলা-দেশে, খেয়ালে এখনকার মতো দ্রুত সাপাট তানের প্রচলন বা আদরও ছিলনা। তখন খেয়ালে বিলম্বিত লয়ে গমক তানেরই সমাদর ছিল। ক্রমে নান্নে খাঁ, কালে খাঁ প্রভৃতি শিল্পীরা খেয়ালে দ্রুত সাপাট তানের প্রবর্তন করেন। বর্তমানে বাংলাদেশে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে খেয়ালের গীতরীতি পরবর্তী ধারারই অনুবর্তন কোরে চলেছে।

এই সঙ্গে উনবিংশ বিংশ-শতকে রচিত বিচিত্র সঙ্গীত গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনার মাধ্যমে বাংলাদেশের সঙ্গীতের সাধনা ও অগ্রগতির ধারাও লক্ষ্য করার বিষয়। খ্রীষ্টীয় ১৯শ শতকের প্রায় শেষের দিক থেকে বাংলাদেশে যে সকল সঙ্গীতগ্রন্থ লেখা হয় রামনিধি গুপ্তের 'রসিক-মনোরঞ্জন' (১৮২০—১৮৩০), রাধা-মোহন সেনের 'সঙ্গীত-তরঙ্গ', ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর 'সঙ্গীতসার' ও 'যন্ত্রক্ষেত্র-দীপিকা' ও জয়দেবের গীতগোবিন্দে- পদগানের স্বরলিপিগ্রন্থ, নবীনচন্দ্র দত্তের

'সঙ্গীত রত্নাকর', ফকির মহম্মদের 'রাগমালা', আলি রাজার 'ধ্যানমালা', স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সংকলিত 'সঙ্গীতসারসংগ্রহ', 'যন্ত্রকোষ' ও ইংরাজীতে লিখিত Universal History of Music, Musical Scales of the Hindus, Gandharva-kalpa-vyakarana, Eight Principal Ragas of the Hindus প্রভৃতি, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়েব 'গীতসূত্রসার', অধ্যাপক মহম্মদ-মনসূরউদ্দীনের 'হাবমণি,' রায়বাহাদুব দীনেশচন্দ্র সেনের সংকলিত 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা' ও 'ময়মনসিংহ-গীতিকা,' বাংলা ব্যালাড হিসাবে 'নাথ-গীত' প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এ'সকল ছাড়া বর্তমানে সঙ্গীতেব বহু স্বরলিপি ও গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হোয়ে বাংলাদেশে অভিজাত ও আঞ্চলিক সঙ্গীতের অনুশীলনকে সচল করছে।

বাংলাদেশের সঙ্গীতানুশীলনের প্রসঙ্গে সহজ সরল আবেদনমূলক লোক-গীতির আলোচনার কথাও মনে পড়ে। বাংলাদেশের পল্লীতে পল্লীতে পূজা পার্বণে ও ব্রত-অনুষ্ঠানে গৃহবধূ ও কুমারী মেয়েদের ছড়ার আকারে সুরু কোরে গান এক অনবদ্যভাবের সৃষ্টি কবে। তাতে শাস্ত্রীয় রাগ ও তালের সমাবেশ থাকে না বটে, কিন্তু থাকে দেবতা, দেশ ও দশ এবং আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতির প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধানিবেদন, ভালবাসা ও অনুবাগ। এ'সকল অনাড়ম্বর সরল লোকগীতি বাংলার জীবনছন্দকে সতেজ ও সংহত করে। তাছাড়া এ'সকল গানকেই আবার অভিজাত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতেব প্রাণকেন্দ্র বলা যায়।

বাংলার নিজস্ব বাদ্যযন্ত্রগুলি আবার বাংলার নিজস্ব গান বাউল, ভাটিয়ালী, জাবি, সারি, কীর্তন, রামপ্রসাদী প্রভৃতির সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। বাদ্য-যন্ত্র হিসাবে একতারা, দুতারা বা দোতারা, সারিন্দা, গোপীযন্ত্র, বাঁশী, টিপ্রা, মাদল, ঢোলক, খঞ্জনী, করতাল, আনন্দলহরী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বাংলার জীবন ছন্দের সঙ্গে এই বাদ্যযন্ত্রগুলি সঙ্গতি রক্ষা কোরে অনবদ্য রস ও ভাবের সঞ্চার করে। এদের গঠন প্রণালী ও আকৃতি সাধারণ হলেও মানুষের মনোহরণের ও ভাব-সম্প্রসারণে এরা অসাধারণ।

এবার বাংলাদেশের সঙ্গীত প্রসঙ্গে তার নিজস্ব রূপ ও ভঙ্গির কিছুটা আলোচনা করার চেষ্টা করব। বৃহদ্দেশী, সঙ্গীত সময়সার, সঙ্গীত রত্নাকর প্রভৃতি প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রে শুদ্ধা, ভিন্না, গৌড়ী, বেসরা, সাধারণী প্রভৃতি গীত বা গীতরীতির কথা আমরা জানি। এগুলি একাধারে গীত ও রাগ এবং এদের ভিত্তি কোরেই প্রাচীন গ্রামরাগগুলির উদ্ভব। গীত হিসাবে এদের নিজস্ব একটি প্রকাশ ভঙ্গি ছিল—যেমন ছিল সম্রাট আকবর ও মিঞা তানসেনের

আমলে ধ্রুবপদে গৌড়ী বা গোবরহার, খাণ্ডার ডাগুর বা ডাগর ও নওহার বাণীগুলির। তাছাড়া খৃষ্টীয় ২য় শতকের নাট্যশাস্ত্র থেকে আরম্ভ কোরে পরবর্তীকালে সকল সঙ্গীত গ্রন্থে উল্লিখিত গীতগুলি ছিল নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ এই দুভাগে বিভক্ত। খৃস্টীয় ১৮শ শতকে ঘনশ্যাম নরহরি চক্রবর্তী 'ভক্তি রত্নাকর' ও 'সঙ্গীত সার সংগ্রহ' গ্রন্থে প্রবন্ধ গীতির স্বর, বিরুদ, পদ, তেনক, পাট ও তাল প্রভৃতি পাঁচটি অঙ্গের উল্লেখ করেছেন। গীতের সংজ্ঞা হিসাবে প্রবন্ধ ছাড়াও বস্তু ও রূপকের প্রচলন ছিল। কিন্তু গান বা গীত মাত্রেই রাগ, তাল, আঙ্গিক, কাব্য বা সাহিত্য প্রভৃতি উপাদানকে নিয়ে অভিব্যক্ত হয়। এখনো তাই, তবে পূর্বেকার মতো হয়তো এখনকার গীতির গঠনে ও প্রকাশে নিয়মতন্ত্র কিছুটা ভিন্ন এবং শিথিলও বটে। কিন্তু তাহলেও জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে প্রবন্ধ শ্রেণীর গান প্রাচীন ধারা বা ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে।

বাংলাদেশের নিজস্ব গানে তথা শ্যামাসঙ্গীতে-বাউলে, টপ্পায়, টপ, খেয়ালে, পদাবলীতে, ঢপকীর্তনে, কবিগানে, পাঁচালিতে নিজস্ব একটি গায়কীরীতির সন্ধান পাওয়া যায়। এই নিজস্ব গায়কীরীতিই গানের ষ্টাইল। এমন কি যাঁরা পরবর্তী যুগে রচিত—

জানি না কি বোলে ডাকি তোরে।
তুমি কখনো শঙ্কর বামে,
কভু আছ রাধার পায়ে ধরে॥—প্রভৃতি

গানটির গীতি পদ্ধতি বা গায়কী ভঙ্গি শুনেছেন, অথবা বাংলার বিদগ্ধ শিল্পী রাধিকামোহন গোস্বামীর মুখে "সোহাগ মৃণাল-ভুজে বাঁধিল শ্রীরাধাশ্যামে' প্রভৃতি গানটি শুনেছেন তাঁরাই অনুভব করবেন যে হিন্দুস্থানী টপ্পা ও খেয়ালের কিছু কিছু অনুসারী হোলেও বাংলা গানের গতি ও প্রকাশভঙ্গী ভিন্ন ও অনেক মৌলিক। নিধুবাবুর টপ্পাগানের গায়কী তো হিন্দুস্থানী টপ্পা থেকে ভিন্নই বটে। বাংলার আগমনী গান বাংলাদেশেরই নিজস্ব সম্পদ। ভক্তিমূলক শ্যামাসঙ্গীতে এবং বাউল, ভাটিয়ালী, ও আগমনী প্রভৃতির গীতিরীতিও বেশ ভিন্ন। বর্তমানে বিংশ শতকের অগ্রগতির দিনে সকল শ্রেণীর গানেই মিশ্রণ ও অনুকরণের আকুলতা যেন বেশী। পুরাতনীর নামে প্রাচীন বাংলা গানে ও এমন কি বাউল, ভাটিয়ালী, কীর্তন এবং রামপ্রসাদী গানেও নবসৃষ্টির অজুহাতে মিশ্রণের কাজ দেখা দিয়েছে—যা মোটেই সমীচীন নয়। নিজস্ব গীতরীতির অনুশীলনেই মনে হয় বাংলার সঙ্গীত-সংস্কৃতির মৌলিকতার মান রক্ষিত হবে। বাঙ্গালী রক্ষণশীল জাতি একথা সত্য, কিন্তু অনুকরণ প্রীতিও তাঁর কম নয়।

তাই অনুকরণ প্রাবল্যে—নিজস্বতার মধ্যে যাতে কোন বিকৃতি না আসে বাংলার গীতশিল্পী ও গীতরসিকদের সে বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত।

পরিশেষে উনবিংশ শতকের শেষভাগ থেকে বিংশ শতকের বাংলাদেশে অভিনব কতকগুলি গীতশ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল যাদের মধ্যে পাই আমরা রচনা বা সাহিত্য, সুর, তাল, লয় ও ভাব এই সমস্ত গুলির সমণ্বয়। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ সেন, রজনীকান্ত সেন, নজরুল ইসলাম প্রভৃতি প্রতিভাবান রচয়িতা ও গায়ক ছিলেন এই নবযুগের যাত্রী। একে সমন্বয়ের যুগ বা নবযুগ বলা যায়। 'ব্রাহ্মসঙ্গীত' নামে রচিত গানগুলিও নবযুগে রচিত। 'ব্রাহ্ম সঙ্গীত' নামকরণ করেন রাজা রামমোহন রায়। রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন চক্রবর্তী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি ব্রাহ্মসঙ্গীতের ভাণ্ডার পূর্ণ করেন। রবীন্দ্রনাথ রচিত বহু গানও ব্রাহ্মসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর বিভিন্ন নাটকের জন্য গান রচনা করেছিলেন কাব্য ও সুরের দ্বৈত-ব্যঞ্জনার মধ্যে মিতালি পাতিয়ে। তিনি উনবিংশ শতকের মহামানব শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কৃপাপ্রাপ্ত। তাঁর বেশীর ভাগ নাটকে ও গানে তাই শাশ্বতী দ্যুতির বিকাশই আমরা লক্ষ্য করি। প্রাচীন বাংলার গানের গঠন, সুর ও ভাবের দ্যোতনা নিয়ে তিনি বেশীর ভাগ গান রচনা করেছিলেন। বাংলার সঙ্গীত ভাণ্ডারে তাঁর গান চিরস্মরণীয় হোয়ে থাকবে।

'দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ছিলেন নাট্যকার, কিন্তু গান রচনায় ও সুর যোজনায়ও তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ধারার সঙ্গে তিনি বাংলা গীত-রীতির একটি মিলন সাধন করেছিলেন। তাঁর হাসির গান বাংলার স্বচ্ছন্দ ও স্বতঃস্ফূর্ত জীবন ছন্দেরই যেন প্রতিফলন। তাঁর স্বদেশী-সঙ্গীত সপ্তকোটি ভারত সন্তানের ক্ষুব্ধ প্রাণকে মিলিত করেছিল ভারতমাতার জয়গান করার জন্য। তাঁর "বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ" গানটি আজও বাংলার ঘরে ঘরে প্রদীপ্ত কণ্ঠে গীত হয় শোনা যায়।

রজনীকান্ত ছিলেন বাঙ্গালী জাতির প্রাণপ্রিয় কবি। সুললিত সুর কাব্য ও ছন্দের নির্মাল্য নিয়ে তিনি 'বাণী' ও 'কল্যাণী' প্রভৃতিতে ভক্তি প্রীতি, প্রেম, আত্মনিবেদন, প্রার্থনা প্রভৃতি বিষয়ে বহু গান রচনা করেছিলেন। তাঁর 'কেন বঞ্চিত হব চরণে', 'তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে মলিন মর্ম মুছায়ে,' 'যদি মরমে লুকায়ে রবে', 'করে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব' প্রভৃতি গান বাংলা সঙ্গীতের সম্পদ। তাঁর বিখ্যাত স্বদেশ-সঙ্গীত 'মায়ের দেওয়া মোটা

কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই' বাংলার প্রাণের অভিব্যক্তি ও আত্মসন্তোষও বটে।

বাংলাগানের রচয়িতা ও সুরকার অতুলপ্রসাদ সেনও ছিলেন দরদী কবি। তাঁর অনেক গান হিন্দুস্তানী গানের অনুসারী হোলেও সাহিত্য সৌন্দর্যে ও সুরমাধুর্যে মৌলিক। তাঁর বেশীর ভাগ বাংলাগান অপার্থিব ভাবের অনুস্থতি স্বষ্টি করে। তাঁর, 'আমার চোখ বেঁধে ভবের খেলায়', 'কে আবার বাজায় বাঁশী, 'তবু তোমারে ডাকি বারে বারে' 'কাঙাল বলিয়ে করিও না হেলা' প্রভৃতি ভক্তিমূলক গান, 'হও ধরমেতে ধীর' 'বল বল বল সবে' প্রভৃতি স্বদেশ সঙ্গীত বাঙালীর গৌরবের সামগ্রী। বাংলা সাহিত্যে ও সঙ্গীতে এসকল গান চির-স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

কবি নজরুল ইসলামের গানও নবযুগের অমূল্য সম্পদ। বাঙলার নবযুগ তাঁর কাছে প্রতিভাত ছিল অগ্নিযুগ হিসাবে এবং তারি জন্য পরিচিত ছিলেন বিদ্রোহী কবি হিসাবে। তিনি বেশীর ভাগ গজল, ঠুংরি, কার্ফা প্রভৃতি ছন্দে গান রচনা করেছিলেন। বাংলার শক্তি সাধনার প্রেরণায়ও তিনি উদ্দীপিত ছিলেন তাই বহু ভক্তি প্রেমাপ্লুত শ্যামাসঙ্গীতেও তিনি রচনা করেছিলেন। তাঁর 'রুমু ঝুমু রুমু ঝুমু কে এলে নুপুর পায়', 'মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর' গানগুলি দাদরা, ঠুংরী প্রভৃতি ভেঙে রচিত হোলেও ভক্তিভাব মিশ্রিত। লোকসঙ্গীতের রচনায়ও তিনি দক্ষ ছিলেন। 'আজি রক্ত নিশি ভোরে' 'শিকল-পরা ছল মোদের', 'কারার এ লৌহ-কপাট' প্রভৃতি গান নবশক্তির উদ্বোধন করে।

বাংলায় সঙ্গীত-জাগরণের যুগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয় এক অভিনব দ্যোতনা ও আলোড়ন স্বষ্টি করছে। তিনি অতুলনীয় কাব্য সম্পদ নিয়ে অবতীর্ণ হলেন সুরের রাজ্যে। তাঁর গানের কথায় ও সুরের মধ্যে তাই স্বষ্টি হোল অর্ধনারীশ্বরের মিলন-মাধুর্য। বাংলার গীতি সম্পদ হোল আরো রসায়িত ও ভাববিমুগ্ধ গঙ্গা-যমুনার মিলন সৌন্দর্যকে নিয়ে। গানের কথা ও সুরের প্রসঙ্গে কবি নিজেই বলেছেন : "বাংলাদেশে সঙ্গীতের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব হচ্ছে গান অর্থাৎ বাণী, সুরের অর্ধনারীশ্বর রূপ"। তিনি হিন্দুস্থানী গানের অনুকরণ ও তার ছায়াবন্ধন-এ' দুরকম ভাবেই বিভিন্ন ছন্দে, সুরে ও তালে গান রচনা করেছেন। কিন্তু সমান মূল্য দিয়েছেন গানের কথা ও সুরকে—রস ও ভাবকে। তিনি পূজা, প্রেম, প্রকৃতি, স্বদেশ, মাঙ্গলিক, আনুষ্ঠানিক আত্মনিবেদন এই সকল রকম ভাব নিয়ে গান রচনা করেছেন বাংলা দেশেরই ভাব, সৌন্দর্য, মৌলিক চিন্তা ও মানবপ্রাণের গভীর অনুভূতিকে

নিয়ে, আর তারি জন্য তাঁর গান এতো প্রাণস্পর্শী, আবেগময় ও আনন্দদায়ী। তাঁর গানের ভাণ্ডারে স্থান পেয়েছে যেমন উচ্চাঙ্গের চৌতাল, ধামার, সুরফাঁক তাল, ঝাঁপতাল প্রভৃতি তালের গান, তেমনি বাংলাব নিজস্ব গানের ধারা—বাউল, ভাটিয়ালী, কীর্তন, জাবি, সারি প্রভৃতি পল্লীগীতি। নৃত্যে, নাট্যে, ছন্দে ও গানের তালেও তিনি নূতন স্পষ্ট করেছেন এবং এনেছেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিচিত্র সুরের মিলন তাঁর বাংলা গানে। উনবিংশ ও বিংশ শতকে এত বড় প্রতিভাবান কবি, নাট্যকার, গীতিকাব, সাহিত্যিক ও শিল্পী বোধ হয় আর জন্মগ্রহণ করেন নি। তাঁর শতবার্ষিকী জন্মোৎসব প্রতিপালিত হচ্ছে আজ শুধু বাংলায় নয়, ভারতে নয—সমগ্র বিশ্বে। সমগ্র বিশ্বের তিনি আজ নমস্য।

পরিশেষে আমার বক্তব্য, বাংলাদেশের সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ অবশ্যই সমুজ্জ্বল। বাংলার শিল্পী, শাস্ত্রী ও সঙ্গীত-রসিকদের মধ্যে সঙ্গীত-জিজ্ঞাসার আকুলতা বেড়ে চলেছে। আশা কবি বাংলাদেশে অভিজাত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুশীলন যেমন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি বাংলার নিজস্ব সঙ্গীতের রূপানুশীলনও আবার পূর্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবে। জাতীয় সম্পদের সংরক্ষণে ও পরিপোষণেই জাতির শক্তি, সংহতি ও আত্মমর্যাদা রক্ষিত হয। আশা করি সাহিত্য, কাব্য, শিল্প, ও সঙ্গীতবিলাসী বাংলাদেশের অধিবাসী সে বিষয়ে যত্নশীল হবেন।

তারকচন্দ্র রায়

দর্শন শাখার সভাপতির ভাষণ

পরিচিতি
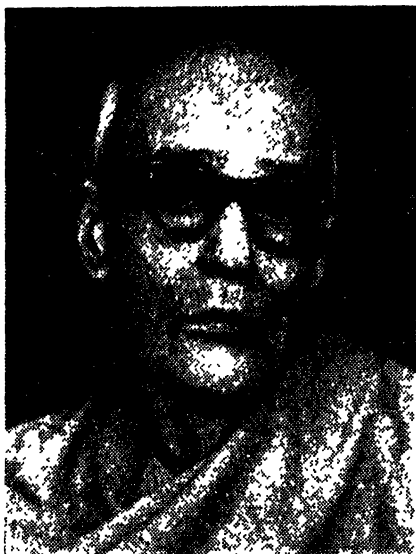
তারকচন্দ্র রায়

১২৮৫ সালে যশোরের রায়না গ্রামে এঁর জন্ম। কলকাতার জেনারেল এসেমব্লিস ইনষ্টিটুশন থেকে ইনি ষষ্ঠ স্থান অধিকার ক'রে এফ, এ পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯০০ সালে দর্শনশাস্ত্র ও ইংরেজী সাহিত্যে অনার্স নিয়ে বি, এ পাশ করেন। দর্শনশাস্ত্রে ইনি প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হয়ে ইনি কর্মজীবন আরম্ভ করেন এবং ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত তৎকালীন নবপর্যায়ের বঙ্গদর্শনে এঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও ভারতী, আর্যাবর্ত, সাহিত্য, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বঙ্গশ্রী, উদ্বোধন প্রভৃতি পত্রিকাতেও এঁর বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছে। এঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস— উপগুপ্ত এবং পুরুষোত্তম এবং দর্শনবিষয়ক গ্রন্থ—পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস এবং ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস।

তারকচন্দ্র রায়

দর্শন শাখার সভাপতির ভাষণ

আপনাদিগকে আমার নমস্কার। এই ব্যাধি ও জরাজীর্ণ জনসমাগমভীত প্রায়ান্ধ বৃদ্ধকে তাহার গৃহকোণ হইতে এই বিদ্বজ্জনসভায় টানিয়া আনিয়া আপনারা ভাল করিয়াছেন কিনা তাহা আপনাদের বিবেচনার বিষয়। আমি আপনাদের প্রদত্ত এই সম্মান কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিয়াছি। আপনারা আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

যে জগতে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি তাহার ব্যাখ্যাই দর্শনশাস্ত্রের বিষয়। জগৎকে সত্যরূপে দেখাই দর্শন। আমাদের দেশে কোন কোন দর্শনে দুঃখত্রয়ের অভিঘাত হইতে নিষ্কৃতিই তাহার উদ্দেশ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই নিষ্কৃতি সম্ভবপর কিনা, জগতের সত্য ব্যাখ্যা জানিতে পারিলে তাহা বোধগম্য হয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের লক্ষ্যও জগতের ব্যাখ্যা। কিন্তু দর্শনের দৃষ্টি বিজ্ঞান অপেক্ষাও দূরতবপ্রসারিত। বিজ্ঞানের অনুসন্ধান-প্রণালীও ভিন্ন। এতদিন দর্শনের উপাদান সরববাহ করিয়া বিজ্ঞান এমন স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যেখানে দর্শনের নিম্নতম সীমা বিজ্ঞানের উর্ধতম সীমার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। বর্তমানের শ্রেষ্ঠতম বৈজ্ঞানিকগণ দার্শনিক বিষয়ের আলোচনা করিতেছেন। মুক্তিশাস্ত্র বলিয়া গণ্য হওয়ায় ভারতের দর্শনশাস্ত্রের গৌরব সর্বাধিক।

বাংলা ভাষায় দার্শনিক গ্রন্থ বেশী নাই। এই শতাব্দীর প্রারম্ভে তাহার সংখ্যা আরও কম ছিল। তখন ৺উমেশচন্দ্র বটব্যাল, ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভিন্ন অন্য কেহ বাংলার দর্শনের চর্চা করিতেন বলিয়া আমার জানা নাই। ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ পরে লিখিয়াছিলেন। বর্তমানে দার্শনিক গ্রন্থের সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে কিন্তু দার্শনিক সাহিত্য যথোপযুক্ত বিস্তৃতি লাভ করে নাই। বাংলায় অনেক দার্শনিক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। রঘুনাথ শিরোমণি, জগদীশ তর্কালঙ্কার, গঙ্গাধর ভট্টাচার্য প্রভৃতি নব্যন্যায়ের পণ্ডিতগণ নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মধুসূদন সরস্বতী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কোটালীপাড়ায়। কিন্তু তাঁহারা সকলেই লিখিয়াছিলেন সংস্কৃত ভাষায়। বাংলা ভাষায় কেহই লেখেন নাই।

বাংলা ভাষায় প্রথম দার্শনিক গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। তাহাতে চৈতন্যদেবের জীবনীর সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন বিস্তৃতরূপে বিবৃত হইয়াছে। শাক্ত ও শৈবদর্শন কোনও গ্রন্থে বাংলা ভাষায় বিবৃত হইয়াছে বলিয়া আমি জানি না। ইহার পরে বহু দিন যাবৎ দার্শনিক কোনও গ্রন্থ বাংলা ভাষায় রচিত হয় নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে অনেক দার্শনিক বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভগবদগীতা ও সাংখ্যদর্শন উক্ত পত্রিকায় ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। তাহার পরে ৺উমেশচন্দ্র বটব্যাল, ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বাংলা ভাষায় দর্শনের আলোচনা করেন। উমেশচন্দ্র বটব্যাল সাংখ্যদর্শনেব এক নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থ অধিকাংশ ইংরাজীতে লিখিত হইয়াছে। রামেন্দ্র সুন্দরের পরে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত অনেকগুলি দার্শনিক গ্রন্থ বাংলা ভাষায় লিখিয়াছেন। গত কয়েক বৎসর হইতে মাসিক পত্রে দার্শনিক প্রবন্ধের অভাব নাই, এবং আশা করা যায় অচিরেই এই সাহিত্য আশানুরূপ পূর্ণতা লাভ করিবে।

দর্শনের কয়েকটি ক্ষেত্র এখনও বাংলা ভাষায় অকর্ষিত আছে। Hindu philosophy of law, Hindu political philosophy ও Ethics, শঙ্করোত্তর দর্শন ও বিবিধ পুরাণে বর্ণিত দর্শন এখনও বাংলা ভাষায় লেখা হয় নাই। ইহার কিছু লিখিবার ইচ্ছা আমার ছিল কিন্তু তাহা আর হইয়া উঠিল না।

সরস্বতীর সেবকেরা চিরকাল দরিদ্র বলিয়া খ্যাত। প্রাচীন লেখকদিগের কথা ছাড়িয়া দিলেও মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের আর্থিক দুরবস্থার কথা আমরা জানি। কিন্তু সম্প্রতি পুস্তক-বিক্রয় একটি লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। মুদ্রাযন্ত্র হইতে বাংলাদেশে বর্তমানে রাশি রাশি গ্রন্থ বাহির হইতেছে। তাহা হইতে গ্রন্থকারদিগের যতটা না হোক প্রকাশকেরা প্রচুর অর্থ লাভ করেন। অনেক গ্রন্থকারও Royalty হিসাবে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন বলিয়া শোনা যায়। এই সকল গ্রন্থের অধিকাংশই স্কুল ও কলেজ পাঠ্যগ্রন্থ, ধর্মগ্রন্থ অথবা উপন্যাস। দার্শনিক গ্রন্থের গ্রাহক বেশী নাই বলিয়া তাহাদের প্রকাশকও মেলে না। তবুও অনেকে যে দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেন তাহা তাঁহাদের অন্তরের তাড়নায়। স্বাধীনতা লাভের পর হইতে গভর্ণমেণ্ট সাহিত্যরচনার উৎসাহদানের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেছেন। 'রবীন্দ্র-পুরস্কার' ব্যতীত গ্রন্থ প্রকাশের ব্যয় বহনের জন্যও গভর্ণমেণ্টের সাহায্য পাওয়া যায়। এজন্য গভর্ণমেণ্ট ধন্যবাদের পাত্র। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথের বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শন

সম্বন্ধে বিরাট গ্রন্থ প্রকাশের সমগ্র ব্যয় শুনিয়াছি গভর্ণমেণ্টই বহন করিয়াছেন। এই মূল্যবান দার্শনিক গ্রন্থ বাংলা ভাষার ঐশ্বর্য যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের সাহায্য লাভের জন্য যে পরিমাণ উদ্যমের প্রয়োজন সকলে তাহা সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন না। রবীন্দ্র-পুরস্কারের জন্য গ্রন্থনির্বাচন-প্রণালীরও সংশোধন বাঞ্ছনীয়।

আমার দর্শন লিখিবার প্রেরণালাভের একটি মনোজ্ঞ ইতিহাস আছে। আমার ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসের প্রথম খণ্ডের মুখবন্ধে তাহা আমি লিখিয়াছি। সংক্ষেপে তাহা এই:

১৯০০ অব্দে আমি B. A. পাশ করি। পরীক্ষার ফল বাহির হইবার অত্যল্পকাল পরেই Presidency College-এর দর্শনের অধ্যাপক বিদ্বজ্জন-বরেণ্য ডাঃ প্রসন্নকুমার রায়ের (Dr. P. K. Ray) সহিত ঘটনাক্রমে আমার পরিচয় হয়। আমি Presidency College-এর ছাত্র ছিলাম না। ডাঃ রায় আমাকে তাঁহার বাড়ীতে যাইতে বলেন এবং বাড়ীতে গেলে তাঁহার নিজের ছাত্রের মতই আমার সঙ্গে ব্যবহার করেন। সেখানে অনেক দার্শনিক বিষয়ের আলোচনা হয়। Martinearuর ছাত্র ডাঃ রায় দেখিলাম ঈশ্বরে দৃঢ়বিশ্বাসী। বিদায় লইবার সময় তিনি আমাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "You are much indebted to Philosophy. Remember Philosophy expects from you something in return."

ইহার কয়েক মাস পরে আমি চাকুরীতে প্রবিষ্ট হই এবং ৩৩ বৎসর চাকুরীর পরে ১৯৩৫ সালে অবসর গ্রহণ করি। ডাঃ রায়ের কথা আমার প্রায়ই মনে হইত কিন্তু দর্শনের ঋণ কিরূপে পরিশোধ করিব ভাবিয়া পাইতাম না। Descartes-এর দর্শন লিখিয়া একবার রবীন্দ্রনাথকে দেখাইয়াছিলাম, কিন্তু আমার ব্যবহৃত কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ তাঁহার মনঃপূত হয় নাই। পাশ্চাত্ত্য দর্শনের পারিভাষিক শব্দগুলির অনুবাদ করা দেখিলাম বড়ই কঠিন। কাজের চাপে পড়া, ভাবা ও লেখা—এই তিন ব্যাপারে চাকুরীতে আবদ্ধ থাকাকালে বিশেষ সময় দিতে পারি নাই। অবসর গ্রহণ করিবার পরে পারিয়াছিলাম।

প্রাচীন কালে গ্রীসের সহিত ভারতীয় চিন্তার বিনিময় ছিল। গ্রীক দর্শনের উপর ভারতীয় দর্শনের এবং ভারতীয় দর্শনের উপর গ্রীক দর্শনের যে কোনও প্রভাব ছিল তাহা ম্যাকস্‌মূলার স্বীকার করেন নাই। কিন্তু ডাঃ রাধাকৃষ্ণন তাঁহার Eastern Religions and Western Thoughts গ্রন্থে গ্রীক দর্শনের উপর ভারতীয় দর্শনের প্রভাব যে ছিল, তাহা দেখাইতে চেষ্টা

করিয়াছেন। আমার পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাসে প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টে আমি দেখাইয়াছি যে, বৃহদারণ্যকোপনিষদে মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা হইতে দেখা যায় যে মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণের যাজ্ঞবল্ক্য বর্ণিত দর্শনের সহিত প্লেটোর দর্শনের বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

কিন্তু পাশ্চাত্ত্যের সহিত ভারতীয় চিন্তার এই বিনিময়সূত্র বহুদিন হইল ছিন্ন হইয়াছে। বর্তমানে টোলের দর্শনের অধ্যাপকদিগের চিন্তা প্রাচীন খাতেই প্রবাহিত হইতেছে। ইহার ফলে বহুদিন যাবৎ ভারতে নূতন কোনও দর্শনের উদ্ভব হয় নাই। ভারতীয় দর্শনের সংস্পর্শে আসিয়া পরবর্তীকালে পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদিগের প্রতিভার যে স্ফূরণ হইয়াছিল তাহা আমরা জানি। পাশ্চাত্ত্য সংঘাতেও আমাদের ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের প্রতিভার কিছু স্ফূর্তি হইবে ইহা আমার বিশ্বাস। তাহা যদি হয় তাহা হইলে বাংলায় পাশ্চাত্ত্য দর্শন প্রকাশিত করিয়া দর্শনরূপিণী দেবী সরস্বতীর নিকট আমার ঋণ কথঞ্চিৎ পরিশোধ হইবে কিনা জানি না।

এখন ভারতবর্ষে দর্শনের উদ্ভব ও বিকাশের কিছু বিবরণ দিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব।

প্রত্যেক জাতির প্রথম ধর্মই তাহার স্বাভাবিক প্রথম দর্শন। ভারতের প্রথম দর্শন তাহার বৈদিক ধর্ম, যাহা বেদে নিহিত আছে। বৈদিক ঋষিগণ প্রত্যেক প্রাকৃতিক সমুৎপাদের মধ্যে চৈতন্যময় এক শক্তির ক্রীড়া দেখিতে পাইতেন। বিভিন্ন সমুৎপাদে প্রকাশিত শক্তিকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করিলেও তাঁহারা জানিতেন যে একই শক্তি বিভিন্ন সমুৎপাদে প্রকাশিত। "একম্ সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি, অগ্নিং, যমং মাতরিশ্বানং আহুঃ"। সর্বত্র চৈতন্যময় শক্তির দর্শন যেমন আর্যধর্মের তেমনি আর্যদর্শনেরও প্রথম সোপান। যাবতীয় ধর্মকর্মের প্রথমেই আর্যসন্তানকে যে বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিতে হয় (তৎ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যান্তি সূরয়ঃ, দিবীব চক্ষুরাততম্) সেই আচমন-মন্ত্রে সেই এক চিৎশক্তিকে সূরীদিগের নিকট সূর্যের ন্যায় প্রকাশিত বলা হইয়াছে। যে শক্তিকে আর্য ঋষিগণ প্রকৃতির বিভিন্ন সমুৎপাদের মধ্যে দেখিয়াছেন, তাঁহাকেই আবার জীবজগতে সহস্রশীর্ষ, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাদ জীবরূপে দেখিতে পাইয়াছেন এবং মানবসমাজের বিভিন্ন অংশ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকে এক বিরাট পুরুষের বিভিন্ন অঙ্গরূপে দেখিয়াছেন। সেই পুরুষকেই আবার গায়ত্রীমন্ত্র সবিতার বরেণ্য (সূর্যমণ্ডলে অধিষ্ঠিত দেবতারূপে) এবং মানুষের মধ্যে তাঁহার ধীর (প্রজ্ঞা) ভর্গরূপে অধিষ্ঠিত দেখিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন, সৃষ্টির পূর্বে দিবা

বা রাত্রি, সৎ বা অসৎ (প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত) কিছুই ছিল না; ছিলেন কেবল শিব। সেই শিবই অক্ষর, তিনি সবিতার বরেণ্য এবং তাঁহার প্রজ্ঞাই মানুষে প্রসৃত হইয়াছে। এই সর্বব্যাপী পুরুষের কথা বহু ঋষি কর্তৃক বিবিধ ছন্দে (উপনিষদে)) পৃথক পৃথক ভাবে ব্রহ্মসূত্রে (বেদান্তসূত্রে) গীত হইয়াছে:

ঋষিভির্বহুধাগীতম্ ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভিঃ বিনিশ্চিতৈঃ ॥—গীতা

কিন্তু বেদের সময়ও অন্যমতাবলম্বী লোকও ছিল। বেদে তাহাদের উল্লেখ আছে। পরে সেই মতই বার্হস্পত্য বা চার্বাক দর্শনরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। এই দর্শনে স্থায়ী আত্মারূপ কোনও বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই।

বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মও কেবল দেববিরোধী বলিয়া নহে, নিরীশ্বর বলিয়াও নাস্তিক। বুদ্ধ সকল বস্তুই ক্ষণিক বলিয়াছেন, স্থির আত্মা ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করেন নাই—ইহাই অনেকের মত। কিন্তু বুদ্ধ ইহাও বলিয়াছেন যে, "এমন কিছু আছে যাহার জন্ম হয় নাই, যাহার সৃষ্টি হয় নাই, যাহা উৎপন্ন হয় নাই, যাহা একাধিক বস্তুর সংযোগে উদ্ভূত হয় নাই। তাহা যদি না থাকিত, যদি অজাত, অনুৎপন্ন কোনও কিছুর অস্তিত্ব না থাকিত তাহা হইলে যাহার জন্ম হয় তাহার এ সংসার হইতে বাহির হইবার কোনও উপায় থাকিত না।" বুদ্ধের দর্শন চরিত্রমূলক। মানষের জীবনের সহিত যাহার সম্বন্ধ আছে তিনি কেবল তাহারই আলোচনা করিতেন। Metaphysical বা তাত্ত্বিক বিষয়ে তিনি নিজেও কোনও আলোচনা করেন নাই, করিতেও নিষেধ করিয়াছেন। তিনি নিজে কিছু লিখিয়া যান নাই। তাঁহার মৃত্যুর অনেক দিন তাঁহার শিষ্যগণ কর্তৃক তাঁহার উপদেশাবলী সংগৃহীত হয়। এই জন্য তাঁহার উপদেশ কি ছিল সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না। অনেকের মতে তিনি উপনিষদের ধর্মই প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু উপনিষদের ঋষিগণ দুঃখবাদী ছিলেন না। বুদ্ধ এই সংসারকে দুঃখের আগার বলিয়াই গণ্য করিতেন এবং এই দুঃখ হইতেই নিষ্কৃতির উপায় আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু বুদ্ধ জড়বাদী ছিলেন না। বস্তুবাদী জৈনদর্শনও বৌদ্ধদর্শনের মতো নিরীশ্বর হইলেও জড়বাদী নহে। জৈনমতে বস্তু ও তাহার বিজ্ঞান পৃথক। বস্তু বিজ্ঞানবাহ্য, জৈনমতে দৈহিক পরিবর্তন ও আত্মিক (মানসিক) পরিবর্তন সমকালবর্তী কিন্তু তাহাদের মধ্যে কার্যকারণসম্বন্ধ নাই। জীবের মানসিক অবস্থা তাহার কর্মের ফল। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক Geulinx, Deus-ex-machina-র দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জৈনমতে জ্ঞান একটি দুর্বোধ্য ব্যাপার।

বৌদ্ধ ও জৈনদর্শন উভয়ই জন্মান্তরবাদী। বুদ্ধের মতে জন্ম হইতেই দুঃখের উদ্ভব এবং নির্বাণ পর্যন্ত জন্ম ও মৃত্যু চলিতে থাকে। বুদ্ধ জন্ম-নিরোধের উপায়ের আবিষ্কার করিয়াছেন। তৃষ্ণা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া জন্মনিরোধের উপায়, তাহাই নির্বাণ। বুদ্ধের দৃষ্টি সামুৎপাদিক আপেক্ষিক জগতে বদ্ধ ছিল বলিয়া তিনি উপনিষদের ঋষিদিগের মত জগতের কেন্দ্রস্থিত এবং প্রতি মানবহৃদয়ে স্পন্দিত সার্বিক প্রাণের উল্লেখ করেন নাই। বুদ্ধ যে সার্বিক প্রাণের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন না, তাহা না হইতেও পারে। তিনি যে ইহার উল্লেখ করেন নাই ইহার কারণ ইহাও হইতে পারে যে তিনি এই সার্বিক প্রাণকে জ্ঞানগম্য বলিয়া মনে করিতেন না এবং তাহার অনুসন্ধান নিষ্ফল বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তিনি স্থির আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াও পুনর্জন্মের কথা বলিয়াছেন, ইহা কিরূপে সম্ভবপর হয় বোঝা কঠিন। আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহা এই—

বুদ্ধের মতে অন্তর্জগতে ও বহির্জগতে সকলই অনিত্য। আমরা যাহাকে জীবাত্মা বলি, তাহাও অনিত্য—নিত্য পরিবর্তনশীল। প্রতি ক্ষণে সংস্কার ও বিজ্ঞানের পরিবর্তন হয়, মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই পরিবর্তন চলিতে থাকে। মৃত্যু-কালেও এই পরিবর্তন হয়, কিন্তু বিজ্ঞান ও সংস্কারের সম্পূর্ণ বিলয় হয় না। যে সংস্কার ও বিজ্ঞান মৃত্যুকালে জীবদেহ ত্যাগ করে, তাহা পরিবর্তিত সংস্কার ও বিজ্ঞান, জীবদেহস্থিত সংস্কার ও বিজ্ঞান নহে। এই পরিবর্তিত বিজ্ঞান ও সংস্কারই নূতন জন্মগ্রহণ করে, তাহা স্থির আত্মা নহে। নির্বাণ পর্যন্ত এই নিত্যপরিবর্তনশীল বিজ্ঞানপ্রবাহ চলিতে থাকে—নিত্যপরিবর্তিত সংস্কার ও বিজ্ঞানের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইতে থাকে। কিন্তু প্রশ্ন থাকিয়া যায়—যে দুঃখের নিবৃত্তি নির্বাণ, সে দুঃখ কাহার? তাহার ভোক্তা কোথায়? দুঃখ আছে কিন্তু দুঃখের ভোক্তা নাই।

জৈনদর্শনে এক সম্পূর্ণ নূতন মত প্রপঞ্চিত হইয়াছে। এই মতে প্রত্যেক বস্তু অনন্তধর্মক, তাহার অসংখ্যরূপ ধর্ম আছে। কিন্তু প্রতিক্ষণেই তাহা বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। বস্তুর সকল গুণ পরিবর্তিত হয় না। কতকগুলি অপরিবর্তিত থাকিয়া যায়—তাই বস্তু সত্য, মিথ্যা নহে।

কোনও বস্তুর কোনও বর্ণনাই জৈনমতে সম্পূর্ণ সত্য নহে—সেইজন্য প্রত্যক বর্ণনার সঙ্গে "স্যাৎ" শব্দের প্রয়োগ করিতে হয়। এই অনেকান্তবাদ এবং স্যাৎবাদ জৈনদর্শনের বিশেষত্ব। জৈনদর্শনে ঈশ্বরের কথা নাই। এই মতে জড়ের সহিত আত্মার সংযোগই বন্ধ এবং বন্ধবিনির্মুক্ত অবস্থাই মোক্ষ। রাগ দ্বেষ ও আসক্তি থাকে না। তখন আত্মার অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি ও

অনন্ত সুখের উদ্ভব হয়। অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি ও অনন্ত সুখ ঐশ্বরিক অবস্থা। মোক্ষে আত্মা ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এক ঈশ্বর অস্বীকৃত হইলেও জৈনদর্শনে বহু ঈশ্বরের আবির্ভাব সম্মত।

ইহার পরে সূত্রাকারে সুশৃঙ্খল দর্শনের (systematic philosophy) আবির্ভাব হয়। বৈশেষিক, ন্যায়, সাংখ্য, যোগ, পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা ষড়দর্শন নামে খ্যাত। কিন্তু হরিভদ্রের "ষড়দর্শন সমুচ্চয়ে" বৌদ্ধদর্শন, ন্যায়, সাংখ্য, বৈশেষিক, পূর্বমীমাংসা, জৈনদর্শন ও চার্বাক দর্শন এই সাতটি দর্শন বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তের নাম নাই। জৈন হরিভদ্রের বেদান্তের প্রতি বিরাগ ছিল, তাই তিনি বেদান্তের নাম করেন নাই। বৈশেষিক, ন্যায়, সাংখ্য, যোগ, পূর্বমীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা আস্তিক দর্শন বলিয়া পরিচিত। বেদের প্রামাণ্য এই সকল দর্শনে স্বীকৃত বলিয়া ইহারা আস্তিক। কিন্তু ইহাদের মধ্যে সাংখ্য ও পূর্বমীমাংসায় ঈশ্বরের স্বীকৃতি নাই। বৈশেষিক দর্শনে ঈশ্বরের নামই নাই কিন্তু "তদ্বচনাৎ আম্নায়স্য প্রামাণ্যম্" (ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া বেদের প্রামাণ্য)—এই সূত্রে "তদ্" শব্দে ঈশ্বর সূচিত হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় তদ্ শব্দ ব্রহ্মের একটি নাম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। (ওঁ তৎ সৎ ইতি নির্দেশো ব্রাহ্মণ স্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ)। ন্যায়দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত বটেন কিন্তু ইহাতে মুক্তিতে আত্মা শিলাত্ব প্রাপ্ত হয় বলা হইয়াছে। নৈষধকার তাই পরিহাস করিয়া বলিয়াছেন—

মুক্তয়ে যঃ শিলাত্বায় শাস্ত্রমূচে সচেতসাম্
গোতমং তম্ অবেত্যৈবং যথা বিথ তথা হি সঃ॥

যিনি মুক্তির জন্য রচিত শাস্ত্রে মুক্তিকে শিলাত্ব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন সেই গোতমকে যাহা মনে কর তিনি তাহাই। (গোতম = গোতম ঋষি। গো-তম = শ্রেষ্ঠ গরু) এই শ্লোকে গোতম ঋষিকে গরু বলা হইয়াছে।

ইহলোকে ও পরলোকে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স-প্রাপ্তি বৈশেষিক দর্শনের প্রয়োজন। নিঃশ্রেয়স-প্রাপ্তি হয় তত্ত্বজ্ঞান হইতে। তত্ত্বজ্ঞান হয় দ্রব্যগুণ, ক্রিয়া, সামান্য, বিশেষ, ও সমবায়—এই ছয় পদার্থের সাধর্ম ও বৈধর্মের জ্ঞান হইতে। তাই বৈশেষিক দর্শনে জগতের স্বরূপের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই মতে নিঃশ্রেয়স-প্রাপ্তির জন্য উপাসনাকর্ম ও ভক্তি অপরিহার্য নহে। কণাদ ঈশ্বরকে জগৎস্রষ্টা ও মুক্তিদাতারূপে উপস্থাপিত করেন নাই। তাঁহার মতে দুঃখনিবৃত্তি ও জন্মমৃত্যু চক্র হইতে মুক্তিই মোক্ষ। ন্যায় ও বৈশেষিক উভয়

দর্শনেই পরমাণুকে জড়জগতের উপাদান বলা হইয়াছে। শঙ্করাচার্য এই পরমাণুবাদের বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছেন।

অধ্যাপক দাশগুপ্তের মতে এক সময় বৈশেষিক দর্শন পূর্বমীমাংসার এক শাখা ছিল। কণাদের প্রথম সূত্রে ধর্মের ব্যাখ্যাই তাঁহার দর্শনের উদ্দেশ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পূর্বমীমাংসার প্রথম সূত্রও "অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা"; কিন্তু বৈশেষিকের প্রধান উদ্দেশ্য পদার্থদিগের স্বরূপের বর্ণনা বলিয়াই মনে হয়। ধর্মব্যাখ্যার সহিত ইহার বিশেষ সম্বন্ধ নাই। কণাদসূত্রের শেষে উক্ত হইয়াছে যে বেদবিহিত কর্মের ফল যেখানে দেখিতে পাওয়া যায় না, সেখানে পারলৌকিক অভ্যুদয়ই সেই কর্মের ফল বলিয়া বুঝিতে হইবে, কেননা বেদ কখনও মিথ্যা হইতে পারে না। ধর্ম ব্যাখ্যা করিব—এই প্রতিজ্ঞা করিয়া অদৃষ্টের দ্বারা অনেক ব্যাপারের ব্যাখ্যা করিয়া কণাদ বলিতে চাহেন, বৈদিক কর্মদ্বারা উৎপন্ন অদৃষ্টই অধিকাংশ ব্যাপারের কারণ, দ্রব্যগুণ ও ক্রিয়ার দ্বারা সকল ব্যাপারের ব্যাখ্যা করা যায় না। অদৃষ্ট স্বীকার না করিলে অনেক ব্যাপার অ-ব্যাখ্যাত থাকিয়া যায়। চুম্বক-লৌহের দিকে সূচির গতি, বৃক্ষ-শরীরে জলের অভিসর্পণ, অগ্নির ঊর্দ্ধগমন, বায়ুর তির্যক গমন, ভুক্ত ও পীত দ্রব্যের সমীকরণ, মাতৃগর্ভে ভ্রূণের বিকাশ—সকলই অদৃষ্টকৃত। প্রত্যক্ষ কারণদ্বারা যে সকল ব্যাপারের ব্যাখ্যা করা যায় না, কণাদের মতে তাহাদের কাবণ অদৃষ্ট। যখন বৈশেষিক দর্শনে ঈশ্বরের কোনও উল্লেখ নাই এবং বেদের প্রমাণের উপর অদৃষ্টবাদ প্রতিষ্ঠিত, তখন এ বিষয়ে মীমাংসা দর্শনের সহিত কণাদ দর্শনের ভেদ নাই—ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। এই হেতু অধ্যাপক দাশগুপ্ত অনুমান করেন, মীমাংসা দর্শনের মতো বৈশেষিক দর্শনও নিরীশ্বরবাদী ছিল এবং বৈশেষিক দর্শন মীমাংসা দর্শনের এক শাখা ছিল। কিন্তু এ মত সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। "তদ্বচনাৎ আম্নায়স্য প্রামাণ্যম্" এই সূত্রে ঈশ্বর স্পষ্টই স্বীকৃত।

ন্যায়দর্শনের জ্ঞানবাদ দর্শনের ইতিহাসে তাহার প্রধান দান। ভারতীয় দর্শন ধর্মমূলক ও যুক্তিবর্জিত বলিয়া তাহার একটা অপবাদ আছে। ন্যায়-দর্শন এই অপবাদের প্রতিবাদ। উপনিষদে যে 'বাকো বাক্য" নামক শাস্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়, গোতমের ন্যায়সূত্র তাহারই বিকাশপ্রাপ্ত রূপ। সত্যের সমস্যা সমাধানে ন্যায়দর্শনে তর্কের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং যুক্তির দ্বারা তাহা সমর্থিত হইয়াছে। দর্শনের অভিব্যক্তির ইতিহাসে ন্যায়দর্শন একটি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য ক্রম। কিন্তু ইহা একতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত দর্শন নহে। যাহা "নব্য ন্যায়" বলিয়া খ্যাত তাহার আবির্ভাব হয় মিথিলায়।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপে তাহা বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল। রঘুনাথ শিরোমণি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত বাংলা দেশে গত সহস্র বৎসরের মধ্যে আবির্ভূত হন নাই। ষড়্দর্শনের মধ্যে বাংলা দেশে ন্যায়দর্শনের চর্চাই সর্বাপেক্ষা অধিক পূর্বেও ছিল, এখনও আছে। গত কয়েক শত বৎসরে বাংলায় নবদ্বীপে ও অন্যত্র বহু বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত আবির্ভূত হইয়াছেন।

জৈমিনির পূর্বমীমাংসায় বেদের কর্মকাণ্ডের প্রত্যেক অঙ্গের বিচার করিয়া বৈদিক কর্মসকলের "অপূর্ব্ব" নামক শক্তির উৎপাদন-ক্ষমতা অবধারিত হইয়াছে। এই সমস্ত কর্মের পুত্রকলত্রাদি ঐহিক সম্পদ উৎপাদনক্ষমতা ব্যতীত স্বর্গফল প্রদান করিবার সামর্থ অবধারিত হইয়াছে এবং দ্বিজাতির কর্তব্য বিস্তারিতভাবে বিবৃত হইয়াছে। বেদমন্ত্রসকলের ব্যাখ্যার নিয়মাবলী এবং কর্মকাণ্ডের দার্শনিক ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে। কর্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ডের পূর্ববর্তী বলিয়া এই দর্শনের নাম পূর্বমীমাংসা। ইহার দুই জন ভাষ্যকারের নাম কুমারিল ভট্ট ও প্রভাকর। এই দর্শন বস্তুবাদী। সংবিদে যাহার স্পষ্টরূপে অনুভব হয় তাহার বাস্তব অস্তিত্ব ইহাতে স্বীকৃত। ইহাতে মায়াবাদের কোনও স্থান নাই। এই দর্শনের অনুযায়ীদিগের সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদগীতায় উক্ত হইয়াছে :—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ।।
কামাত্মনোঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং।
ক্রিয়াবিশেষ-বহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি।।
ভোগৈশ্বর্য্য-প্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাং।
ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে।।

পূর্বমীমাংসা ষড়্দর্শনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহাতে বৌদ্ধমতের সমালোচনা আছে। ইহাতে বাদরায়ণের নামও আছে, আবার বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রেও জৈমিনির নাম আছে।

ষড়্দর্শনের মধ্যে সাংখ্যদর্শন সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া অনেকের মত। মহাভারতে আছে—

জ্ঞানং মহৎ যদ্ধি জ্ঞানেষু রাজন্।
বেদেষু ধর্ম্মেষু তথৈব যোগে।।
যচ্চাপি দৃষ্টং বিবিধে পুরাণে।
সাংখ্যাগতং তৎ নিখিলং নরেন্দ্র।। (মহা....শান্তি)

সাংখ্যাদর্শন নিরীশ্বর ও দুঃখবাদী। জগৎ দুঃখময়। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখ হইতে মানবকে উদ্ধার করিবার জন্যই সাংখ্যদর্শনের প্রয়োজন। সাংখ্যকারিকা, সাংখ্যপ্রবচনসূত্র ও তত্ত্বসমাস এই তিনখানি গ্রন্থ সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে পাওয়া গিয়াছে কিন্তু এই গ্রন্থত্রয়ের কোনখানিই কপিল-প্রণীত নহে। সাংখ্যকারিকার রচয়িতা ঈশ্বরকৃষ্ণ। এই গ্রন্থ সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় প্রথম হইতে তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে রচিত। ইহাতে ঈশ্বরের নামগন্ধই নাই। ঈশ্বরকৃষ্ণকে কেহ কেহ বৌদ্ধ বলিয়া মনে করেন। সাংখ্যপ্রবচনসূত্র কপিল-রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ কিন্তু অনেকের মতে এই সূত্রগুলি চতুর্দশ শতাব্দীর পরে রচিত, কপিল-রচিত সূত্রাবলী লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। প্রচলিত সাংখ্যসূত্রে "ঈশ্বরাসিদ্ধে" এই সূত্রটি আছে। গার্বের মতে সাংখ্য সূত্রের উপর বেদান্তের প্রভাব সুস্পষ্ট। কেহ কেহ বলেন উক্ত গ্রন্থের ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু ঐ সূত্রাবলী রচনা করিয়াছিলেন। এই মত অগ্রাহ্য। ইহার মধ্যে কপিল-রচিত অনেকগুলি সূত্র যে আছে তাহাতে সন্দেহ নাই, সামান্য কয়েকটি সূত্র বিজ্ঞানভিক্ষু রচনা করিয়া থাকিতে পারেন। বিজ্ঞানভিক্ষু প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে সাংখ্যসূত্রের সহিত ব্রহ্মের নির্বিশেষ একত্ব, তাহার আনন্দরূপত্ব এবং স্বর্গলোকে নিঃশ্রেয়স-প্রাপ্তির বিরোধ নাই। কিন্তু ইহা অসাধ্য সাধনের চেষ্টা।

ম্যাক্স্‌মূলার তত্ত্বসমাসকে প্রাচীন কপিলসূত্র বলিয়াছেন। তত্ত্বসমাসে পুরুষকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলা হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইহাই ছিল প্রাচীন সাংখ্যমত।

সাংখ্যদর্শন দ্বৈতবাদী—একদিকে প্রকৃতি অন্যদিকে অসংখ্য পুরুষ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। পুরুষ শুদ্ধ চিৎস্বরূপ। তাহার সান্নিধ্যে প্রকৃতি হইতে মহৎ, (বুদ্ধি) অহংকার, মনঃ ও ইন্দ্রিয়াদির অভিব্যক্তি হয়। ইহাদের সংস্পর্শে পুরুষ বদ্ধ হয়। ইহাদের সংস্পর্শ হইতে মুক্তিই মোক্ষ। ইহাই সংক্ষেপে সাংখ্যদর্শন। বুদ্ধি, মন, জ্ঞান, সুখদুঃখ প্রভৃতি যাহা আমরা অজড় বলিয়া জানি, সাংখ্যমতে তাহা সকলই জড়। সাংখ্যে ঈশ্বর অস্বীকৃত হইলেও বেদ প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত। ঈশ্বর (ব্রহ্ম) বেদের জ্ঞানকাণ্ডের আদি অন্ত ও মধ্য। বেদকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া সাংখ্য ঈশ্বরকে কিরূপে অস্বীকার করেন তাহা বুঝিতে পারা যায় না। মহাভারতে ও চরকদর্শনে সাংখ্যের যে রূপ পাওয়া যায় তাহা সেশ্বর। প্রাচীন সাংখ্য যে নিরীশ্বর ছিল না, তাহার অনেক প্রমাণ আছে।

পতঞ্জলির যোগদর্শনে সাংখ্যের তত্ত্বাবলী গৃহীত হইয়াছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে

ঈশ্বরবাদও তাহাতে স্বীকৃত। যোগদর্শনকে "সেশ্বর সাংখ্য" বলা হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্দে যে সাংখ্যদর্শন বিবৃত হইয়াছে তাহাও সেশ্বর সাংখ্য। তাহার বক্তা কপিল মাতা দেবহূতিকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাই শ্রীমদ্ভাগবতে সাংখ্যদর্শন বলিয়া বর্ণিত। নিরীশ্বর বলিয়া যে দেশে চার্বাকমত ঘৃণার সহিত বর্জিত হইয়াছে, নিরীশ্বর সাংখ্য সেই দেশে শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হইয়াছে ইহা সম্ভবপর নহে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় সাংখ্য ও বেদান্তের মধ্যে যে সমন্বয়-চেষ্টা দেখা যায় তাহাদ্বারাও প্রমাণিত হয় যে মৌলিক সাংখ্য নিরীশ্বর ছিল না।

যোগদর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত কিন্তু তিনি জগতের উপাদানের স্রষ্টিকর্তা একথা বলা হয় নাই। তাহাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিলাভের অন্যতম উপায়রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।

"ঈশ্বর প্রণিধানাৎ বা" এই সূত্রটিতে ব্যবহৃত "প্রণিধান" শব্দ ব্যাসভাষ্যে "প্রকৃষ্ট ভক্তি" অর্থে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ঈশ্বরপ্রাপ্তিকে যোগের লক্ষ্য বলা হয় নাই। যোগের দ্বারা অলৌকিক অনেক শক্তি লাভ করা যায়। ইহার বিস্তৃত বিবরণ পাতঞ্জল দর্শনে আছে। কিন্তু কৈবল্যপ্রাপ্তির পর পুরুষ কি অবস্থায় থাকে তাহা বলা হয় নাই।

বেদের শেষ ভাগ উপনিষদ—জ্ঞানকাণ্ড। উপনিষদই বেদান্ত। সকল উপনিষদেই ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত হইলেও বিভিন্ন উপনিষদে বর্ণিত ব্রহ্মতত্ত্বের মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য নাই। তাই মহর্ষি বাদরায়ণ তাহাদের সারমর্ম সূত্রাকারে গ্রথিত করিয়া তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণিত সূত্রাবলীর নাম ব্রহ্মসূত্র। গীতায় ইহার উল্লেখ আছে। ইহার এক নাম শারীরক সূত্র। শরীরে অধিষ্ঠিত জীবের সুখ দুঃখের নাম শারীরক। বেদের শেষকাণ্ড বাদরায়ণের দর্শনের বিষয় বলিয়া ইহার নাম উত্তরমীমাংসা। ইহাতে জৈন ও বৌদ্ধমতের সমালোচনা আছে। ব্রহ্মসূত্রের বহু ভাষ্য আছে, তাহাদের মধ্যে বোধায়ন রচিত ভাষ্যই সর্বপ্রাচীন বলিয়া খ্যাত। সে ভাষ্য এখন অপ্রাপ্য। রামানুজের ভাষ্য তাহার অনুযায়ী বলিয়া কথিত। শঙ্করভাষ্য রামানুজের ভাষ্যের পূর্ববর্তী। তাহা নির্বিশেষাদ্বৈতবাদী। ইহার সার কথা—ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। সমগ্র জগৎ ব্রহ্মে অধ্যস্ত। রামানুজের ভাষ্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। তাঁহার মতে ব্রহ্ম অসঙ্গ (Absolute) হইলেও তাঁহার বিশেষ বিশেষ রূপও আছে। শঙ্কর ব্রহ্মের বিশেষ রূপ স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে জগৎ মায়া—তাহার পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই। রামানুজ ভেদাভেদবাদী। তাঁহার মতে জীব ব্রহ্মের অংশ। নিম্বার্কের ভাষ্যও ভেদাভেদবাদী। শঙ্করের গুরু গোবিন্দের গুরু গৌড়পাদ

ও শঙ্কর উভয়েই অষ্টম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। গৌড়পাদের কারিকার সহিত বৌদ্ধদর্শনের সাদৃশ্য এত অধিক যে অনেকে তাঁহাকে বৌদ্ধ বলিয়া মনে করে। ইহাতে বুদ্ধের স্তুতিও আছে। শঙ্করবিরোধীগণ শঙ্করের দর্শন মায়াবাদকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ বলেন। চৈতন্যদেব মায়াবাদকে নাস্তিকতা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন--

বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় তো নাস্তিক
বেদাশ্রয় নাস্তিক্যবাদ তাহাবও অধিক।

চৈতন্যদেবের দর্শন জীব গোস্বামী কর্তৃক বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহার নাম অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ। মধ্বাচার্য রচিত বেদান্তভাষ্য সম্পূর্ণ দ্বৈতবাদী। মধ্বের মতে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ কখনও বিদূরিত হয় না। তাঁহার মত তত্ত্ববাদ নামে খ্যাত। এই মতে ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত-কারণমাত্র, উপাদান-কারণ নহেন।

শঙ্করের পরে তাঁহার ভাষ্যের বহু টীকা রচিত হইয়াছিল। বাঙ্গালী মধুসূদন সরস্বতী বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁহার জন্ম হয় খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে। শঙ্করের মত খণ্ডনের উদ্দেশ্যে তাঁহার মত ভাল করিয়া জানিবার জন্য তিনি বারাণসী গমন করেন, তথায় শঙ্করের ভাষ্য পড়িয়া তাঁহার মত পরিবর্তিত হইয়া যায় এবং তিনি নিজেই অদ্বৈতমত গ্রহণ করিয়া "অদ্বৈত সিদ্ধ" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। কথিত আছে ইহার পরে মধুসূদনের মত আবার পরিবর্তিত হয় এবং তিনি পুনবায় বৈষ্ণব মত গ্রহণ করেন। নিম্নলিখিত শ্লোক মধুসূদনের রচিত বলিয়া কথিত হয়:—

ধ্যানাভ্যাস-বশীকৃতেন মনসা তন্নির্গুণং নিষ্ক্রিয়ং।
জ্যোতিঃ কিঞ্চন যোগিনঃ যদি পশ্যন্তি পশ্যন্তু তে।।
অস্মাকন্তু তদের লোচন চমৎকারায় ভূযাৎ চিরম্।
কালিন্দী পুলিনেষু যৎ কিমপি তন্নীলং মনো ভাবতি।।

(ধ্যানাভ্যাস দ্বারা বশীকৃত চিত্ত যোগিগণ নির্গুণ নিষ্ক্রিয় এক জ্যোতি যদি দেখেন তো দেখুন। আমাদের মন যমুনাতটে লোচনতৃপ্তিকার সেই নীল রূপের দিকে ধাবিত হয়)।

মধুসূদন প্রস্থানভেদ নামক আর-একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি ষড়দর্শন, পাশুপত ও পাঞ্চরাত্র দর্শনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়া লিখিয়াছেন, এই সকল দর্শনে তিনটি মত ব্যক্ত হইয়াছে—(১) আরম্ভবাদ বা

পরমাণুবাদ (২) পরিণামবাদ বা অভিব্যক্তিবাদ (৩) বিবর্তবাদ বা মায়াবাদ। তার্কিক ও মীমাংসকদিগের (ন্যায়, বৈশেষিক ও পূর্বমীমাংসা) মতে জগতের অস্তিত্ব ছিল না কিন্তু তাহার কারণ ছিল। সেই কারণ হইতেই জগৎরূপ কার্যের উৎপত্তি হইয়াছে। পরিণামবাদ সাংখ্য, পাতঞ্জল ও পাশুপতদিগের। এই মতে কার্যজগৎ তাহার উদ্ভবের পূর্বে সূক্ষ্মরূপে বর্তমান ছিল এবং তাহার কারণ দ্বারা স্থূলরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। তৃতীয় মত ব্রহ্মবাদীদিগের। এই মতে স্বপ্রকাশ আনন্দরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম মায়াবশে জগৎরূপে প্রতিভাত হন। এই সকল মত বিভিন্ন হইলেও ইহাদের প্রবর্তক ঋষিদিগের সকলেরই ইচ্ছা ছিল এক অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রমাণ করা। বিবর্তবাদ এই সকল মতের শেষ পরিণাম। সর্বজ্ঞ ভ্রমপ্রমাদহীন ঋষিগণ যে ভিন্ন ভিন্ন মতের প্রচার করিয়াছেন তাহার কারণ এই যে তাঁহাদের সকলেরই উদ্দেশ্য ছিল বৈনাশিক মতসকলের নিরোধ করা। পার্থিব বিষয়ে আকৃষ্ট মানুষকে ক্রমে ক্রমে সত্যের পথে লইয়া যাইবার জন্য ঋষিগণ চেষ্টা করিয়াছেন। 'অদ্বৈত সিদ্ধি'' গ্রন্থে মধুসূদন দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ অবলম্বন করিয়া দৃষ্ট সকল বস্তুই জীবের নিজের সৃষ্ট বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই মতকে ইংরাজীতে বলে Solipsism।

সর্বোপনিষদের সারভাগ যেমন বেদান্তসূত্রে তেমনি ভগবদ্গীতায়ও বর্ণিত হইয়াছে। ভারতের ইতিহাসে এক সঙ্কটপূর্ণ সময়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বেদান্তের সারভাগ বলিয়াছিলেন। গীতায় জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয় সাধিত হইয়াছে এবং সাংখ্যের নিরীশ্বরবাদ ঈশ্বরবাদে পরিণত হইয়াছে। ইহাতে ক্ষর, অক্ষর ও উত্তম নামে তিন পুরুষের উল্লেখ আছে। এই তিন পুরুষ এক পুরুষেরই ভিন্ন ভিন্ন বিভাব (Aspect)। ক্ষর পুরুষ 'সর্বাণি ভূতানি''—তিনি সর্ব ভূতে-চেতন ও অচেতন যাবতীয় পদার্থরূপে প্রকাশিত। নিত্য পরিবর্তনশীল বিশ্বে ক্রিয়মাণ সার্বিক আত্মাই (Universal soul) ক্ষর পুরুষ। কূটস্থ নিষ্ক্রিয় অচঞ্চল পুরুষ অক্ষর। তৃতীয় পুরুষ ক্ষর অক্ষর উভয়ের উর্দ্ধে পুরুষোত্তম। তিনি নিখিল জগৎ ধারণ করিয়া আছেন। উপাসকগণ তাঁহাকে ভগবান বলিয়া উপাসনা করেন।

গীতায় দৈব ও আসুর নামে দ্বিবিধ জীবের বর্ণনা আছে। আসুরজন ধর্মে প্রবৃত্তি ও অধর্ম হইতে নিবৃত্তি কি তাহা জানে না।

"অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহু রনীশ্বরম্
অপরস্পর সম্ভূতম্ কিমন্যৎ কামহেতুকম্।"

ষড়দর্শন ব্যতীত আরও বহু দর্শন ভারতে উদ্ভূত হইয়াছে। শৈব দর্শন, শাক্ত দর্শন ও বৈষ্ণব দর্শন তাহাদের মধ্যে। শৈব দর্শন অতি প্রাচীন ; মহেঞ্জো-দাড়ো ও হারাপ্পাতে প্রাচীন সভ্যতার যে সকল নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩০০০ অব্দে ভারতে শিব ও শক্তিপূজা প্রচলিত ছিল। Sir John Marshalএর মতে মহেঞ্জোদাড়ো ও হারাপ্পার অধিবাসিগণ ত্রিনেত্র ও যোগাসনে উপবিষ্ট এক পুরুষদেবতার সহিত এক স্ত্রীদেবতার উপাসনা করিত। দাক্ষিণাত্যে শৈব ধর্ম বিশেষ প্রভাবশালী ছিল এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সহিত ইহাকে অনেক দিন সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। (১) নকুলীশ পাশুপত দর্শন (২) শৈব দর্শন (৩) প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন (৪)রসেশ্বর দর্শন নামে চারি প্রকার শৈব দর্শন আছে। তামিলদিগের মধ্যে প্রচলিত শৈব দর্শনের নাম শৈব সিদ্ধান্ত। এই মতে শিবই পরম তত্ত্ব—সর্বশক্তিমান ও আনন্দময়। তিনি জগতের সৃষ্টিকর্তা ও নিমিত্তকারণ, মায়া উপাদানকারণ। জগৎ মিথ্যা নহে—জড় ও আত্মা উভয়ই অনাদি। শিব অসঙ্গ (Absolute) হইলেও করুণাময়, কল্প কল্প ধরিয়া তিনি জীবের প্রেম ও পূজার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন। প্রত্যেক জীবের সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত সম্বন্ধ আছে। মায়া তাঁহার শক্তি।

কাশ্মীরের শৈব দর্শন প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন নামে খ্যাত। ইহা অদ্বৈতবাদী। অভিনবগুপ্ত এই দর্শনের একজন প্রধান আচার্য।

প্রত্যভিজ্ঞা শব্দের অর্থ চেনা—আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া চিনিতে পারাই প্রত্যভিজ্ঞা।

শাক্ত দর্শনের মূল বেদে নিহিত। ঋগ্‌বেদের একটি সূক্তের নাম দেবী-সূক্ত। দশম মণ্ডলে রাত্রিদেবীর কথা আছে। তিনি ও দেবীসূক্তের দেবী অভিন্না। কেনোপনিষদে এই দেবীই উমা। তিনি দেবতাদিগের নিকট আবির্ভূতা হইয়া বলিয়াছিলেন যে তাঁহাদিগের সমস্ত শক্তি তাঁহারই। এই শক্তি পুরাণে চণ্ডী নামে খ্যাত। এই দর্শন তন্ত্রসাহিত্যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বহুদিন পর্যন্ত তন্ত্রশাস্ত্র অবজ্ঞাত ছিল। Sir John Woodroffe কয়েকখানি তন্ত্রের অনুবাদ করিয়া তাহাদের দিকে শিক্ষিতসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ শাক্ত দর্শনের ইতিহাসকে (১) প্রাচীন বা প্রাগ্‌বৌদ্ধ ও প্রাগৈতিহাসিক (২) মধ্য বা বুদ্ধোত্তর ও (৩) আধুনিক এই তিন যুগে বিভক্ত করিয়াছেন।

শক্তি শিবেরই শক্তি। শিব অসঙ্গ ও নিষ্ক্রিয়, সর্বব্যাপী ও সার্বিক চৈতন্য, প্রকাশস্বরূপ। তিনি বিশুদ্ধ সত্তা—সর্বসম্বন্ধবিবর্জিত সার্বিক

তত্ত্ব। শক্তি সচ্চিদানন্দরূপিণী, তাঁহাকে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়রূপেই ধ্যান করা যায়। অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপ শিবে শক্তি গূঢ়রূপে অবস্থিত। শিব প্রকাশ, শক্তি বিমর্ষ। পরম তত্ত্বের মধ্যে যে স্বয়ম্ভূত স্পন্দনক্রিয়া তাহাই বিমর্ষ। অসঙ্গ চৈতন্যের পুরুষত্বপ্রাপ্ত অবস্থা শক্তি। তখন তিনি বিষয়ীতে পরিণত হন। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়েব উদ্ভব হয়। শক্তি চিৎরূপিনী—সৃষ্টি শক্তি। শিব অনবচ্ছিন্ন নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম, শক্তি অবচ্ছিন্ন ইচ্ছা, জ্ঞানও ক্রিয়া সমন্বিত ব্রহ্ম। অদ্বৈত শাক্ত দর্শনে মায়া ও প্রকৃতি অভিন্ন। মায়া শক্তির গর্ভস্থিত। তাহা হইতে বিশ্বের উদ্ভব হয়। প্রলয়ে মায়া সুপ্ত থাকে, সৃষ্টিকালে সক্রিয় হয়। শৈব দর্শনের ন্যায় শাক্ত দর্শনেও তত্ত্বসংখ্যা ৩৬টি। পরমেশ্বরের আনন্দের মধ্যে মিশিয়া যাওয়াই নির্বাণ। যিনি সর্ববস্তুতেই ব্রহ্মদর্শন করেন তাঁহার যোগ অথবা উপাসনার প্রয়োজন নাই। "অহং ব্রহ্ম" এই জ্ঞান হইতেই মুক্তি হয়। তন্ত্রেব সাধনায় সকলেবই অধিকার আছে।

আস্তিক ষড়দর্শন ব্যতীত খ্রীষ্টীয় প্রথম কযেক শতাব্দীতে বৌদ্ধদিগের মধ্যে অনেক দর্শনেব উদ্ভব হইয়াছিল। তাহাদেব মধ্যে বৈভাষিক দর্শন, সৌত্রান্তিক দর্শন, যোগাচার (বিজ্ঞানবাদ) এবং মাধ্যমিক দর্শন (শূন্যবাদ) প্রধান।

ব্রাডলে এক স্থানে লিখিয়াছেন যাহা সহজাত সংস্কারবশে আমরা বিশ্বাস কবি তাহার জন্য ভ্রান্তযুক্তির অনুসন্ধানই তাত্ত্বিক দর্শন। (Metaphysics) কিন্তু এবম্বিধ যুক্তির অনুসন্ধানও সহজাত সংস্কারের ফল। তাঁহার মতে প্রতিভাস হইতে স্বতন্ত্রভাবে সৎকে জানিবার প্রচেষ্টা অথবা প্রথম তত্ত্বাবলী বা চরম সত্যের অনুশীলন অথবা বিশ্বকে খণ্ডশঃ না বুঝিয়া সমগ্রভাবে বুঝাবার প্রচেষ্টাই তাত্ত্বিক দর্শন। বুদ্ধ তাত্ত্বিক বিষয়ের আলোচনা করিতেন না এবং সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতেও নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে তাত্ত্বিক বিষয়ে মতভেদের জন্য তাঁহার শিষ্যগণ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়েন। বুদ্ধের মতকে প্রত্যক্ষবাদ (Positivism) অথবা অভিজ্ঞতাবাদ (Empiricism) অথবা সামুৎপাদিকবাদ (Phenomenalism) বলা যায়। তাঁহার মতের অর্থ লইয়া মতভেদের উৎপত্তি হয়। বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক-বাদ সর্বাস্তিবাদী। উভয় মতেই ভৌতিক ও মানসিক উভয়াবধ পদার্থের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকৃত। "মহাভাষ্য" বৈভাষিক দর্শনের প্রধান ভাষ্য। বসুমিত্র ও তাঁহার সহযোগী তিনশত অর্হৎ কর্তৃক ইহা রচিত। অভিজ্ঞতা হইতে আমরা বাহ্যজগতের জ্ঞান লাভ করি। এই জ্ঞান সত্য। অনুমানের দ্বারা বাহ্য বস্তুর জ্ঞান লাভ হয় না। যে অতীতে অগ্নি ও ধূম একত্রে দেখে নাই, ধূম দেখিয়া

সে অগ্নির অস্তিত্ব অনুমান করিতে পারে না। সৌত্রান্তিক মতে মন এবং বাহ্যবস্তু উভয়ের অস্তিত্ব স্বীকৃত। বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব না থাকিলে বাহ্যবস্তু-রূপে কিরূপে বিজ্ঞানের প্রতীতি হয় তাহার ব্যাখ্যা করা যায় না। "বন্ধ্যা-মাতা"র সন্তান যেমন অর্থহীন বাহ্যবস্তুর আস্তত্ব না থাকিলে "বাহ্যবস্তুসদৃশ" এই কথা অর্থহীন হইয়া পড়ে। সৌত্রান্তিক মতে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব আমরা অবগত হই অনুমানের দ্বারা। তাহারা প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। বিজ্ঞান বাহিবে অবস্থিত বস্তুর রূপ ধারণ করে, আমরা সেই রূপের জ্ঞান লাভ করি এবং তাহাব কারণস্বরূপ বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব অনুমান করি। বাহিরে বস্তু না থাকিলে মনে তাহার রূপের উৎপত্তি হইতে পারে না।

অসঙ্গ ও তাঁহার ভ্রাতা বসুবন্ধু বিজ্ঞানবাদের (যোগাচার) প্রবর্তক। প্রসিদ্ধ দিঙ্‌নাগ বসুবন্ধুর গুরু ছিলেন। দিঙ্‌নাগ এবং শীলভদ্র বিজ্ঞানবাদী (যোগাচার) সম্প্রদায়ের আচার্য ছিলেন। শীলভদ্র নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। ইউয়ানচুয়াঙ্ তাঁহার নিকট বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। যোগাচার মতে বাহ্যজগতের অস্তিত্ব নাই। যাহা আমরা বাহ্যজগৎ বলিয়া অনুমান করি তাহার স্থিতি আমাদের মনের মধ্যে, মনের বাহিরে তাহাদের কোনও উৎপাদক কারণ নাই। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় সমন্বিত "আলয় বিজ্ঞান" একটি স্বতন্ত্র জগৎ—অনবরত পরিবর্তমান বিজ্ঞানস্রোত। ইহা অনুভবের বিষয়। ধ্যানবলে যোগিগণ যে বিপুল চৈতন্যভাণ্ডারের সাক্ষাৎ লাভ করেন, ইহা সেই চৈতন্য-ভাণ্ডার। আমাদের জাগ্রত চৈতন্য আলয়বিজ্ঞানের উপরিভাগে ভাসমান একটি ক্ষুদ্র অংশ। বিশ্বের যাবতীয় বস্তু বিজ্ঞানরূপে ইহার মধ্যে অবস্থিত। চিন্তাই একমাত্র সত্যবস্তু। আলয়বিজ্ঞানই অসঙ্গ (absolute)।

শূন্যবাদ বা মাধ্যমিকবাদের প্রবর্তক নাগার্জুন ভারতের শ্রেষ্ঠতম দার্শনিক-দিগের অন্যতম। ৩০০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বর্তমান ছিলেন। যোগাচারমতে যাবতীয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু মনের প্রত্যয় (Ideas), মনের বাহিরে তাহাদের অস্তিত্ব নাই। মাধ্যমিক মতে মানসিক প্রত্যয়দিগেরও অস্তিত্ব নাই—মনেরই অস্তিত্ব নাই। "জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান সকলই মিথ্যা। বিশ্বে কিছুই নাই। সবই শূন্য। এ অর্থে নাগার্জুনের দর্শন গৃহীত হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে এই দর্শনে কেবল সামুৎপাদিক জগতের অস্তিত্বই অস্বীকৃত হইয়াছে। তাহাদের তলদেশে এক সৎ পদার্থের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয় নাই। নাগার্জুন যুক্তির সহিত শূন্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। প্রত্যেক বস্তুই শূন্য, এই জ্ঞানই সেই বস্তুর সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান। স্কন্ধ, ধাতু ও আয়তন সকলই মিথ্যা। ধর্মদিগের এই আত্যন্তিক নিবৃত্তিই প্রজ্ঞাপারমিতা বা সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান। আপনাকে তথতায়

প্রতিষ্ঠিত করিয়া সকল দ্রব্যকে শূন্য দেখাই বোধিসত্ত্বের লক্ষণ। অসংখ্য জীবকে নির্বাণলাভে সাহায্য করিতে বোধিসত্ত্ব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনও জীবেরই অস্তিত্ব নাই, বন্ধনমুক্তিও নাই। বোধিসত্ত্ব ইহা ভালরূপেই জানেন, কিন্তু বিচলিত না হইয়া মায়িক ও অস্তিত্বহীন জীবের মায়িক বন্ধন হইতে মায়িক মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন। তাঁহার পারমিতাদিগের (অর্জিত গুণের) শক্তিতে তিনি কার্য করিয়া যান কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুক্তিলাভ করিবার কেহ নাই, মুক্তিলাভের সাহায্য করিবারও কেহ নাই। "যঃ অনুপলম্ভঃ সর্ব্ব-ধর্ম্মাণাম্ স প্রজ্ঞাপারমিতা ইত্যুচ্যতে"। (সর্বধর্মের নিবৃত্তিই প্রজ্ঞাপারমিতা।)

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে স্বামী বিবেকানন্দ ইয়োরোপ ও আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার করিয়া আসিয়াছিলেন, তৎপরবর্তী পাশ্চাত্য দর্শনে বেদান্তের প্রভাব লক্ষিত হয়। বর্তমান শতাব্দীতে বাংলায় চারিজন বড় দার্শনিক আবির্ভূত হইয়াছেন—ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, হীরালাল হালদার, কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, ডাঃ গোপীনাথ কবিরাজ। ইঁহারা সকলেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দর্শনেই অভিজ্ঞ। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ এখনও জীবিত আছেন। মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালংকারের "ফেলো-সিপের লেকচার" বেদান্ত সম্বন্ধে একখানি মূল্যবান গ্রন্থ।

ভারতের সর্বশেষ দার্শনিক শ্রীঅরবিন্দ। Life Divine, Essays on the Geeta, এবং অন্যান্য গ্রন্থে তাঁহার দর্শন বিবৃত হইয়াছে। মানবমনের আস্পৃহা (Aspiration) হইতে অরবিন্দের দর্শনের আরম্ভ। এই আস্পৃহা উন্নততর, মহত্তর এবং দুঃখবিমুক্ত জীবনলাভের জন্য। প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক দেশে অনেকের মনে এই আস্পৃহা উদিত হইয়াছে। প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত মানুষের মনের এই আস্পৃহা হইতে অনুমান করা যায় যে প্রকৃতির মধ্যে মহত্তর জীবন উদ্ভাবনের উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে, এবং সেই উদ্দেশ্য মনুষ্যের সংবিদে প্রকাশলাভ করিয়াছে। মানুষের মনে কোনও আদর্শের আবির্ভাব প্রকৃতির ভাবী অভিব্যক্তির একটা স্তরের সূচনা। এই আদর্শ অনেক সময় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় সত্য কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে এই আদর্শের উদ্ভাবক উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব দর্শনের অবহেলার বিষয় নহে। মানুষ কি, তাহার পরিপূর্ণ ধারণা করিতে হইলে তাহার বর্তমান অবস্থার আলোচনাই যথেষ্ট নহে, মানুষ কি হইতে সক্ষম তাহার আলোচনারও প্রয়োজন।

মানুষের মধ্যে যে সম্ভাবনা আছে, তাহার প্রকাশ তাহার আস্পৃহায়। অরবিন্দের দর্শনে মানুষের সম্ভাব্য পরিণতি একটা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

অরবিন্দ সংবিদকে (consciousness) একটা অপ্রাকৃত বস্তু (Miracle) বলিয়াছেন। এই সংবিদ সর্বত্র বিস্তৃত। বাসুদেবঃ সর্ব্বম্। যাহা কিছু আছে সকলই বাসুদেব। অরবিন্দের মতে জড় চৈতন্যের অভিব্যক্তির এক প্রান্ত। এই অভিব্যক্তির অন্য প্রান্ত অসঙ্গ পরমাত্মা। অতিমানস, উচ্চমানস, জৈব ও পার্থিব সংবিদ্, সংবিদের এই সকল ক্রম।

অরবিন্দের অসঙ্গ আত্মা (Absolute Spirit) বেদান্তের ব্রহ্ম। অরবিন্দ মায়াবাদ সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তাঁহার মতে অসঙ্গ পরমাত্মা জীব ও জগৎরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছেন। জীব ও জগৎ মিথ্যা নহে। ব্রহ্ম-চৈতন্য জীব ও জড়ে সর্বত্র বিদ্যমান। জড়ের মধ্যে যে চৈতন্যের প্রকাশ প্রত্যক্ষ হয় তাহা জড়েই অপ্রকাশিত অবস্থায় ছিল। যাহার অস্তিত্ব নাই তাহার ভাব (অস্তিত্ব) কখনও হইতে পারে না। জড়ে অনুস্যূত চৈতন্য বিকাশপ্রাপ্ত হইতে হইতে মানুষের আত্মসংবিদে উত্তীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু এই মানসচৈতন্যই আরোহণের (Ascent) শেষ পর্যায় নহে। অরবিন্দ বলেন, মানুষের স্বাধীন চেষ্টার সহযোগে এই গতি দ্রুততর হইতে পারে। এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে পরিণত করিবার উপায় অরবিন্দের যোগ। যে উর্ধগতি ক্রমে জড়ে আবদ্ধ ক্ষীণচৈতন্য মানবীয় সংবিদে উপনীত হইয়াছে, মানুষে আসিয়া সে গতি স্তব্ধ হইয়া যায় নাই। মানুষ সহযোগিতা করুক আর না করুক, একদিন তাহা স্বীয় লক্ষ্যে পোঁছিবে।

Annie Beasant এক নূতন Race-এর আবির্ভাব শুরু হইয়াছে বলিয়াছিলেন। এই Race বর্তমান মানবসমাজ হইতে জ্ঞানে, বুদ্ধিতে ও চরিত্রে উন্নত হইবে—এই ছিল তাঁহার বিশ্বাস। অরবিন্দ তাঁহার যোগের সাহায্যে মানবীয় সংবিদকে উন্নততর সংবিদে পরিণত করিতে চাহেন। যোগবলে মানুষ মানসসংবিদ হইতে অতিমানস সংবিদে আরোহণ করিতে সমর্থ—ইহাই অরবিন্দের মত। মানুষের বর্তমান মানসসংবিদের (Transformation of Consciousness) সমূল পরিবর্তন ভিন্ন ইহা অসম্ভব। অরবিন্দের যোগ কেবল ব্যক্তির মুক্তির উপায় নহে, সমগ্র মানবজাতিকে উর্ধে তুলিবার উপায়।

অরবিন্দ যেমন সংবিদের উর্ধে আরোহণের (Ascent) কথা বলিয়াছেন তেমনি ঐশ্বরিক সংবিদের অবরোহণের (Descend) কথাও বলিয়াছেন। কিন্তু ক্ষুরধার নিশিত দুরত্যয় দুর্গম পথ অতিবাহন করিয়া লক্ষ্যে পোঁছিবার উপযুক্ত লোকের সংখ্যা অধিক নহে। না হইলেও সামান্যসংখ্যক লোকের দৈহিক জৈব মানসিক সংবিদে উন্নততর সংবিদের অবতরণ সংঘটিত হইলে তাহা মানবজাতির পক্ষে পরম মঙ্গলের সূচনা করিবে। তাহাই পরবর্তী-

কালে বৃহত্তর ক্ষেত্রে সংঘটিত হইবে। সেই দিনের প্রতীক্ষায় অরবিন্দ সকলকে প্রস্তুত হইতে আহ্বান করিয়াছেন।

অরবিন্দের উন্নততর সংবিদের মানুষ ও Nietzsche-র Superman এক নহে। অরবিন্দের Superman ঐশ্বরিক ভাবাপন্ন, আর Nietzsche-র Superman আসুরিক।

অরবিন্দ জন্মান্তরে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার মতে জাগতিক সর্ব বিষয়ের অভিজ্ঞতা লাভের জন্য জীবাত্মার বহুবার জন্মগ্রহণের প্রয়োজন।

শ্রীঅরবিন্দের দর্শন দর্শনের ইতিহাসে ভারতের সর্বশেষ দান।

বাংলায় দর্শনের আকর্ষণ ক্রমশই হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র বিজ্ঞান শ্রেণীতে ভর্তি হইতেছে, এবং দর্শনশিক্ষার্থী ছাত্রদিগের সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে বলিয়া শুনিতে পাই। ইহাতে আক্ষেপ করিবার কিছু নাই। বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে সীমারেখা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে এবং Jeans, Eddington ও Whitehead প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ এখন দর্শনের চর্চা করিতেছেন। বিজ্ঞানশিক্ষা দর্শনশিক্ষার সোপান। আমাদের ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকে স্বাধীনভাবে দর্শনের আলোচনা করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

ইতিহাস শাখার সভাপতির ভাষণ

পরিচিতি :

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

১৯১০ সালে এঁর জন্ম। ১৯৩১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম, এ পাশ করেন। ১৯৩৬ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি, এইচ, ডি উপাধি পান। ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৬০ সালে এঁকে শিকাগো এবং কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছরের জন্যে ইতিহাসের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ করা হয়। ১৯৬১ সালে দেশে ফিবে ইনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। এঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—পেশোয়া বাজীরাও এ্যাণ্ড দি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, লাষ্ট পেশোয়া এ্যাণ্ড দি ইংলিশ কমিশনার্স, শাহ্ আলম এ্যাণ্ড হিজ্ কোর্ট, ফোর্ট উইলিয়াম—ইণ্ডিয়া হাউস করেসপণ্ডেন্স (১৭৭৬—১৮০০) প্রভৃতি।

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

ইতিহাস শাখার সভাপতির ভাষণ

এখন থেকে ত্রিশ বৎসরের কিছু পূর্বে যখন কলকাতায় সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন হয় তখন কুমার শরৎকুমার রায় ইতিহাস-শাখার সভাপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন। নিখিল-ভারত বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ সেই আসনে আমাকে আহ্বান কবায় আমি স্বভাবতই সংকোচ বোধ করছি। বাঙালী ঐতিহাসিকরা সাধারণতঃ স্বল্পবাক। ঐতিহাসিক-গোষ্ঠীর বাইরে তাঁদের কণ্ঠস্বর কদাচিৎ শোনা যায়। আমি যদি তাঁদের সম্বন্ধে আপনাদের কিছু বলি, আপনারা আমার প্রগল্‌ভতা মার্জনা করবেন।

পৌনে দু'শ বৎসব পূর্বে ১৭৮৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা ও ভারতবর্ষ ও এশিয়ার অন্যান্য দেশেব ইতিহাসচর্চার সূত্রপাত হয়। প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাংলা দেশ সম্বন্ধে তখন জ্ঞান খুব সীমাবদ্ধ। কিন্তু ইংরেজ যুগের ইতিহাস লেখার কাজ সে আমলের প্রথম থেকেই শুরু হয়েছিল। রাজ্যশাসনের জন্য দেশের ইতিহাস জানবার প্রয়োজন ছিল। ক্লাইভের বন্ধু স্ক্র্যাফ্টন সমসাময়িক রাজনৈতিক ইতিহাসের কথা লিখেছিলেন। হল্‌ওয়েল সাহেব সম্বন্ধে আমাদের দেশবাসী কিংবা তাঁর স্বদেশবাসী কেউই উচ্চধারণা পোষণ করতেন না। বাংলা দেশে তিনি সাধারণতঃ অন্ধকূপহত্যার কাহিনীকার বলে পরিচিত। কিন্তু ইংরেজ লেখকদের মধ্যে তিনিই সম্ভবতঃ প্রথম হিন্দু ধর্ম ও দেবদেবী সম্বন্ধে একটি পুস্তক রচনা করেন। সে যুগে প্রাচীন ভারতবর্ষের অনেক বিখ্যাত রাজার নামের সঙ্গে পর্যন্ত আমাদের পরিচয় ছিল না। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হবার পর জেমস্ প্রিন্‌সেপ প্রভৃতি বিদেশী পণ্ডিতদের চেষ্টার ফলে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের খসড়া তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। পরে ১৮৬১ সালে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ স্থাপিত হওয়ার পর এই কাজ আরও সুষ্ঠুভাবে আরম্ভ হয়েছে। এই মাসে তার শতবর্ষ পূর্ণ হল।

দেশের ইতিহাস রচনার প্রাথমিক কাজে বাংলা দেশের ঐতিহাসিকরা তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু করেননি, করা সম্ভবও ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতীয়দের লেখা ইতিহাসের বহু প্রচলিত রীতি অনুসারে ফার্সিতে লেখা এবং প্রচলিত রীতি অনুযায়ী অনেক ক্ষেত্রে রাজচ্ছায়ায় পুষ্ট। বৃটিশ আমলের প্রথম

দিকেও ঐতিহাসিকদের সঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসকদের যোগ ছিল। তাঁদের একজন কোম্পানীর ডাকমুন্সী ছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠার সময় দেশের ঐতিহাসিকদের এই প্রতিষ্ঠানে আমন্ত্রণ করা হয়নি। ঐতিহাসিক বলা যায় এমন ভারতীয়ও তখন দুর্লভ। স্যর উইলিয়ম জোন্স অবশ্য দ্বার রোধ করেননি; আশা করেছিলেন ভবিষ্যতে ভারতীয়রা এই প্রতিষ্ঠানে কাজে সহায়তা করতে পারবেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙালী ঐতিহাসিকরা প্রথম দেশের ইতিহাস লিখতে আরম্ভ করেন। সেই সব গ্রন্থ এখনকার পাঠকদের মনোহরণ করবে এমন আশা করা উচিত হবে না। এর মধ্যে অধিকাংশই বাল্যপাঠ্য, কয়েকটি ইংরাজি বিদ্যালয়পাঠ্য ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বাংলা সংস্করণ। কিন্তু যাঁরা লিখতেন তাঁরা অনেকে সমাজে ও সাহিত্যে সুপরিচিত ব্যক্তি। তাঁরা প্রধানতঃ জাতীয় কর্তব্যবোধে এই কাজে শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এখনকার বহু অযত্নে লিখিত, অসংখ্য ত্রুটিপূর্ণ বাল্য-পাঠ্য পুস্তকের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে প্রভেদ স্পষ্ট হবে।

বাংলার ইতিহাস লেখা হয়নি বলে বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষোভের অন্ত ছিল না। "সাহেব যদি পাখী মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয় কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাস নাই।" অন্যত্র "....একখানি ইংরেজি গ্রন্থেও বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস নাই। সে সকলে যদি কিছু থাকে, তবে যে সকল মুসলমান বাঙ্গালার বাদশাহ, বাঙ্গালার সুবাদার ইত্যাদি নিরর্থক উপাধিধারণ করিয়া নিরুদ্বেগে শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিত, তাহাদের জন্ম, মৃত্যু, গৃহবিবাদ এবং খিচুড়ী-ভোজন মাত্র।.... বাঙ্গালার ইতিহাসের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধও নাই।" বঙ্কিমচন্দ্র যখন এ কথা লিখেছিলেন তখন "আত্মজাতিগৌরবান্ধ" ঐতিহাসিকের বঙ্গবিজয়ের কাহিনী যে বিশ্বাসযোগ্য নয় এ কথা বলাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর ঐতিহাসিকদের "স্বকপোল-কল্পন" বিনা বিচারে গ্রহণ করা বাঙালী পাঠকের রীতি বলে তিনি শ্লেষ প্রকাশ করেছেন। "এ বিশ্বাসের আর কোন কারণ নাই, কেবল এই মাত্র কারণ যে সাহেবরা সেই মিনহাজউদ্দীনের কথা অবলম্বন করিয়া ইতিহাস লিখিয়াছেন। তাহা পড়িলে চাকরি হয়। বিশ্বাস না করিবে কেন?" রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে এই কথা অন্যভাবে বলেছিলেন, "দেশের ইতিহাসই আমাদের স্বদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।" আমাদের ইতিহাস "স্বদেশ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টির সহায়তা করে না, দৃষ্টি আবৃত করে মাত্র....নগরের বিলাসশালার নর্তকীর মণিভূষণ....বাদশাহের সুরাপাত্রের রক্তিম ফেনোচ্ছ্বাস.... সুদূরব্যাপী শিবিরে তরঙ্গিত পাণ্ডুরতা,....কিংখাব আবরণের স্বর্ণচ্ছটা, যে ইন্দ্রজাল রচনা করে," তাকে ভারতবর্ষের ইতিহাস বলা অনুচিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তিতে কিছু পরিমাণ অতিশয়োক্তি আছে। বাঙালী পাঠক এতখানি শ্লেষেব পাত্র কিনা সন্দেহ। সরকারী মাল্য-চন্দনে ভূষিত ইতিহাসের গ্রন্থমাত্রই যে বাঙালী পাঠকের কাছে প্রিয় হয়নি তার প্রমাণ পেতে অসুবিধা হবে না। তাহলেও বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলেছিলেন সে কথা সত্য। এখন অবশ্য এই অবস্থাব কিছু পরিবর্তন হয়েছে। ঐতিহাসিকের পক্ষে যে সাফাই নেই তা নয়। কোনও দেশের ইতিহাস পড়তে হলে প্রথমে তার সন তাবিখ ও নামাবলী সম্বলিত একটি কঙ্কালের সঙ্গে পরিচয় হওয়া দরকার। ডাক্তাবি শাস্ত্র পড়তে গেলে যেমন অস্থিবিদ্যার জ্ঞান আবশ্যক। পৃথিবীর গর্ভ থেকে সেই টুকরো টুকরো অস্থিকে আবিষ্কার করে সেই কঙ্কাল নির্মাণ করতে হয়। এ কাজ সময়সাপেক্ষ ; বহুদিন পূর্বে আরম্ভ হলেও এই প্রাথমিক কাজ এখন সম্পূর্ণ হয়েছে এ কথা বলা চলে না। প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাসের বলগা এক হাতে ধারণ করতে পারেন এবং অন্য হাতে সরস ইতিবৃত্ত রচনা করতে পারেন এমন লোক সব দেশেই দুর্লভ। রক্তকরবীব রাজা বলেছিল, "পৃথিবীব নীচের তলায় পিণ্ডপিণ্ড পাথর লোহা সোনা"কে খনি থেকে বার করা বরং সহজ। "উপরের তলায়....ঘাস উঠছে ফুল ফুটছে....দুর্গমেব থেকে হীরে আনি, মানিক আনি, সহজের থেকে ওই প্রাণের জাদুটুকু কেড়ে আনতে পারি নে।" প্রত্ন-তাত্ত্বিকরা অনেকটা এই কথা বলবেন।

বাংলাদেশে যখন প্রথম ইতিহাসচর্চার আরম্ভ হয় তখন বিদেশী ও বাঙালী ঐতিহাসিকরা স্বভাবতই ভারতবর্ষের প্রাচীন ও মধ্য যুগের ইতিহাসের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমে বাঙালী ঐতিহাসিকরা ইংরেজ আমলের ইতিহাস চর্চা আরম্ভ করেছিলেন। প্রায় আশি বৎসর পূর্বে কিশোরবয়স্ক রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ 'ঝাঁসীর রাণী' প্রকাশিত হয়েছিল। পড়লে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ কে. ও. ম্যালসন্ প্রণীত সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস, 'টাইমস্' পত্রিকার সংবাদদাতা রাসেলের গ্রন্থ এবং সে সময়ে প্রচলিত অন্যান্য ইংরেজি গ্রন্থ থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। প্রথম যুগের বাংলা ঐতিহাসিক প্রবন্ধের মধ্যে এটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। সিপাহীযুদ্ধের নায়কদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব কি ছিল অনুমান করা কঠিন নয়। তিনি রাণী লক্ষ্মীবাঈকে "ভক্তিপূর্বক নমস্কার" জানিয়েছেন। তাতিয়া টোপী ও কুনোয়ার সিংহের বীর্যের ও উদ্যমের প্রশংসা করেছেন। কিন্তু নানা সাহেব অথবা বাহাদুর শাহের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেননি। প্রবন্ধশেষে রবীন্দ্র-নাথ লিখেছিলেন; "আমরা নিজে তাঁহার যেরূপ ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছি তাহা ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।" এই গ্রন্থ কখনও প্রকাশিত হয়নি।

ব্রিটিশ আমলে ইতিহাস লেখার কাজ রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক একজন লেখক আরম্ভ করেছিলেন, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। এ বৎসর তাঁরও জন্মের শতবর্ষপূর্তি হয়েছে। অক্ষয়কুমারের সিরাজদ্দৌল্লা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অভিনন্দন লাভ করেছিল। কোনও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রিকা অক্ষয়কুমারের রচনায় ক্রুদ্ধ হওয়ায় বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ যে-ইতিহাসগ্রন্থকে কেবল রাজা ও বাদশার ইতিহাস বলেছেন অক্ষয়কুমারেব সিরাজদ্দৌল্লা প্রকৃতপক্ষে তাই। কিন্তু এই রচনার মধ্যে "উজ্জ্বল ও সরস ঘটনাবিন্যাস" এবং "সুনিপুণ প্রমাণ বিশ্লেষণ" তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। যে যুগে অক্ষয়কুমার ইতিহাস রচনা আরম্ভ করেছিলেন সে যুগে বাঙালী ঐতিহাসিকদের হাতে ইতিহাসের উপাদান যথেষ্ট ছিল না। এখনকার কোন নবীন গবেষকও সেই উপাদান সম্বল করে লিখতে রাজি হবেন না। সরকারী অপ্রকাশিত দলিলপত্র দেখবার কথা তখন কেউ চিন্তাও করতেন না। সব রকম মুদ্রিত কাগজপত্র দেখবাব সুযোগও হত না। এই ক্রটিকে তাঁরা উৎসাহ দিয়ে পূর্ণ করবার চেষ্টা করতেন, কিন্তু তার ফল সব্ সময় শুভ হত না। এই ক্রটিব কথা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন। "গ্রন্থকার যদিচ সিরাজ-চরিত্রের কোন দোষ গোপন করিতে চেষ্টা করেন নাই, তথাপি কিঞ্চিৎ উদ্যম সহকারে তাহাব পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। শান্তভাবে কেবল ইতিহাসের সাক্ষ্য দ্বাবা সকল কথা ব্যক্ত না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে নিজের মত কিঞ্চিৎ অধৈর্য ও আবেগের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন....ইহাতে সত্যের শান্তি নষ্ট হইয়াছে এবং পক্ষপাতের অমূলক আশঙ্কা পাঠকের মনে মধ্যে মধ্যে ঈষৎ উদ্বেগেব সঞ্চার করিয়াছে।"

এ যুগের ঐতিহাসিকরা অনেক বিষয়ে ভাগ্যবান। মাটির তলায় ইতিহাসের উপাদান আজ তাঁদের কাছে বহু পরিমাণে প্রকাশিত হয়েছে, সরকারী মহাফেজখানাও তাঁদের জন্য উন্মুক্ত। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে তাঁরা কার্পণ্য করেননি। কিন্তু ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ঐতিহাসিকদের গবেষণার কথা চিন্তা করলে একটি জিনিষ চোখে পড়ে। একদা উত্তর ও দক্ষিণ ভারতবর্ষের মধ্যে বিন্ধ্য পর্বতের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ছিল। কোনও কোন ঐতিহাসিকের কাছে সেই প্রাচীর এখনও তেমনি অটুট আছে। উত্তর-ভারতবর্ষে এমন ঐতিহাসিক কম যিনি দাক্ষিণাত্য সম্বন্ধে কৌতূহলের পরিচয় দিয়েছেন। উত্তরে এর কিছু ব্যতিক্রম খোঁজ করলে হয়তো পাওয়া যায়। কিন্তু দক্ষিণ-ভারতের ঐতিহাসিকদের মধ্যে ব্যতিক্রম নেই বললেই চলে। সৌভাগ্যক্রমে বাঙালী ঐতিহাসিক এই নিয়মের বাইরে। প্রথম থেকেই তাঁরা প্রদেশের ভৌগোলিক সীমা লঙ্ঘন করেছেন। পাঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট-

মারাঠা-দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গের সর্বত্র তাঁদের দৃষ্টি প্রসারিত। বাঙালী ঐতিহাসিকদেব কাজ বাদ দিলে ভারতবর্ষের কোনও অংশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস পাওয়া কঠিন। সমগ্র দেশের কোথাও একটি মূল সূত্র আছে তাঁরা সে কথা বহু পূর্বেই বুঝতে পেরেছিলেন। "মোগল-পাঠানের গর্জনমুখর বাত্যাবর্ত" কিংবা মুমূর্ষু মোগল সাম্রাজ্যের শ্মশানে 'দূরাগত গৃধ্রগণের' চাতুরী ও হানাহানির কাহিনী তাঁরা অবশ্য বর্জন করেননি। এই কাহিনী ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিবৃত্ত না হতে পারে, কিন্তু এও ইতিহাসের অংশ।

অন্যান্য প্রদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতি বাঙালী পাঠক ও ঐতিহাসিকেব মনে আগ্রহ ও অনুরাগ সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছিলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি, প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন বোম্বাই প্রদেশে কর্মক্ষেত্র নির্বাচন করেছিলেন তখন থেকেই মহারাষ্ট্র ও বঙ্গদেশে একটি যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। 'আমার বোম্বাই প্রবাস' ও 'বোম্বাই চিত্র' লিখবার সময় সত্যেন্দ্রনাথ খুব সম্ভব ডগ্‌লাসের Bombay and Western India গ্রন্থের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের দুটি গ্রন্থ, মহারাষ্ট্রের ইতিহাস এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় ঘটিয়েছিল। যুবক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বোম্বাই ও কারোয়ার শহরেব পরিচয়, প্রকৃতপক্ষে বঙ্গদেশের মহারাষ্ট্র দেশের পরিচয়। বাংলার সঙ্গে মহারাষ্ট্রেব পূর্বপরিচয় বাঙালীর পক্ষে সুখের হয়নি। মহারাষ্ট্র-চরিত্রের সঙ্গে বাঙালী চরিত্রের কোন কোন বিষয়ে মিল আছে। কিন্তু বর্গীর হাঙ্গামার ক্ষত সহজে ভুলে যাবার নয়। বঙ্গদেশ যে মহারাষ্ট্রের সঙ্গে শিবাজী-উৎসবে যোগ দিয়েছিল তার কারণ জাতীয় আন্দোলনের উন্মাদনা ও রবীন্দ্রনাথ।

কোন কোন বিষয়ে পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর আগেকার ঐতিহাসিকদের সঙ্গে এখনকার ঐতিহাসিকদের প্রভেদ চোখে পড়ে। সে যুগের ঐতিহাসিকরা সাধারণ পাঠকদের মনে ইতিহাসের যে অনুরাগ সৃষ্টি করেছিলেন, এখনকার ঐতিহাসিকরা তা পারেননি। তার কয়েকটি কারণ আছে। এখনকার ঐতিহাসিকদের বেশির ভাগ লেখা সাধারণের জন্য নয়, স্বদেশীয় ও বিদেশীয় বিদগ্ধ পাঠকদের জন্য। বিশেষতঃ তাঁরা বাংলায় লেখেন কম। এমন সব্যসাচী এখন নেই যিনি একসঙ্গে ইতিহাস ও ঐতিহাসিক কাহিনী রচনা করতে পারেন। তখনকার ঐতিহাসিকরা কেউ কেউ গল্প ও উপন্যাসের জগতে প্রবেশ করতে দ্বিধা করতেন না। এখন সে রকম সাহসী ঐতিহাসিক দুর্লভ। রমেশচন্দ্র দত্ত ইংরেজি ভাষায় ইতিহাস ও বাংলা ভাষায় ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছেন। তিনি একা নন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রাখালদাস

বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাচীন যুগ থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইতিহাসের কাহিনীর সঙ্গে বাঙালীর পরিচয় ঘটিয়েছেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও এর আকর্ষণ থেকে পরিত্রাণ পাননি। ঐতিহাসিক কাশীপ্রসাদ জয়সয়াল এককালে পাঠকের মনে ঔৎসুক্য সঞ্চার করেছিলেন। তাঁর রচনার দ্বারা সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কি রকম প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন মগধের পটভূমিকায় লেখা তাঁর অসম্পূর্ণ উপন্যাস 'ডাঙ্কানিশান' থেকে বোঝা যাবে। এই সব রচনা উপন্যাস হিসাবে সার্থক হয়েছে কিনা সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। কিন্তু তাঁরা বহু পাঠককে তাম্রলিপ্তি ও কর্ণসুবর্ণ, শোণের আরক্তিম বালুতটে রোহিতাশ্ব পর্বতের দুর্গ, মুঘল আমলের দিল্লী ও আগ্রা এবং বঙ্গোপসাগরের মোহানায় পোর্তুগীজ আক্রমণের কাহিনীর সঙ্গে প্রথম পরিচয় করিয়েছেন। রাখালদাসের মৃত্যুর পর বহু দিন এ পথে কোনও উল্লেখযোগ্য লেখকের পদার্পণ হয়নি। সম্প্রতি এ পথে যাঁরা এসেছেন তাঁরা মূলতঃ ঐতিহাসিক নন, সাহিত্যিক এবং ইতিহাসরসিক। পাঠকদেব ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হয় না। সে যুগে ঐতিহাসিক না হয়ে যাঁরা ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতেন, তাঁদের সঙ্গে এঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর অনেক প্রভেদ, উপাদান সংগ্রহের রীতিরও তফাৎ। বাঙালী ঐতিহাসিকদের এতে কি কোনও হাত নেই?

পূর্বে বাঙালী ঐতিহাসিকরা প্রায় সবাই সব্যসাচী ছিলেন। ইংরেজী ও বাংলা দুই ভাষায় তাঁদের লেখনীর অবাধ গতি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, যদুনাথ সরকার, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ চন্দ ও নলিনীকান্ত ভট্টশালীর রচনার সঙ্গে মাসিক পত্রিকার পাঠকদের পরিচয় ছিল। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো, শ্রীসুকুমার সেন, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন ও শ্রীনীহাররঞ্জন রায়ের রচনায় বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধি লাভ করছে। আশা করছি এঁদের সঙ্গেই এই রীতির অবসান হবে না।

নবীন ঐতিহাসিকদের মধ্যে বাংলা ভাষায় মৌলিক ও সরস ঐতিহাসিক রচনার সে ধারা ক্ষীণ হয়ে এসেছে, যা চোখে পড়ে তার অধিকাংশ উনবিংশ শতাব্দী অতিক্রম করে দূরকালে প্রসারিত হতে পারে না, তার নিশ্চয়ই কারণ আছে। কিন্তু এ অবস্থা অবাঞ্ছনীয়। পূর্বে মাসিক পত্রিকায় যে সব ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হত, অধিকাংশ বাংলাদেশের ইতিহাস সংক্রান্ত। বাঙালী পাঠকের সে বিষয়ে ঔৎসুক্য থাকা স্বাভাবিক। বাংলাদেশের ইতিহাসের অনেক পাঠকের এই রকম করে পরিচয় হয়েছে। দিব্যোকের বিদ্রোহ, বাংলার ইলিয়াস শাহী আমল কিংবা দনুজমর্দন দেবের সঙ্গে অনেকের মাসিক পত্রিকায় পরিচয় হয়েছে। কিন্তু যাঁরা সাধারণতঃ ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের ইতিহাস

চর্চা করেন তাঁদের সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক তাঁর রচনাব প্রতি পাঠকদের যথেষ্ট ঔৎসুক্য থাকবে কিনা। এ কথা বলা কি ঠিক যে লেখক পাওয়া যেতে পারে কিন্তু উপযুক্ত বাহনের অভাব? লেখকরা আশা কবেন তাঁদের রচনা কিছু পাঠকের হাতে নিশ্চয় পৌঁছবে। যে সব পত্রিকার আয়ু ক্ষীণ এবং প্রচার অতি সীমাবদ্ধ সেই সব পত্রিকায় লিখতে অনিচ্ছা স্বাভাবিক। অক্ষয়-কুমাব মৈত্রেয় সম্পাদিত 'ঐতিহাসিক চিত্র' দীর্ঘজীবন লাভ কবেনি। এখনকার 'ইতিহাস' পত্রিকা সম্বন্ধে প্রায় দশ বৎসব পূর্বে একজন লেখক মন্তব্য করেছিলেন, "এই প্রচেষ্টা অতি ক্ষীণ এবং বাঙালী জাতি তথা বাংলা সাহিত্যের মর্যাদা বা প্রয়োজনের অনুরূপ নয়।" লজ্জার সঙ্গে স্বীকাব করছি এই মন্তব্য সম্পূর্ণ অনুচিত হয় নি।

আমার বক্তব্য বলতে সুযোগ দিয়েছেন বলে আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। কেবল একটি কথা বলবার আছে। সাহিত্য-সম্মেলনে যে সব সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিকরা উপস্থিত আছেন তাঁদের কাছে আমার একটি নিবেদন আছে। গত পঁচিশ বৎসর কলকাতার পথঘাটের নামেব দ্রুত পবিবর্তন আপনারা লক্ষ্য করেছেন। স্বাধীনতার পরে কিছু পবিবর্তন প্রয়োজন হয়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু এর একটি সুসংগত রীতি থাকা আবশ্যক। অলস খেয়ালের বশে কিংবা অসংগত কারণে কলকাতার পুরানো অঞ্চলের নাম পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় নয়। ক্রমাগত দেখছি দীর্ঘদিনের পরিচিত নাম মুছে গিয়ে নতুন নাম ঘোষণা করতে পৌরপ্রতিষ্ঠান তৎপর; নতুন যাঁদের নাম দেখছি, তাঁদেব সকলের কলকাতার পথ নামাঙ্কিত করবার দাবী আছে বলে মনে হয় না। পুরানো দিনের নামের সঙ্গে অনেক ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত। কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানের কাছে তার কোনও মূল্য নেই। বিদেশী অপসাবণের বেলাতেও বিবেচনা করার প্রয়োজন। সমস্ত বিদেশীর নাম অপসারণ করব এমন অভিমান স্বাধীন দেশের শোভা পায় না। এমন কোনও কোনও বিদেশী আছেন যাঁরা ভৌগোলিক গণ্ডীর উর্ধে। যে বিদেশীর পরিশ্রম ও চিন্তার ফলে ভাবতবর্ষের প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়েছে তাঁর নাম অপসারণ করতেও চেষ্টার ত্রুটি হয়নি। পৌরপ্রতিষ্ঠানের হাতে কাজের অভাব আছে এ কথা আশা করি কেউ বলবেন না। কলকাতার জঞ্জাল-বিলোপের কাজ তাঁদেরই থাক্, কলকাতার ইতিহাস-বিলোপের যে কাজ তাঁরা গ্রহণ করেছেন তা পরিত্যাগ করুন। অধ্যাপক অথবা ঐতিহাসিকদের ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে পৌরপ্রতিষ্ঠান বিচলিত হবে এ আশা করি না। কিন্তু আপনারা ইচ্ছা করলে এই অবাঞ্ছনীয় প্রথার অবসান হতে পারে।

আমি পুর্নবার আপনাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

গ্রীষ্মে
স্বচ্ছন্দ শীতল
আরাম
Calchemicos
Renuka
TALCUM POWDER
WITH ACTAMER
Refreshing & Fragrant
CALCUTTA CHEMICAL
এ্যাক্‌টেমার সংযুক্ত
রেণুকা ট্যালকম পাউডার
রোগ বীজাণুর সংক্রমণ
থেকে গাত্র চর্ম বর্মের ন্যায়
রক্ষা করে এবং সারাদিনের স্বেদাক্ত
দুর্গন্ধ দূর করে, শরীর নির্মল
ও শীতল রাখে।
রেণুকার সৌরভ চিত্তাকর্ষক।
রেণুকা
ট্যালকম পাউডার
এ্যাক্‌টেমার সংযুক্ত
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ